উপেন্দ্রকিশোর রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমারের জন্ম ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে। ১৯০৬-এ পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন দুই বিষয়েই অনার্স নিয়ে বি. এস্‌সি পাশ করার পর ১৯১১-য় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করে মুদ্রণ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি বিলেতে যান। লণ্ডনে ও ম্যাঞ্চেস্টারে অধ্যয়ন করেন তিনি ও তাঁর গবেষণার জন্য সম্মানিত হন। ১৯১৩-য় উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয়। সুকুমার দেশে ফেরার কিছু কাল পরে ১৯১৫-য় উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। সুকুমার ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্‌স কার্যালয়ের পরিচালনার এবং 'সন্দেশ' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'সন্দেশ'-এর পাতাতেই তাঁর অধিকাংশ ছোটদের লেখা—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ধাঁধা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। শুধু নিজের লেখা নয়, 'সন্দেশ'-এর অন্যান্য লেখকদের রচনার জন্যও অজস্র ছবি এঁকেছেন তিনি। 'হ য ব র ল', 'আবোল তাবোল' জাতীয় আজগুবি চালের বেঠিক বেতাল ভুলের ভবের গদ্য ও পদ্য রচনা ছাড়াও শিল্প সাহিত্য ভাষা ধর্ম বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সক্রিয় ছিল তাঁর লেখনী।

আড়াই বছর কালাজ্বরে ভুগে ১৯২৩-এ মাত্র ৩৬ বছর বয়সে সুকুমার রায় ১০০ গড়পার রোডের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর কিছু দিন আগেও তিনি শুয়ে শুয়ে সন্দেশের জন্য ছবি এঁকেছেন, প্রচ্ছদ রচনা করেছেন, গল্প কবিতা লিখেছেন। 'আবোল তাবোল'-এর ডামি কপিটিও রোগশয্যায় তৈরি করেছেন। কিন্তু বইটি ছেপে বেরোবার ন' দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়

সুকুমার সাহিত্য সমগ্র



প্রথম খণ্ড

'অতীতের ছবি' পুস্তিকাটি বাদে সুকুমার রায়ের জীবদ্দশায় তাঁর কোনো রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। 'সুকুমার সাহিত্য-সমগ্র'-র প্রথম খণ্ড ১৯৭৩-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময়ে তাঁর বহু রচনা গ্রন্থাকারে লভ্য ছিল না। আবার, যেগুলি কোনো না কোনো সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, কিংবা কোনো পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল, তারও অধিকাংশ ছিল তখন দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য। পরবর্তী কালে, বিশেষ করে সুকুমার রায়ের কপিরাইটের মেয়াদ ফুরনো মাত্র বহু প্রকাশন সংস্থা থেকে তাঁর গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলীর নানা ধরনের সংস্করণের প্রকাশ শুরু হয়। দুঃখের কথা, তার কোনোটিই প্রামাণ্য নয়। বর্তমান জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণে 'সুকুমার সাহিত্য-সমগ্র'-র প্রথম সংস্করণেরও বহু রচনা আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত হয়েছে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি বা প্রথম প্রকাশিত পাঠের ভিত্তিতে। এই খণ্ডের শেষে 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশটিও কিছু প্রয়োজনীয় 'পাঠান্তর' ও আরও তথ্য যুক্ত হয়ে পরিবর্ধিত হয়েছে।

এই খণ্ডে রয়েছে 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই' ও 'অতীতের ছবি' এই তিনটি কবিতার বই এবং 'অন্যান্য কবিতা' শিরোনামে আরও বিয়াল্লিশটি সচিত্র কবিতা। আরও রয়েছে 'হ য ব র ল', 'পাগলা দাশু' ও 'বহুরূপী' বই তিনখানির সঙ্গে 'অন্যান্য গল্প' নামে আরও বত্রিশটি গল্প।

মূল্য ৫০·০০

ISBN 81-7066-172-2



সুকুমার সাহিত্যসমগ্র

জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক । সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড

কলকাতা ৯

সূচীপত্র

হযবরল

পাগলা দাশু

বহুরূপী

অন্যান্য গল্প

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র

প্রকাশকের নিবেদন

সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষে তাঁর সমগ্র রচনাবলীর একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ইতিপূর্বে আমাদের প্রকাশনা থেকে শ্রী সত্যজিৎ রায় ও শ্রী পার্থ বসু সম্পাদিত দুটি খণ্ড প্রকাশিত হলেও প্রতিশ্রুত তৃতীয় বা শেষ খণ্ডটি এতদিন পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে 'জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ'-রূপে 'সুকুমার সাহিত্যসমগ্র' তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণের এই প্রথম খণ্ডে পূর্ববর্তী সংস্করণের বহু রচনার আদ্যোপান্ত পরিমার্জনা হয়েছে। এই কাজটি হয়েছে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি বা প্রথম প্রকাশিত পাঠের উপর নির্ভর করে। এই খণ্ডের পরিশেষে 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশটিও কিছু প্রয়োজনীয় পাঠান্তর ও আরো অতিরিক্ত তথ্য সংযোগে পরিবর্ধিত হয়েছে। এ ছাড়া পূর্ববর্তী সংস্করণের মূল কাঠামোটিকেই বজায় রাখা হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশে আমাদের প্রধান সহায়ক হয়েছেন শ্রী সিদ্ধার্থ ঘোষ। তাঁর কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার বাবার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স আড়াই বছর। সুতরাং আত্মীয়তাসূত্রে একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজনের যে-পরিচয় হয়, আমার সঙ্গে আমার বাবার সেরকম পরিচয় হবার কোনো সুযোগ হয় নি। আমি তাঁকে চিনেছি তাঁর লেখা ও আঁকার মধ্য দিয়ে। তাঁর একটি খসড়া খাতা, কয়েকটি নোট বুক, একটা হাতে-লেখা পত্রিকার দুটি সংখ্যা, এবং আমার মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মুখে শোনা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে।

সুকুমার রায়ের জন্ম হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মা বিধুমুখী দেবী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বাধীনচেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। পিতা ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়, যাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় তাঁর লেখায় গানে ছবিতে আর মুদ্রণের কাজে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান ও শিল্পের, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে। বেহালার পাশে পাশে পাখোয়াজ বাজিয়েছেন তিনি, ব্রহ্মসংগীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের কাজে মৌলিক গবেষণা চালিয়েছেন, রাত্রে বাড়ির ছাতে বসে দূরবীন চোখে দিয়ে আকাশের তারা দেখেছেন, অননুকরণীয় সুষমামণ্ডিত সহজ ভাষায় পৌরাণিক কাহিনী ও গ্রাম্য উপকথা নতুন করে লিখেছেন ছোটদের জন্য, আর সেই সঙ্গে খাস বিলিতি কায়দায় তেল-রঙ জল-রঙ ও কালি-কলমে ছবি এঁকেছেন। ইলাসট্রেটর হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরের কাজে যে দক্ষতা ও রীতিবৈচিত্র্য দেখা যায় তার তুলনা ভারতবর্ষে নেই।

এহেন পিতার সস্নেহ সান্নিধ্যে মানুষ হয়েছিলেন সুকুমার। তাঁর আরও দুটি ভাই ও তিনটি বোন ছিল, বয়সে সবচেয়ে বড় ছিলেন সুখলতা। তার পরেই সুকুমার। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস থেকে এই দুই ভাইবোনের ডাকনাম রাখা হয়েছিল তাতা ও হাসি।

সুকুমারের স্কুল ও কলেজের শিক্ষা হয় কলকাতাতেই। শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রতিষ্ঠিত মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি বাল্যরচনা ছাড়া ছাত্রাবস্থায় সুকুমারের সাহিত্য-রচনার কোনো নজির পাওয়া যায় না।

কলেজ ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যেই ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। সুকুমার সাহিত্যের মূল ধারাটি কোনদিকে প্রবাহিত হবে তার ইঙ্গিত ক্লাবের নামকরণেই রয়েছে। আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে গঠিত এই ক্লাবের জন্য লেখা দুটি নাটক—ঝালাপালা ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল—এবং ক্লাবের পত্রিকা সাড়ে বত্রিশ ভাজা-র পাতায় সুকুমারের হাস্যরসের প্রথম আভাস পাওয়া যায়।

নাটক দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে বেশি সার্থক ও উপভোগ্য। কিন্তু প্রথমটিতেও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় যে একেবারে নেই তা নয়। ভাষাকে অবলম্বন করে হাস্যরসের সৃষ্টি সুকুমার সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঝালাপালা-য় আছে। পাঠশালার ছাত্র কেষ্টা পণ্ডিতমশাইকে ইংরেজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করছে—

কেষ্টা— 'আই গো আপ্, উই গো ডাউন' মানে কি?

পণ্ডিত— 'আই'—'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো'—গয়ে ওকারে গো—গৌ গাবৌ গাবঃ ইত্যমরঃ, 'আপ্' কিনা আপঃ সলিলং বারি, অর্থাৎ জল। গরুর চক্ষে জল, অর্থাৎ কিনা গরু কান্দিতেছে। কেন কান্দিতেছে? না, 'উই গো ডাউন', কিনা 'উই' অর্থাৎ

যাকে বলে উই পোকা— 'গো ডাউন' অর্থাৎ গুদামখানা। গুদামখানায় উই ধরে আর কিছু রাখলে না, তাই না দেখে 'আই গো আপ'—গরু কেবলই কাঁদিতেছে—

লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকে রামায়ণের কিছু চরিত্রকে মহাকাব্যের জগৎ থেকে টেনে নামিয়ে একেবারে রং তামাসার আসরে এনে ফেলা হয়েছে। এই রামায়ণে পুঁইশাক চচ্চড়ি, বাথগেট কোম্পানি, হোমিওপ্যাথি, ব্যায়ামবীর স্যাণ্ডো, রেকারিং ডেসিম্যাল ইত্যাদি অকাব্যিক প্রসঙ্গ অনায়াসে স্থান পেয়ে গেছে। এ রামায়ণে হনুমান বাতাসা খায়, যমদূতের মাইনে বাকি পড়ে, সুগ্রীব জখম পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধে, বিভীষণের দাড়ির গন্ধ জাম্বুবানের বিরক্তি উদ্রেক করে। সংগীত-রচয়িতা হিসেবেও সুকুমারের প্রথম পরিচয় এই লক্ষ্মণের শক্তিশেল-এ। সহজ সুরে সহজ ছন্দে রচিত গানগুলি নাটকের হাস্যরস চমৎকারভাবে ঘনীভূত করে।

কিন্তু হাস্যরসের যে বিশেষ অভিব্যক্তিতে সুকুমার অদ্বিতীয়, তার কোনো ইঙ্গিত এই দুটি নাটকে নেই। তার পরিচয় প্রথম পাওয়া যাবে সন্দেশ পত্রিকায়।

রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে ডাবল্ অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পাশ করার পাঁচ বছর পর ১৯১১ সালে সুকুমার মুদ্রণশিল্পে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাত্রা করেন। এর এক বছর পর রবীন্দ্রনাথও লণ্ডনে গিয়ে উপস্থিত হন, সঙ্গে তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের সমবয়সী ও বন্ধুস্থানীয়, আর সুকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের তরুণ ভক্তবৃন্দের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সুধীসমাজ তখনও পরিচিত হয় নি। সুকুমার এই সময় ইংরেজিতে 'দ্য স্পিরিট অফ রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি স্বরচিত প্রবন্ধ ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট সোসাইটির একটি অধিবেশনে পাঠ ক'রে এই পরিচয়ের পথ খানিকটা সহজ করে দিয়েছিলেন।

১৯১৩ সালের মে মাসে উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় সন্দেশ মাসিকপত্রিকার আবির্ভাব হয়। এর কয়েক মাস পরেই সুকুমার দেশে ফেরেন, এবং সেই সময় থেকেই সন্দেশের পাতায় তাঁর ছবি ও লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম তিন বছরে রচনার সংখ্যা বেশি নয়, কারণ উপেন্দ্রকিশোর তখনও জীবিত, এবং তিনি নিজে একাই ছবি ও লেখায় সন্দেশের পাতা ভরিয়ে রেখেছেন। এসব লেখা ও আঁকা থেকে বেশ বোঝা যায় যে হাস্যরসিক হিসাবে উপেন্দ্রকিশোরও কিছু কম ছিলেন না। বিশেষত ছবিগুলিতে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। পৌরাণিক গল্পের ছবিতে হাস্যরসের তেমন সুযোগ নেই, কিন্তু সেখানেও—হয়ত শিশুদের কথা চিন্তা করেই—দৈত্য দানব রাক্ষস পিশাচের চেহারা আঁকতে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোর ভয়ংকর রসের সঙ্গে হাস্যরস মেলাতে দ্বিধা করেন নি। তাই তাঁর আঁকা রাক্ষসগুলিকে অনেক সময় মানুষেরই ঈষৎ উগ্র সংস্করণ বলে মনে হয়। আর মানুষদের নিয়ে যে হাসির ছবি, তাতে আমাদের অতি পরিচিত চেনাজানা মানুষদেরই দেখতে পাই হাস্যকর অবস্থায়, হাস্যকর ভাবভঙ্গীতে। এইসব ছবিতে কার্টুনের অতিরঞ্জন নেই, কারণ এ-হাসি অট্টহাসি নয়। এ হল মৃদু মোলায়েম স্নিগ্ধ সহজ হাসি, যাতে শ্লেষ বা বিদ্রূপের লেশমাত্র নেই। আসলে এ হাসি উপেন্দ্রকিশোরেরই চরিত্রের প্রতিফলন। মানুষ হিসাবে তাঁকে যাঁরা চিনতেন, তাঁরাও এই কথাই বলেন।

সুকুমারের হাসিতেও শ্লেষ ছিল না, তবে ব্যঙ্গ ছিল। প্রয়োজনে প্রাণখোলা অট্টহাসিতে পেছপা হতেন না তিনি, এবং সেটাও তাঁর স্বভাবেরই পরিচায়ক। সুকুমার রায়ের কৌতুকপ্রিয় মজলিসী মেজাজের কথা অনেকের কাছেই শুনেছি।

উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার কেউই আঁকা শেখেন নি। উপেন্দ্রকিশোরের কাজ দেখে সেটা বোঝার

উপায় নেই, কিন্তু সুকুমারের কাজে বোঝা যায়। নিছক অঙ্কনকৌশলে সুকুমার উপেন্দ্রকিশোরের সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু এই কৌশলের অভাব তিনি পূরণ করেছিলেন দুটি দুর্লভ গুণের সাহায্যে। এক হল তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, আরেক হল অফুরন্ত কল্পনাশক্তি। এই দুইয়ের সমন্বয়ে তাঁর ছবির বিষয়বস্তু টেকনিককে অতিক্রম করে চোখের সামনে জলজ্যান্ত রূপ ধারণ করে। তাই সুকুমারের আঁকা বাস্তব বা কাল্পনিক কোনো প্রাণীরই অস্তিত্বে অবিশ্বাস জাগে না। একদিকে যেমন কাঠবুড়ো বা চণ্ডীদাসের খুড়ো, অন্যদিকে তেমনি রামগরুড় বা হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বা গোমরাথেরিয়াম—সকলেই সমান জীবন্ত, সমান বিশ্বাসযোগ্য।

উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনাকালে সন্দেশে প্রকাশিত সুকুমারের কয়েকটি রচনায় তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯১৪ (১৩২১) সালে বেরোল আবোল তাবোল-শ্রেণীর প্রথম কবিতা 'খিচুড়ি'। এই প্রথম সুকুমার সাহিত্যে উদ্ভট প্রাণীর আবির্ভাব। এখানে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে ভাষার কারসাজিতে—

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।...

এই উদ্ভট সন্ধির নিয়মেই সৃষ্টি হল বকচ্ছপ, মোরগরু, গিরগিটিয়া, সিংহরিণ, হাতিমি। কিন্তু নামকরণেই শেষ নয়; উদ্ভট প্রাণীদের চেহারাটাও এঁকে দেখিয়ে দেওয়া হল।

এর কয়েকমাস পরেই সন্দেশ পাঠকদের পরিচয় কাঠবুড়োর সঙ্গে। এই কাষ্ঠতত্ত্ববিদ্‌ হলেন সুকুমারের অতি প্রিয় একটি বিশেষ শ্রেণীর চরিত্র। সংসারে উদ্ভট তত্ত্বে বিশ্বাসী বা উৎকট বাতিক-গ্রস্ত লোকের অভাব নেই। এইসব লোকেদের হাবভাবে মনে হয় এঁরা যেন আজগুবির রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য পা বাড়িয়েই আছেন। সুকুমারের কল্পনা তাঁদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে। 'আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত'—এমন অভিনব তত্ত্বে যিনি বিশ্বাসী, তাঁর প্রতি সমাজ কটাক্ষ করলেও, কাব্যে তাঁকে স্থান না দিয়ে উপায় নেই। আর তাঁর পাশেই একই পংক্তিতে স্থান দিতে হয় ছায়াধরার ব্যবসাদারকে, ফুটোস্কোপের আবিষ্কর্তাকে, চণ্ডীদাসের খুড়োকে, হেড আপিসের বড়বাবুকে।

সুকুমার কিন্তু এইসব চরিত্রকে সবসময় মানুষ হিসাবে কল্পনা করেন নি। মাঝে মাঝে এরা কাল্পনিক প্রাণীর চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম আবির্ভাব হুঁকোমুখো হ্যাংলার। ভাবখানা মানুষের, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জান্তব জগাখিচুড়ি। ইনি কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার হাট্টিমাটিম্‌টিম্‌ বা একানড়ের সমগোত্রীয় নন। ছড়ার এইসব উদ্ভট প্রাণীর কোনো চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নেই বললেই চলে। একানড়ে এক কথায় এক ধরনের জুজু, আর হাট্টিমাটিম্‌টিম্‌ হলেন শৃঙ্গ-বিশিষ্ট পক্ষিবিশেষ। এই দু' একটি উদ্ভট জীব ছাড়া প্রাক্‌-সুকুমার বাংলা সাহিত্যে কাল্পনিক প্রাণীর কথা মনেই পড়ে না। বিদেশী সাহিত্যে অবিশ্যি সুকুমারের আগেই লুইস ক্যারল ও এডওয়ার্ড লিয়ার কিছু আজগুবি জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন। ক্যারলের বিখ্যাত কবিতা জ্যাবারওয়াকি-র ব্রিলিগ বা বোরোগোভে সুকুমার মেজাজের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাও একটা মূল পার্থক্য রয়ে গেছে। জ্যাবারওয়াকি-র প্রাণীগুলি এমনই এক কল্পনার জগতে বাস করে যে তাদের কার্যকলাপের বর্ণনা দিতে আনকোরা নতুন শব্দ ব্যবহার করতে হয়—

'Twas brillig and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe
All mimsy were the borogoves
And the mome raths outgrabe

লিয়ারও একাধিক আজগুবি প্রাণী সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু ডং, জাম্বুলি, পবল, কাঙ্গল-

ওয়্যাঙগল্, ব্লু বস্-ওয়স্--এদের কাউকেই লিয়ার আমাদের চেনা-জানা জগতের খুব কাছে আসতে দেন নি। এদের জগৎটা প্রায় রূপকথারই জগৎ।

এদিকে হুঁকোমুখোর বাস কিন্তু বাংলাদেশে। শুধু তাই নয়—

শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার
আর তার কেহ নেই এছাড়া।

ঠিক তেমনি, ট্যাঁশগরুকে অনায়াসে দেখা যায় হারুদের আপিসে; কিম্ভূত কেঁদে মরে 'মাঠপারে, ঘাটপারে', কুমড়োপটাশও নিশ্চয়ই শহরের আশে-পাশেই ঘোরাফেরা করেন, নইলে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের এতটা সতর্ক হবার প্রয়োজন হত না। একমাত্র রামগরুড়ই দেখি সংগত কারণেই নিরিবিলি পরিবেশ বেছে নিয়েছে; কিন্তু সেও রূপকথার রাজ্যে নয়। অবিশ্যি এদের জগৎটাকে ঠিক বাস্তব জগৎও বলা চলে না। এটা আসলে হল সুকুমারের একান্ত নিজস্ব একটি জগৎ, এবং এই জগতের সৃষ্টিই হল সাহিত্যিক সুকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ছেলের সাহিত্য-প্রতিভার আভাস পেলেও, তার পূর্ণ বিকাশ দেখে যেতে পারেন নি। ১৯১৫ সালে বাহান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তার ফলে স্বভাবতই সন্দেশ সম্পাদনার ভার পড়ে সুকুমারের উপর।

ঠিক এই একই সময়ের ঘটনা হল মান্ডে ক্লাব, বা (সুকুমারের তর্জমায়) মণ্ডা সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা। তখনকার অনেক বিশিষ্ট তরুণ শিল্পী সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ্ ও কাব্যরসিকের উদ্যোগে তৈরী এই ক্লাবের মধ্যমণি ছিলেন সুকুমার। সভ্যদের তালিকায় সুকুমার ও তাঁর পরের ভাই সুবিনয়কে বাদ দিয়ে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, কালিদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি। ক্লাবের আলোচনাচক্রে প্লেটো-নীট্শে থেকে শুরু করে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-বৈষ্ণব কবিতা-রবীন্দ্রকাব্য কিছুই বাদ পড়ত না। এ ছাড়া হত গান বাজনা ভোজ পিকনিক আড্ডা আমোদ। ক্লাবের বিজ্ঞপ্তি ছাপা হত সুকুমারের প্রেসে, আর তার ভাষাও ছিল সুকুমারের। ক্লাব সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে একবার সভ্যদের কাছে ছাপা পোস্টকার্ড গেল—

সম্পাদক বেয়াকুব কোথা যে দিয়েছে ডুব
এদিকেতে হায় হায় ক্লাবটি যে যায় যায়
তাই বলি সোমবারে মদ্‌গৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি।
রকমারি পুঁথি যত নিজ নিজ রুচি মত
আনিবেন সাথে সবে কিছু কিছু পাঠ হবে।
—করজোড়ে বার বার নিবেদিছে সুকুমার।

এই ক্লাব ছাড়াও সুকুমারের আরেকটি কর্মক্ষেত্রের কথা এখানে বলা দরকার। এটা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ব্রাহ্ম যুবকদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও আলোচনার সাহায্যে সমাজের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে নবীনতা সঞ্চার করা ছিল সুকুমারের জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সমাজের আদিপর্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তাঁকে যেমন উদ্বুদ্ধ করত, মনে হয় ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁকে হতাশ করেছিল সমকালীন কিছু আদর্শচ্যুতির দৃষ্টান্ত। তাঁর একেবারে শেষদিকের রচনা ছোটদের জন্য পদ্যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস 'অতীতের ছবি'-র শেষ কয়েকটি ছত্রে এই কারণেই বোধহয় একটা হতাশার সুর লক্ষ করা যায়। এই সুর তাঁর আর অন্য কোনো রচনায় নেই।

সন্দেশ সম্পাদনার আগে শিশু-সাহিত্যের বাইরে কিছু রচনার মধ্যে প্রবাসীতে লেখা শিল্প ও ভাষা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ, ও দুটি নাটক চলচিত্তচঞ্চরী ও শব্দকল্পদ্রুমের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবন্ধগুলিতে সুকুমারের বিচারবুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটক দুটি প্রধানত আইডিয়ার আধার। সংঘাত যা আছে তাও আইডিয়ার সংঘাত। তা সত্ত্বেও এর উপভোগ্যতার প্রধান কারণ হল এর শাণিত কমিক সংলাপ। সুকুমারের যে মজলিসী মেজাজের কথা আগে বলেছি তার ষোল আনা পরিচয় এই দুটি নাটকে। সেই কারণেই এগুলি সবচেয়ে ভাল খোলে ঘরোয়া পরিবেশে।

সন্দেশের ভার স্কন্ধে ন্যস্ত হবার পর থেকেই সুকুমারের শিশুসাহিত্য সৃষ্টি দিনে দিনে বেড়ে চলে। শুধু গল্প কবিতা নয়; নানান বিষয়ে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, সারা বিশ্বের খুঁটিনাটি খবর, দেশ-বিদেশের উপকথা, স্বরচিত ধাঁধাঁ, হেঁয়ালি ইত্যাদিতে সন্দেশের পাতা ভরে ওঠে। এই সময়কার সন্দেশের যে-কোনো একটি সংখ্যা তুলে নিয়ে তার উপাদান বিশ্লেষণ করলে তা থেকে সার্থক শিশুসাহিত্যের কয়েকটি চিরন্তন সংজ্ঞার নির্দেশ পাওয়া যায়। 'স্কুল স্টোরি' বাংলায় সন্দেশের আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু পাগলা দাশু ইত্যাদি গল্পেই সুকুমার প্রথম দেখিয়ে দিলেন এসব গল্প কেমন হওয়া উচিত। দাশুর গল্পে চারু ও হারু সুলভ ভাবালুতা ও নৈতিক উপদেশ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। বরং চীনে পট্‌কার সাহায্যে পণ্ডিতমশাইকে কীভাবে অপদস্থ করতে হয় তার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

সুকুমার সম্পাদক হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই একটি ছোট গল্প সন্দেশে বেরোয় যেটি আমার মতে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। গল্পের নাম 'দ্রিঘাংচু'। এক রাজসভায় অকস্মাৎ একটি দাঁড়কাক প্রবেশ ক'রে গম্ভীর কণ্ঠে 'কঃ' শব্দটি উচ্চারণ করার ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাই নিয়েই গল্প। গল্পের শেষে রাজামশাইকে রাজপ্রাসাদের ছাতে একটি দাঁড়কাকের সামনে দাঁড়িয়ে চার লাইনের একটি মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। এই মন্ত্রটির একটি দশ লাইনের সংস্করণ সুকুমার তাঁর নাটক শব্দকল্পদ্রুমে বৃহস্পতির মন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। মন্ত্রটি হল এই—

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা
নেই মামা তাই কানা মামা
চিনে বাদাম সর্দি কাশি
ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি
মুশকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।

খাঁটি ননসেন্সের এর চেয়ে সার্থক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কোথায় বা কেন যে এর সার্থকতা, এই অসংলগ্ন অর্থহীন বাক্যসমষ্টির সামান্য অদল বদল করলেই কেন যে এর অঙ্গহানি হতে বাধ্য, তা বলা খুবই কঠিন। এর অনুকরণ চলে না, এর বিশ্লেষণ চলে না এবং জিনিয়াস ছাড়া এর উদ্ভাবন সম্ভব নয়।

সুকুমার রায় ননসেন্সের এই বিশেষ রসটিকে খেয়াল রস নাম দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য— এ-রস ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের নবরসের অন্তর্গত নয়। এ রসের কিছুটা আভাস পৃথিবীর সব দেশেরই গ্রাম্য ছড়ায় পাওয়া যায়—

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি
রেলকম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।

এই চার লাইনের অতি পরিচিত ছড়াটি যদুমাষ্টার-সংক্রান্ত কোন কৌতুকপূর্ণ ঘটনার টেলিগ্রাফ-সুলভ সংক্ষিপ্ত বিবরণ কি না তা আমার জানা নেই। যদি তা না হয় তবে এ-ও ননসেন্স, এবং এর রচয়িতাও নিঃসন্দেহে হাস্যরসিক। কিন্তু এই জাতীয় ছড়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল আলঙ্কারিক। অর্থাৎ হাসির চেয়ে ছন্দ ও শব্দঝঙ্কারের দিকেই এর লক্ষ বেশি। খাঁটি সাহিত্যিক ননসেন্স যেভাবে গাম্ভীর্যের মুখোশ প'রে হাসির উদ্রেক করে তার কোনো লক্ষণ গ্রাম্য ছড়ায় পাওয়া যাবে না, কারণ সে মেজাজটা একেবারে শিক্ষিত শহুরে মেজাজ।

গদ্যে বা পদ্যে হাস্যরসের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আদিকাল থেকেই রয়েছে। উইট-এর নমুনা যেমন মংগলকাব্যে বা ময়মনসিংহ-গীতিকায় পাওয়া যায়, তেমনি হুতোম-আলাল-বংকিম-ঈশ্বর গুপ্তেও পাওয়া যায়। কিন্তু এর কোনটাই যাকে বলে ননসেন্স তা নয়। অবিশ্যি তার মানে এই নয় যে পূর্বযুগের হাস্যরসিকদের কোনো লক্ষণই সুকুমারের মধ্যে দেখা যায় না। পান্-অনুপ্রাস অনোম্যাটোপিয়ার সাহায্যে হাসি যেমন আগে ছিল, তেমনি সুকুমারেও আছে। আলালে দেখি—

বেণীবাবু খান খাবু নাই গতি গঙ্গা
হুপ্‌হাপ্ গুপ্‌গাপ বেড়ে ওঠে দাঙ্গা।
বাবুরাম ধরে থাম 'থাম থাম' করে
ঠক ঠক ঠক ঠক কেঁপে মরে ডরে।

এই জিনিসই সুকুমারের হাতে পড়ে হল—

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম শুনে লাগে খট্‌কা
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা।
শাঁই শাঁই পন্ পন্, ভয়ে কান বন্ধ
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?

ইত্যাদি

আসলে, যে-কথা আগেই বলেছি, সুকুমারের ননসেন্সের অনেকখানি সুকুমারেরই সৃষ্টি। প্রভাবের কথাই যদি বলতে হয় তাহলে শুধু বাংলার হাসির ট্র্যাডিশনের কথা বললে চলে না, বিদেশী সাহিত্য, পান্টোমাইম, চার্লি চ্যাপলিন, বিলিতি কমিক্‌স (মার্কিন কমিক পুস্তকের ক্যাটজেন-জ্যামার কিড্‌স যে মোমবাতি-চোষা ডানপিটে ছেলের প্রেরণার উৎস সেটা আবোল তাবোলের ছবি দেখলেই বোঝা যায়)—এ সবই সুকুমারের ননসেন্সের পুষ্টি সাধন করেছে। এ জাতীয় ননসেন্সের রসগ্রহণ বাঙালি পাঠক করতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে সুকুমারের সংশয় ছিল; তাই আবোল তাবোলের ভূমিকায় তাঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল—'ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।'

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর শেষ বয়সের উদ্ভট ছড়ার সংকলন 'খাপছাড়া'-তে এই ধরনের একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সংকলনের প্রথম কবিতায়, আবোল তাবোলের 'আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা'-র মেজাজে পাগলামোর পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পদ্যে একটি ভূমিকাও লিখেছিলেন।

কিন্তু খাপছাড়ার ছড়া পাগলামোর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নি, কারণ খাঁটি ননসেন্সের

মেজাজ রবীন্দ্রনাথের ছিল না। ছড়ার প্রথম লাইনে যখনই দেখি—'নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরখ', তখনই তার বক্তব্যের চেয়ে আমাদের কৌতূহল বেশি চলে যায় 'শিরখ' শব্দের সম্ভাব্য মিলের দিকে। রবীন্দ্রনাথ অবিশ্যি তাঁর স্বাভাবিক সাবলীলতার সঙ্গেই আমাদের কৌতূহল মিটিয়েছেন, কিন্তু তার ফলে রচনার শৈলীগত চাতুরির দিকটা প্রকট হয়ে পাগলামির রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু যখন পড়ি—

রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা তার উপরে বসল রাজা
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না—.

তখন ছন্দ আর মিলের বাহাদুরির চেয়েও যেটা আমাদের বেশি অবাক করে সেটা এই যে, ইঁটের পাঁজার সঙ্গে রাজার, বা রাজার সঙ্গে বাদাম ভাজার যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা আমরা কল্পনাই করি নি। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ ছন্দ ছবি সব মিলে এক আশ্চর্য নতুন অনুভূতি আমাদের সাধারণ কাব্য ও সাধারণ কৌতুকের জগৎ থেকে এক নতুন জগতে নিয়ে যায়। এরই সঙ্গে আমাদের কৌতূহলও জেগে ওঠে ঠিকই, কিন্তু পূর্ব প্রত্যাশার কোনো চেনা পথ দিয়ে কবির আগে এগিয়ে যাবার কোনো উপায় বা আগ্রহ থাকে না, কারণ আমরা বুঝতে পারি যে পথটা একমাত্র কবিরই চেনা পথ।

১৯১৫ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত আট বছর সুকুমার সন্দেশ সম্পাদনা করেছিলেন। তার মধ্যে শেষের আড়াই বছরের অধিকাংশ সময়ই তাঁর রোগশয্যায় কেটেছে। কিন্তু রুগ্ন অবস্থাতেও তাঁর কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দেখলে অবাক হতে হয়। শুধু লেখা বা আঁকার কাজই নয়, ছাপার কাজেও যে তিনি অসুখের মধ্যে অনেক চিন্তা ব্যয় করেছেন তারও প্রমাণ রয়েছে। একটি নোটবুকে তাঁর আবিষ্কৃত কয়েকটি মুদ্রণ পদ্ধতির তালিকা রয়েছে। এগুলি পেটেন্ট নেবার পরিকল্পনা তাঁর মনে ছিল, কিন্তু কাজে হয়ে ওঠে নি।

লেখা ও আঁকার দিক দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির প্রায় সবই এই আড়াই বছরে। হ-য-ব-র-ল-এর রচনা ১৯২২ সালে। বাংলা গদ্যে ননসেন্সের এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি নিঃসন্দেহে লুইস ক্যারলের অ্যালিস দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখানেও সেই ঘাসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া, সেই স্বপ্ন, সেইসব চেনা আধচেনা জানোয়ার ও মানুষ চরিত্রের মিছিল, ভাষা নিয়ে সামাজিক আচার নিয়ে আইন-কানুন নিয়ে সেই তির্যক রসিকতা, আর সবশেষে ঘুম ভেঙে স্বপ্নের জগৎ থেকে সেই বাস্তবে ফিরে আসা। তফাৎ এই যে হ-য-ব-র-ল মেজাজে একেবারে ষোল আনা বাঙালি; এতই বাঙালি যে অন্য কোনো ভাষায় এর অনুবাদ কল্পনাই করা যায় না।

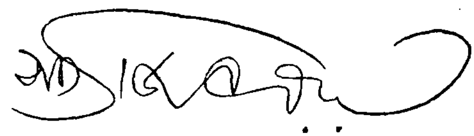
হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়ারি হ-য-ব-র-ল-রই সমসাময়িক। এখানেও ননসেন্স, কিন্তু এর মেজাজটা প্যারডির, এবং এই প্যারডির লক্ষ্য হল কোনান ডয়েল রচিত অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস দ্য লস্ট ওয়ার্লর্ড। ডয়েলের গল্পে বিংশ শতাব্দীতে প্রফেসার চ্যালেঞ্জার দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অঞ্চলে এক অজ্ঞাত জগৎ আবিষ্কার করেন যেখানে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা এখনো বসবাস করছে। সুকুমারের গল্পে চ্যালেঞ্জার হয়ে গেলেন প্রফেসার হুঁশিয়ার, আর ঘটনাস্থল হয়ে গেল কারাকোরাম পর্বতের এক অনাবিষ্কৃত অংশ। এখানেও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ছড়াছড়ি, কিন্তু এদের কোনো উল্লেখ প্রাণিবিদ্যা বা জীবতত্ত্বের কোনো বইয়েতে পাওয়া যাবে না। একমাত্র সুকুমারই এদের চেনেন, এবং বাংলা ও ল্যাটিন মিলিয়ে এদের নামকরণ একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এদের চেহারাও সুকুমার এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে এঁকেছেন যে যাদুঘরে গিয়ে ল্যাগ্‌বাগর্নিস, কট্‌কটোডন, চিল্লানোসরাস বা গোমরাথেরিয়ামের কঙ্কাল দেখতে না পেয়ে ভারি আশ্চর্য লাগে।

সারা অসুখের মধ্যেই একটি বিশেষ রচনার দিকে সুকুমারের মন বার বার ফিরে গেছে। অনেকগুলি খাতায় টুকরো টুকরো ভাবে রচনাটি ছড়িয়ে আছে। সুকুমার রচনাটির নাম দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীবর্ণমালাতত্ত্ব। বাংলা কাব্যে অনুপ্রাসের যে ধারা প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে, তারই একটা চমকপ্রদ পরিণতির সম্ভাবনা ছিল এই রচনায়। দুঃখের বিষয়, সুকুমার এটি শেষ করে যেতে পারেন নি।

সুকুমার রায়ের কোনো রচনাই তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণাংগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। আবোল তাবোল প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩। অর্থাৎ সুকুমারের মৃত্যুর ঠিক নয় দিন পরে। ছাপা বই দেখে না গেলেও, তার তিনরঙা মলাট, তার অংগসজ্জা, পাদপূরক দু-চার লাইনের কিছু ছড়া, টেল্‌পিসের ছবি ইত্যাদি সবই তিনি করে গিয়েছিলেন শয্যাশায়ী অবস্থায়। তাঁর শেষ রচনা ছিল আবোল তাবোলের শেষ কবিতা, যার বিচিত্র মিশ্র রস বাংলা সাহিত্যে চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। এটি রচনার সময় যে তাঁর উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল তার ইংগিত এর শেষ কয়েক ছত্রে আছে—

> আদিম কালের চাঁদিম হিম
> তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
> ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
> গানের পালা সাংগ মোর।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোনো রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

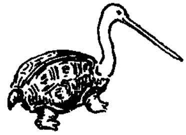


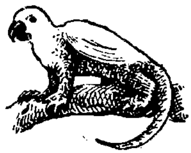




আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব্‌হীন।
আজ্‌গুবি চাল্ বেঠিক বেতাল
মাত্‌বি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে॥



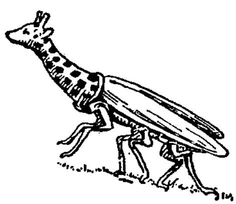


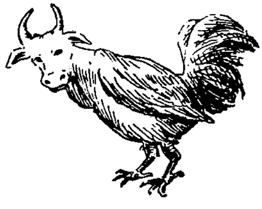


খিচুড়ি

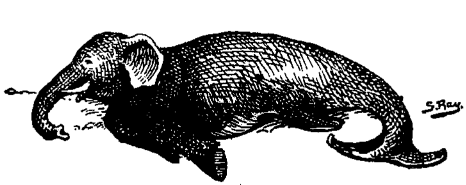
হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল ''হাঁসজারু'' কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—''বাহবা কি ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মুর্তি।''
টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা—
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা?
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি!
জিরাফের সাধ নাই মাঠে ঘাটে ঘুরিতে,
ফড়িঙের ঢং ধরি' সেও চায় উড়িতে।
গরু বলে, ''আমারেও ধরিল কি ও রোগে?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে?''
হাতিমির দশা দেখ,—তিমি ভাবে জলে যাই,
হাতি বলে, ''এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।''
সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট—
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট।











হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ,
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে গুন্ গুন্ সংগীত—
ভাব দেখে মনে হয় না জানি কি পণ্ডিত!

কাঠ-বুড়ো

বিড়্ বিড়্ কি যে বকে নাহি তার অর্থ—
"আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত।"
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম,
রেগে বলে, "কেবা বোঝে এ সবের মর্ম?

আরে মোলো, গাধাগুলো একেবারে অন্ধ,
বোঝেনাকো কোনো কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব।
কোন্ কাঠে কত রস জানে নাকো তত্ত্ব—
একাদশী রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত?"

আশে পাশে হিজি বিজি আঁকে কত অঙ্ক—
ফাটা কাঠ ফুটো কাঠ হিসাব অসংখ্য;
কোন্ ফুটো খেতে ভাল, কোন্‌টা বা মন্দ,
কোন্ কোন্ ফাটলের কি রকম গন্ধ।



কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক্ শব্দ,
বলে, "জানি কোন্ কাঠ কিসে হয় জব্দ।
কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি পষ্ট,
এ কাঠের বজ্জাতি কিসে হয় নষ্ট।

কোন্ কাঠ পোষ মানে, কোন্ কাঠ শান্ত,
কোন্ কাঠ টিম্‌টিমে, কোন্‌টা বা জ্যান্ত।
কোন্ কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কি সত্য,
আমি জানি কোন্ কাঠে কেন থাকে গর্ত।"

গোঁফ চুরি

হেড্ আফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জান্‌ত?
দিব্যি ছিলেন খোস্‌মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা ব'সে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে!
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখ্‌টি ক'রে গোল
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল"!
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে, "কাম্‌ড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস্।"
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক কর্‌ছে ঘোরাঘুরি—
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি"!
গোঁফ হারান! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি?
গোঁফ জোড়া ত তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সাম্‌নে ধ'রে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয় না।

রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
"এমন গোঁফ ত রাখ্‌ত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস কর্‌ব তোদের জবাই"—
এই না ব'লে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
"আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
"ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধ'রে খুব নাচি,
"মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধ'রে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"



সৎ পাত্র

শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে—
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে?
জান্‌তে চাও সে কেমন ছেলে?
মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল—
রঙ যদিও বেজায় কালো;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।
বিদ্যে বুদ্ধি? বল্‌ছি মশাই—
ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়!
উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হ'য়ে থাম্‌ল শেষে।
বিষয় আশয়? গরীব বেজায়—
কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে যায়।

মানুষ ত নয় ভাইগুলো তার—
একটা পাগল একটা গোঁয়ার;
আরেকটি সে তৈরি ছেলে,
জাল ক'রে নোট্ গেছেন জেলে।
কনিষ্ঠটি তব্‌লা বাজায়
যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।
গঙ্গারাম ত কেবল ভোগে
পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে।
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর,
কংসরাজের বংশধর!
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের।—
যাহোক্, এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দ ছেলে?

ভাল রে ভাল!

দাদা গো! দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর—

এই দুনিয়ার সকল ভাল,
আসল ভাল নকল ভাল,
সস্তা ভাল দামীও ভাল,
তুমিও ভাল আমিও ভাল,
হেথায় গানের ছন্দ ভাল,
হোথায় ফুলের গন্ধ ভাল,
মেঘ-মাখানো আকাশ ভাল,
ঢেউ-জাগানো বাতাস ভাল,
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল,
ময়লা ভাল ফর্‌সা ভাল,
পোলাও ভাল কোর্মা ভাল,
মাছপটোলের দোল্‌মা ভাল,
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল,
সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল,
কাঁসিও ভাল ঢাক্‌ও ভাল,
টিকিও ভাল টাকও ভাল,
ঠেলার গাড়ী ঠেল্‌তে ভাল,
খাস্তা লুচি বেল্‌তে ভাল,
গিট্‌কিরি গান শুন্‌তে ভাল,
শিমুল তুলো ধুন্‌তে ভাল,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল,
কিন্তু সবার চাইতে ভাল—

—পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়।

কাতুকুতু বুড়ো

আর যেখানে যাওনা রে ভাই সপ্তসাগর পার,
কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার!
সর্বনেশে বৃদ্ধ সে ভাই যেও না তার বাড়ী—
কাতুকুতুর কুল্‌পি খেয়ে ছিঁড়বে পেটের নাড়ী।
কোথায় বাড়ী কেউ জানে না, কোন্‌ সড়কের মোড়ে,
একলা পেলে জোর ক'রে ভাই গল্প শোনায় প'ড়ে।
বিদ্‌ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন্‌ দেশী,
শুনলে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশি !
না আছে তার মুণ্ডু মাথা, না আছে তার মানে,
তবুও তোমায় হাস্‌তে হবে তাকিয়ে বুড়োর পানে।
কেবল যদি গল্প বলে তাও থাকা যায় সয়ে,
গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেয় লম্বা পালক লয়ে।
কেবল বলে, "হোঃ হোঃ হোঃ, কেষ্টদাসের পিসী—
বেচ্‌ত খালি কুম্‌ড়ো কচু হাঁসের ডিম আর তিসি।
ডিমগুলো সব লম্বা মতন, কুমড়োগুলো বাঁকা,
কচুর গায়ে রংবেরঙের আল্‌পনা সব আঁকা।
অষ্ট প্রহর গাইত পিসী আওয়াজ ক'রে মিহি,
ম্যাও ম্যাও ম্যাও বাকুম্‌ বাকুম্‌ ভৌ ভৌ ভৌ চীঁহি।"
এই না বলে কুটুৎ ক'রে চিম্‌টি কাটে ঘাড়ে,
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।
তোমায় দিয়ে সুড়সুড়ি সে আপনি লুটোপুটি,—
যতক্ষণ না হাস্‌বে তোমার কিচ্ছুতে নাই ছুটি!



গানের গুঁতো

গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা—
আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা!
গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া, গাইছে তেড়ে প্রাণপণ,
ছুট্‌ছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্‌ ভন্‌।
মর্‌ছে কত জখম হয়ে কর্‌ছে কত ছট্‌ ফট্‌—
বলছে হেঁকে, ''প্রাণটা গেল, গানটা থামাও ঝট্‌ পট্‌।''
বাঁধন-ছেঁড়া মহিষ ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত;
ভীষ্মলোচন গাইছে তেড়ে নাইকো তাহে দৃক্‌পাত।
চার পা তুলি জন্তুগুলি পড়্‌ছে বেগে মূর্ছায়,
লাঙ্গুল খাড়া পাগল পারা বল্‌ছে রেগে ''দূর ছাই।''
জলের প্রাণী অবাক মানি গভীর জলে চুপ চাপ্‌,
গাছের বংশ হ'চ্ছে ধ্বংস পড়্‌ছে দেদার ঝুপ ঝাপ্‌।
শূন্য মাঝে ঘূর্ণা লেগে ডিগবাজি খায় পক্ষী,
সবাই হাঁকে, ''আর না দাদা, গানটা থামাও লক্ষ্মী।''
গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফাটে বিল্‌কুল্‌
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোস্‌মেজাজে দিল্‌ খুল্‌।
এক যে ছিল পাগ্‌লা ছাগল, এম্‌নি সেটা ওস্তাদ,
গানের তালে শিং বাগিয়ে মারলে গুঁতো পশ্চাৎ।
আর কোথা যায় একটি কথায় গানের মাথায় ডাণ্ডা,
'বাপরে' ব'লে ভীষ্মলোচন এক্কেবারে ঠাণ্ডা।

শব্দ কল্প দ্রুম্‌!

ঠাস্‌ ঠাস্‌ দ্রুম্‌ দ্রাম্‌, শুনে লাগে খট্‌কা—
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্‌পন্‌, ভয়ে কান্‌ বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ?
হুড়মুড় ধুপ্‌ধাপ্‌—ওকি শুনি ভাই রে!
দেখ্‌ছ না হিম পড়ে—যেওনাকো বাইরে।
চুপ্‌ চুপ্‌ ঐ শোন্‌! ঝুপ্‌ঝাপ্‌ ঝপা—স!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল?—গব্‌ গব্‌ গবা—স্‌!
খ্যাঁশ্‌ খ্যাঁশ্‌ ঘ্যাঁচ্‌ ঘ্যাঁচ্‌, রাত কাটে ঐরে!
দুড়্‌ দাড়্‌ চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে!
ঘর্ঘর ভন্‌ভন্‌ ঘোরে কত চিন্তা!
কত মন নাচে শোন্‌—ধেই ধেই ধিন্‌তা!
ঠুংঠাং ঢংঢং, কত ব্যথা বাজে রে—
ফট্‌ ফট্‌ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!
হৈ হৈ মার্‌ মার্‌, ''বাপ্‌ বাপ্‌'' চীৎকার—
মালকোঁচা মারে বুঝি? সরে পড়্‌ এইবার।

খুড়োর কল

কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো—
সবাই শুনে সাবাস্ বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।
খুড়োর যখন অল্প বয়স—বছর খানেক হবে—
উঠ্‌লো কেঁদে 'গুংগা' ব'লে ভীষণ অট্টরবে।
আর তো সবাই 'মামা' 'গাগা' আবোল তাবোল বকে;
খুড়োর মুখে 'গুংগা' শুনে চম্‌কে গেল লোকে।
বল্‌লে সবাই, ''এই ছেলেটা বাঁচলে পরে তবে,
বুদ্ধি জোরে এ সংসারে একটা কিছু হবে।''
সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে,
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘণ্টায় চলে।
দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘণ্টা পাঁচেক ঘাঁট্‌লে পরে আপনি যাবে বোঝা।
বল্‌ব কি আর কলের ফিকির, বল্‌তে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে এক্কেবারে খাসা।

সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যে রকম রুচি—
মণ্ডা মিঠাই চপ্ কাট্‌লেট্ খাজা কিংবা লুচি।
মন বলে তায় 'খাব খাব', মুখ চলে তায় খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে।
এমনি ক'রে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁস্ রবে না চল্‌বে কেবল ধেয়ে।
হেসে খেলে দু'দশ যোজন চল্‌বে বিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হ'য়ে জিভের জলে ভেসে।
সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো,
অতুল কীর্তি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।



লড়াই-ক্ষ্যাপা

ওই আমাদের পাগ্‌লা জগাই, নিত্যি হেথায় আসে;
আপন মনে গুন্‌ গুনিয়ে মুচ্‌কি হাসি হাসে।
চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন থমক লেগে থামে,
তড়াক্‌ ক'রে লাফ দিয়ে যায় ডাইনে থেকে বামে।
ভীষণ রোখে হাত গুটিয়ে সামলে নিয়ে কোঁচা;
"এইয়ো" বলে ক্ষ্যাপার মতো শূন্যে মারে খোঁচা।
চেঁচিয়ে বলে, "ফাঁদ পেতেছ? জগাই কি তায় পড়ে?
সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে।"
উৎসাহেতে গরম হ'য়ে তিড়িংবিড়িং নাচে,
কখনও যায় সামনে তেড়ে, কখনও যায় পাছে।
এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি ধুপুস্‌ধাপুস্‌ কত!
চক্ষু বুজে কায়দা খেলায় চর্কিবাজির মত।
লাফের চোটে হাঁপিয়ে ওঠে গায়েতে ঘাম ঝরে,
দুড়ুম ক'রে মাটির পরে লম্বা হয়ে পড়ে।
হাত পা ছুঁড়ে চেঁচায় খালি চোখ্‌টি ক'রে ঘোলা,
"জগাই মোলো হঠাৎ খেয়ে কামানের এক গোলা"!
এই না ব'লে মিনিট খানেক ছট্‌ফটিয়ে খুব,
মড়ার মত শক্ত হ'য়ে এক্কেবারে চুপ!
তার পরেতে সটান্‌ ব'সে চুল্‌কে খানিক মাথা,
পকেট থেকে বার করে তার হিসেব লেখার খাতা।
লিখ্‌ল তাতে—"শোন্‌রে জগাই, ভীষণ লড়াই হলো
পাঁচ ব্যাটাকে খতম ক'রে জগাই দাদা মোলো।"



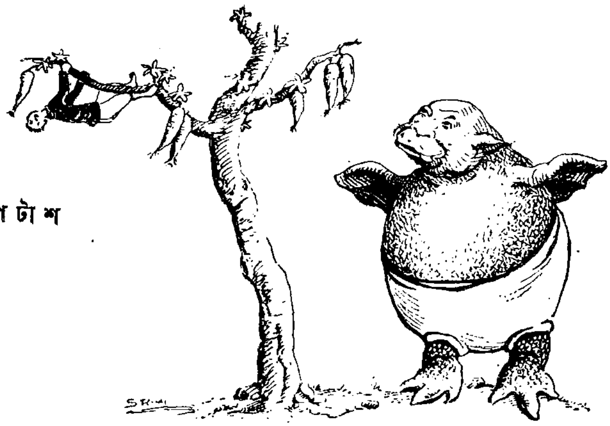
বাবুরাম সাপুড়ে

বাবুরাম সাপুড়ে,
কোথা যাস্‌ বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা,
দুটো সাপ রেখে যা!
যে সাপের চোখ্‌ নেই,
শিং নেই নোখ্‌ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না,
কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস্‌ ফাঁস্‌,
মারে নাকো ঢুঁশ্‌ ঢাঁশ,
নেই কোন উৎপাত,
খায় শুধু দুধ ভাত—
সেই সাপ জ্যান্ত
গোটা দুই আনত!
তেড়ে মেরে ডান্ডা
ক'রে দিই ঠান্ডা।

ছায়াবাজি

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি ক'রে গাত্রে হল ব্যথা!
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জাননা বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি!
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালের শুক্‌নো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুর বেলায় আকাশ পথে ঘুরে
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখ্‌ছি কত ঘেঁটে—
হাল্কা মেঘের পান্‌সে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।
কেউ জানে না এসব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মত ছায়ার পিছুপিছু।
তোমরা ভাব গাছের ছায়া অম্‌নি লুটায় ভূঁয়ে,
অম্‌নি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে;
আসল ব্যাপার জান্‌বে যদি আমার কথা শোনো,
বল্‌ছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার রয়না কাছে, দেখ্‌তে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছট্‌ফটিয়ে এদিক ওদিক চায়।
সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হ'তে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্‌ করে ধর্‌বে তারে ঠেসে।
পাৎলা ছায়া, ফোক্‌লা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।
গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপ্‌রে ব'লে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাক্‌বে তাহার নাক্‌।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পার,
শুঁক্‌লে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।
আম্‌ড়া গাছের নোংরা ছায়া কাম্‌ড়ে যদি খায়
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদ্‌লা দিনে বাঁচ্‌তে যদি চাও,
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখ্‌ছি ঘরে পুষে!
পাক্কা নতুন টাট্‌কা ওষুধ এক্কেবারে দিশি—
দাম করেছি শস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।





কুম্‌ড়োপটাশ

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ নাচে—
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে;
চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে;
চার পা তুলে থাক্‌বে ঝুলে হট্টমুলার গাছে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ কাঁদে—
খবরদার! খবরদার! বস্‌বে না কেউ ছাদে;
উপুড় হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে,
বেহাগ সুরে গাইবে খালি 'রাধে কৃষ্ণ রাধে'!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ হাসে—
থাক্‌বে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্নাঘরের পাশে;
ঝাপ্‌সা গলায় ফার্সি কবে নিশ্বাসে ফিস্‌ফাসে;
তিনটি বেলা উপোস্‌ ক'রে থাকবে শুয়ে ঘাসে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ ছোটে—
সবাই যেন তড়্‌বড়িয়ে জানলা বেয়ে ওঠে;
হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে;
ভুলেও যেন আকাশ পানে তাকায় না কেউ মোটে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ ডাকে—
সবাই যেন শাম্‌লা এঁটে গামলা চ'ড়ে থাকে;
ছেঁচ্‌কি শাকের ঘন্ট বেটে মাথায় মলম মাখে;
শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষ্‌তে থাকে নাকে।

তুচ্ছ ভেবে এসব কথা করছে যারা হেলা,
কুম্‌ড়োপটাশ জান্‌তে পেলে বুঝ্‌বে তখন ঠেলা।
দেখবে তখন কোন্‌ কথাটি কেমন ক'রে ফলে,
আমায় তখন দোষ দিও না, আগেই রাখি ব'লে।

সাবধান !

আরে আরে, ওকি কর প্যালারাম বিশ্বাস?
ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ অত জোরে ফেলোনাকো নিশ্বাস!
জানোনা কি সে বছর ওপাড়ার ভুতোনাথ,
নিশ্বাস নিতে গিয়ে হয়েছিল কুপোকাৎ?
হাঁপ ছাড় হ্যাঁস্‌ফ্যাঁস্‌ ও রকম হাঁ ক'রে—
মুখে যদি ঢুকে বসে পোকা মাছি মাকড়ে?
বিপিনের খুড়ো হয় বুড়ো সেই হল'রায়,
মাছি খেয়ে পাঁচমাস ভুগেছিল কলেরায়।
তাই বলি—সাবধান! ক'রোনাকো ধুপ্‌ধাপ্‌,
টিপি টিপি পায় পায় চলে যাও চুপ্‌ চাপ্‌।
চেয়োনাকো আগে পিছে, যেয়োনাকো ডাইনে—
সাবধানে বাঁচে লোকে,—এই লেখে আইনে।
পড়েছ ত কথামালা? কে যেন সে কি ক'রে
পথে যেতে প'ড়ে গেল পাতকো'র ভিতরে?
ভালো কথা—আর যেন সকালে কি দুপুরে,
নেয়োনাকো কোনো দিন ঘোষেদের পুকুরে;
এরকম মোটা দেহে কি যে হবে কোন দিন,
কথাটাকে ভেবে দেখ কি রকম সঙিন!
চটো কেন? হয় নয় কেবা জানে পষ্ট,
যদি কিছু হ'য়ে পড়ে পাবে শেষে কষ্ট।
মিছিমিছি ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ কেন কর তক্ক?
শিখেছ জ্যাঠামো খালি, ইঁচড়েতে পক্ক,
মান্‌বে না কোনো কথা চলা ফেরা আহারে,
একদিন টের পাবে ঠেলা কয় কাহারে।
রমেশের মেঝ মামা সেও ছিল সেয়না,
যত বলি ভালো কথা কানে কিছু নেয় না—
শেষকালে একদিন চান্নির বাজারে
প'ড়ে গেল গাড়ি চাপা রাস্তার মাঝারে!



বুড়ীর বাড়ী



গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি,
ঝুর্‌ঝুরে প'ড়ো ঘরে থুর্‌থুরে বুড়ী।
কাঁথাভরা ঝুল্‌কালি, মাথাভরা ধুলো,
মিট্‌ মিটে ঘোলা চোখ, পিটখানা কুলো।
কাঁটা দিয়ে আঁটা ঘর—আঠা দিয়ে সেঁটে,
সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে থুতু দিয়ে চেটে।
ভর দিতে ভয় হয় ঘর বুঝি পড়ে,
খক্‌ খক্‌ কাশি দিলে ঠক্‌ ঠক্‌ নড়ে।
ডাকে যদি ফিরিওয়ালা, হাঁকে যদি গাড়ি,
খসে পড়ে কড়িকাঠ ধসে পড়ে বাড়ী।
বাঁকাচোরা ঘরদোর ফাঁকা ফাঁকা কত,
ঝাঁট্‌ দিলে ঝ'রে পড়ে কাঠকুটো যত।
ছাদগুলো ঝুলে পড়ে বাদ্‌লায় ভিজে,
একা বুড়ী কাঠি গুঁজে ঠেকা দেয় নিজে।
মেরামত দিনরাত কেরামত ভারি,
থুর্‌থুরে বুড়ী তার ঝুর্‌ঝুরে বাড়ী॥

প্যাঁচা আর প্যাঁচানি

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি,
খাসা তোর চ্যাঁচানি!
শুনে শুনে আন্‌মন
নাচে মোর প্রাণমন!
মাজা-গলা চাঁচা সুর
আহ্লাদে ভরপুর!
গলা-চেরা ধমকে
গাছ পালা চমকে,
সুরে সুরে কত প্যাঁচ
গিট্‌কিরি ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌!
যত ভয় যত দুখ
দুরু দুরু ধুক্‌ ধুক্‌,
তোর গানে পেঁচি রে
সব ভুলে গেছি রে—
চাঁদ মুখে মিঠে গান
শুনে ঝরে দু'নয়ান।

একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামৎ—
কাটা ছেঁড়া ভাঙা চেরা চট্‌পট্‌ মেরামৎ।
কয়েছেন গুরু মোর, "শোন শোন বৎস,
কাগজের রোগী কেটে আগে কর মক্‌স"।
উৎসাহে কি না হয়? কি না হয় চেষ্টায়?
অভ্যাসে চট্‌পট্‌ হাত পাকে শেষটায়।
খেটে খুটে জল হ'ল শরীরের রক্ত—
শিখে দেখি বিদ্যেটা নয় কিছু শক্ত।
কাটা ছেঁড়া ঠুক্‌ ঠাক্‌, কত দেখ যন্ত্র,
ভেঙে চুরে জুড়ে দেই তারও জানি মন্ত্র।
চোখ বুজে চট্‌পট্‌ বড় বড় মূর্তি,
যত কাটি ঘ্যাঁস্‌ ঘ্যাঁস্‌ তত বাড়ে ফুর্তি।
ঠ্যাং-কাটা গলাকাটা কত কাটা হস্ত,
শিরিষের আঠা দিয়ে জুড়ে দেয় চোস্ত।
এইবারে বলি তাই, রোগী চাই জ্যান্ত—
ওরে ভোলা, গোটাছয় রোগী ধরে আন্‌ত!

গেঁটেবাতে ভুগে মরে ও পাড়ার নন্দী,
কিছুতেই সারাবে না এই তার ফন্দি—
এক দিন এনে তারে এইখানে ভুলিয়ে,
গেঁটেবাত ঘুঁটে-ঘেঁটে সব দেব ঘুলিয়ে।
কার কানে কট্‌কট্‌ কার নাকে সর্দি?
এস, এস, ভয় কিসে? আমি আছি বদ্যি।
শুয়ে কেরে? ঠ্যাং-ভাঙা? ধরে আন্‌ এখেনে—
স্ক্রুপ্‌ দিয়ে এঁটে দিব কি রকম দেখেনে।
গাল ফোলা কাঁদ কেন? দাঁতে বুঝি বেদনা?
এস এস ঠুকে দেই--আর মিছে কেঁদ না,
এই পাশে গোটা দুই, ওই পাশে তিনটে—
দাঁতগুলো টেনে দেখি—কোথা গেল চিম্‌টে?
ছেলে হও, বুড়ো হও, অন্ধ কি পঙ্গু,
মোর কাছে ভেদ নাই, কলেরা কি ডেঙ্গু—
কালাজ্বর, পালাজ্বর, পুরানো কি টাট্‌কা,
হাতুড়ির একঘায়ে একেবারে আট্‌কা!

হা তু ড়ে



কিম্ভূত



বিদ্‌ঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত,
সারাদিন ধ'রে তার শুনি শুধু খুঁৎ খুঁৎ।
মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মরে খালি সে,
ঘ্যান্ ঘ্যান্ আব্‌দারে ঘন ঘন নালিশে।
এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না—
কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না।
কোকিলের মত তার কণ্ঠেতে সুর চাই,
গলা শুনে আপনার বলে, "উঁহু, দূর ছাই!"
আকাশেতে উড়ে যেতে পাখিদের মানা নেই—
তাই দেখে মরে কেঁদে— তার কেন ডানা নেই!
হাতিটার কী বাহার দাঁতে আর শুণ্ডে—
ও রকম জুড়ে তার দিতে হবে মুণ্ডে!
কাঙ্গারুর লাফ দেখে ভারি তার হিংসে—
ঠ্যাং চাই আজ থেকে ঢ্যাংঢেঙে চিম্‌সে!
সিংহের কেশরের মত তার তেজ কৈ?
পিছে খাসা গোসাপের খাঁজকাটা লেজ কৈ?
একলা সে সব হ'লে মেটে তার প্যাখনা;
যারে পায় তারে বলে, "মোর দশা দেখ্ না!"

কেঁদে কেঁদে শেষটায়— আষাঢ়ের বাইশে
হ'ল বিনা চেষ্টায় চেয়েছে যা তাই সে।
ভুলে গিয়ে কাঁদাকাটি আহ্লাদে আবেশে
চুপিচুপি একলাটি ব'সে ব'সে ভাবে সে—
লাফ দিয়ে হুশ্ করে হাতি কভু নাচে কি?
কলাগাছ খেলে পরে কাঙ্গারুটা বাঁচে কি?
ভোঁতামুখে কুহুডাক শুনে লোকে কবে কি?
এই দেহে শুঁড়ো নাক খাপছাড়া হবে কি?
"বুড়ো হাতি ওড়ে" ব'লে কেউ যদি গালি দেয়?
কান টেনে ল্যাজ ম'লে "দুয়ো" ব'লে তালি দেয়?
কেউ যদি তেড়েমেড়ে বলে তার সাম্‌নেই—
"কোথাকার তুই কেরে, নাম নেই ধাম নেই?"
জবাব কি দেবে ছাই, আছে কিছু বল্‌বার?
কাঁচুমাচু ব'সে তাই, মনে শুধু তোল্‌পাড়—
"নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ বিচ্ছু,
মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু।
মাছ ব্যাং গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,
"নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই!"

চোর ধরা

আছে ছি ছি! রাম রাম! ব'লো না হে ব'লো না—
চল্‌ছে যা জুয়াচুরি, নাহি তার তুলনা।
যেই আমি দেই ঘুম টিফিনের আগেতে,
ভয়ানক ক'মে যায় খাবারের ভাগেতে!
রোজ দেখি খেয়ে গেছে, জানিনেকো কারা সে—
কাল্‌কে যা হ'য়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে!
পাঁচখানা কাট্‌লেট্‌, লুচি তিন গণ্ডা,
গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মণ্ডা,
আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙ্‌নি—
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শূন্যি!
তাই আজ ক্ষেপে গেছি—কত আর পার্‌ব?
এতদিন স'য়ে স'য়ে এইবারে মার্‌ব।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁসিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা।
রামু হও, দামু হও, ওপাড়ার ঘোষ বোস—
যেই হও এইবারে থেমে যাবে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌।
খাট্‌বে না জারি জুরি আঁট্‌বে না মার্‌প্যাঁচ্‌,
যারে পাব ঘাড়ে ধ'রে কেটে দেব ঘ্যাঁচ্‌ ঘ্যাঁচ্‌।
এই দেখ ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়ালে,
এইবারে টের পাবে মুণ্ডুটা বাড়ালে।
রোজ বলি "সাবধান!" কানে তবু যায় না?
ঠেলাখানা বুঝ্‌বিত এইবারে আয় না!



ঢপ্‌ ঢপ্‌ ঢাক্‌ ঢোল ভপ্‌ ভপ্‌ বাঁশি
ঝন ঝন্‌ করতাল্‌ ঠন্‌ ঠন্‌ কাঁসি।
ধুমধাম বাপ্‌ বাপ্‌ ভয়ে ভ্যাবা চ্যাকা
বাবুদের ছেলেটার দাঁত গেছে দেখা॥

আকাশের গায়ে কিবা রামধনু খেলে,
দেখে চেয়ে কত লোক সব কাজ ফেলে;
তাই দেখে খুঁৎ ধরা বুড়ো কয় চটে,
দেখ্‌ছ কি, এই রং পাকা নয় মোটে॥

বোম্বাগড়ের রাজা



কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা—
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন ব্যালিশ বাঁধা?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?
কেন সেথায় সর্দি হ'লে ডিগ্‌বাজি খায় লোকে?
জোছ্‌না রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে?
ওস্তাদেরা লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?
টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে?
রাত্রে কেন ট্যাঁক্‌ঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে?
কেন রাজার বিছ্‌না পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে?
সভায় কেন চেঁচায় রাজা "হুক্কা হুয়া" ব'লে?
মন্ত্রী কেন কল্‌সী বাজায় ব'সে রাজার কোলে?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?
কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসী?
রাজার খুড়ো নাচেন কেন হুঁকোর মালা প'রে?
এমন কেন ঘট্‌ছে তা কেউ বলতে পার মোরে?





নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার?



রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা তার উপরে বস্‌ল রাজা—
ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিল্‌ছে না।
গায়ে আঁটা গরম জামা পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা;
রাজা বলে, "বৃষ্টি নামা—নইলে কিচ্ছু মিল্‌ছে না।"
থাকে সারা দুপুর ধ'রে ব'সে ব'সে চুপটি ক'রে,
হাঁড়িপানা মুখটি ক'রে আঁক্‌ড়ে ধ'রে শ্লেটটুকু;
ঘেমে ঘেমে উঠছে ভিজে ভ্যাবাচ্যাকা একলা নিজে,
হিজিবিজি লিখ্‌ছে কি যে বুঝ্‌ছে না কেউ একটুকু।

ঝাঁঝা রোদ আকাশ জুড়ে, মাথাটার ঝাঁঝ্‌রা ফুঁড়ে,
মগজেতে নাচ্‌ছে ঘুরে রক্তগুলো ঝনর্‌ ঝন্‌;
ঠাঠা-পড়া দুপুর দিনে, রাজা বলে, "আর বাঁচিনে,
ছুটে আন্‌ বরফ কিনে—ক'চ্ছে কেমন গা ছন্‌ছন্‌।"
সবে বলে, "হায় কি হল! রাজা বুঝি ভেবেই মোলো!
ওগো রাজা মুখ্‌টি খোল—কওনা ইহার কারণ কি?
রাঙামুখ পান্‌সে যেন তেলে ভাজা আম্‌সি হেন,
রাজা এত ঘাম্‌ছে কেন—শুনতে মোদের বারণ কি?"

রাজা বলে, "কেইবা শোনে   যে কথাটা ঘুর্‌ছে মনে,
মগজের নানান্‌ কোণে—আন্‌ছি টেনে বাইরে তায়,
সে কথাটা বলছি শোন,   যতই ভাব যতই গোন,
নাহি তার জবাব কোন কূলকিনারা নাইরে হায়।
লেখা আছে পুঁথির পাতে,   'নেড়া যায় বেলতলাতে,'
নাহি কোনো সন্ধ' তাতে—কিন্তু প্রশ্ন 'কবার যায়?'
এ কথাটা এদ্দিনেও   পারে নিকো বুঝ্‌তে কেও,
লেখে নিকো পুস্তকেও, দিচ্ছে না কেউ জবাব তায়।

লাখোবার যায় যদি সে   যাওয়া তার ঠেকায় কিসে?
ভেবে তাই পাইনে দিশে   নাই কি কিচ্ছু উপায় তার?"
একথাটা যেম্নি বলা   রোগা এক ভিস্তিও'লা
ঢিপ্‌ ক'রে বাড়িয়ে গলা প্রণাম কর্‌ল দু পায় তাঁর।
হেসে বলে, "আজ্ঞে সে কি?   এতে আর গোল হবে কি?
নেড়াকে তো নিত্যি দেখি আপন চোখে পরিষ্কার—
আমাদেরি বেলতলা সে   নেড়া সেথা খেল্‌তে আসে
হরে দরে হয়তো মাসে নিদেন পক্ষে পঁচিশ বার।"

ঠি কা না

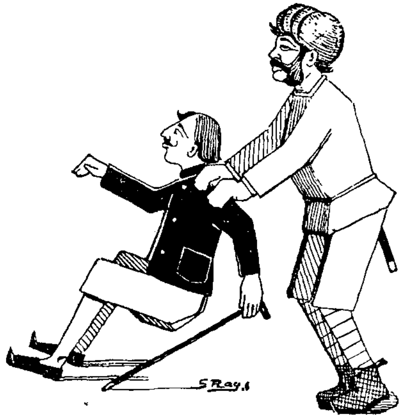
আরে আরে জগমোহন—এস, এস, এস—
বল্‌তে পার কোথায় থাকে আদ্যানাথের মেশো?
আদ্যানাথের নাম শোনোনি? খগেনকে তো চেনো?
শ্যাম বাগ্‌চি খগেনেরই মামাশ্বশুর জেনো।
শ্যামের জামাই কেষ্টমোহন, তার যে বাড়ীওয়ালা—
(কি যেন নাম ভুলে গেছি), তারই মামার শালা;
তারই পিশের খুড়্‌তুতো ভাই আদ্যানাথের মেশো—
লক্ষ্মী দাদা, ঠিকানা তার একটু জেনে এসো।
ঠিকানা চাও? বল্‌ছি শোন; আমড়াতলার মোড়ে
তিন-মুখো তিন রাস্তা গেছে তারি একটা ধ'রে,
চল্‌বে সিধে নাকবরাবর, ডানদিকে চোখ রেখে;
চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌বে শেষে রাস্তা গেছে বেঁকে।
দেখ্‌বে সেথায় ডাইনে বাঁয়ে পথ গিয়েছে কত,
তারি ভিতর ঘুর্‌বে খানিক গোলোকধাঁধাঁর মত।
তার পরেতে হঠাৎ বেঁকে ডাইনে মোচড় মেরে,
ফির্‌বে আবার বাঁয়ের দিকে তিন্‌টে গলি ছেড়ে।
তবেই আবার পড়্‌বে এসে আমড়াতলার মোড়ে—
তারপরে যাও যেথায় খুশী—জ্বালিয়োনাকো মোরে।

বুঝিয়ে বলা

ও শ্যামাদাস! আয়ত দেখি, ব'স তো দেখি, এখেনে,
সেই কথাটা বুঝিয়ে দেব পাঁচ মিনিটে, দেখেনে।
জ্বর হয়েছে? মিথ্যে কথা! ওসব তোদের চালাকি—
এই যে বাবা চেঁচাচ্ছিলে, শুনতে পাইনি? কালা কি?
মামার ব্যামো? বদ্যি ডাক্‌বি? ডাকিস্‌ না হয় বিকেলে;
না হয় আমি বাৎলে দেব বাঁচ্‌বে মামা কি খেলে।
আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাব—
না বুঝ্‌বি ত মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাব।
কোন্‌ কথাটা? তাও ভুলেছিস্‌? ছেড়ে দিছিস্‌ হাওয়াতে?
কি বলছিলেম পরশু রাতে বিষ্টু বোসের দাওয়াতে?
ভুলিস্‌নি ত বেশ করেছিস্‌, আবার শুনলে ক্ষেতি কি?
বড় যে তুই পালিয়ে বেড়াস্‌, মাড়াস্‌নে যে এদিক্‌ই!
বলছি দাঁড়া, ব্যস্ত কেন? বোস্‌ তাহলে নিচুতেই—
আজকালের এই ছোক্‌রাগুলোর তর্‌ সয়না কিছুতেই।
আবার দেখ! বসলি কেন? বইগুলো আন্‌ নামিয়ে—
তুই থাক্‌তে মুটের বোঝা বইতে যাব আমি এ?
সাবধানে আন্‌, ধরছি দাঁড়া—সেই আমাকেই ঘামালি—
এই খেয়েছে! কোন্‌ আক্কেলে শব্দকোষটা নামালি?
ঢের হয়েছে! আয় দেখি তুই বোস্‌ ত দেখি এদিকে—
ওরে গোপাল গোটাকয়েক পান দিতে বল্‌ খেঁদিকে।—

বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
অর্থাৎ কিনা লাগ্‌ছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে—
গোড়ায় তবে দেখ্‌তে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে,
রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।
অর্থাৎ কিনা, এই মনে কর্‌ রোদ পড়েছে ঘাসেতে,
এই মনে কর্‌, চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে—
আবার দেখ! এরই মধ্যে হাই তোলবার মানে কি?
আকাশপানে তাকাস্‌ খালি, যাচ্ছে কথা কানে কি?
কি বল্লি তুই? এ সব শুধু আবোল তাবোল বকুনি?
বুঝতে হলে মগজ লাগে, ব'লেছিলাম তখুনি।
মগজভরা গোবর তোদের হচ্ছে ঘুঁটে শুকিয়ে,
যায় কি দেওয়া কোন কথা তার ভিতরে ঢুকিয়ে?—
ও শ্যামাদাস! উঠলি কেন? কেবল যে চাস্‌ পালাতে!
না শুনবি ত মিথ্যে সবাই আসিস্‌ কেন জ্বালাতে?
তত্ত্বকথা যায় না কানে যতই মরি চেঁচিয়ে—
ইচ্ছে করে ডান্‌পিটেদের কান ম'লে দি পেঁচিয়ে।





একুশে আইন

শিবঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে!
কেউ যদি যায় পিছ্‌লে প'ড়ে,
প্যায়দা এসে পাক্‌ড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার॥

সেথায় সন্ধে ছ'টার আগে,
হাঁচতে হ'লে টিকিট লাগে—
হাঁচ্‌লে পরে বিন্‌ টিকিটে—
দম্‌দমাদম্‌ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে॥

কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চার্‌টি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাক্‌স চায়—
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশ বার॥

চল্‌তে গিয়ে কেউ যদি চায়,
এদিক্‌ ওদিক্‌ ডাইনে বাঁয়,
রাজার কাছে খবর ছোটে,
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,
দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়
একুশ হাতা জল গেলায়॥

যে সব লোকে পদ্য লেখে,
তাদের ধ'রে খাঁচায় রেখে,
কানের কাছে নানান্‌ সুরে,
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদীর খাতা—
হিসেব কষায় একুশ পাতা॥

হঠাৎ সেথায় রাত দুপুরে,
নাক ডাকালে ঘুমের ঘোরে,
অম্‌নি তেড়ে মাথায় ঘষে,
গোবর গুলে বেলের কষে,
একুশটি পাক ঘুরিয়ে তাকে
একুশ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখে॥

হুঁকোমুখো হ্যাংলা



হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ী তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই, দেখেছ?
নাই তার মানে কি? কেউ তাহা জানে কি?
কেউ কভু তার কাছে থেকেছ?

শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার,
আর তার কেহ নাই এছাড়া—
তাই বুঝি একা সে মুখখানা ফ্যাকাশে,
ব'সে আছে কাঁদ-কাঁদ বেচারা?

থপ্ থপ্ পায়ে সে নাচ্‌ত যে আয়েসে,
গাল ভরা ছিল তার ফুর্তি,
গাইত সে সারাদিন 'সারে গামা টিম্‌টিম্',
আহ্লাদে গদ-গদ মূর্তি!

এই তো সে দুপ'রে বসে ওই উপরে,
খাচ্ছিল কাঁচকলা চট্‌কে—
এর মাঝে হল কি? মামা তার মোলো কি?
অথবা কি ঠ্যাং গেল মট্‌কে?

হুঁকোমুখো হেঁকে কয়, "আরে দূর, তা তো নয়,
দেখ্‌ছ না কি রকম চিন্তা?
মাছি মারা ফন্দি এ যত ভাবি মন দিয়ে—
ভেবে ভেবে কেটে যায় দিনটা।

বসে যদি ডাইনে,— লেখে মোর আইনে—
এই ল্যাজে মাছি মারি ত্রস্ত;
বামে যদি বসে তাও নহি আমি পিছপাও,
এই ল্যাজে আছে তার অস্ত্র!

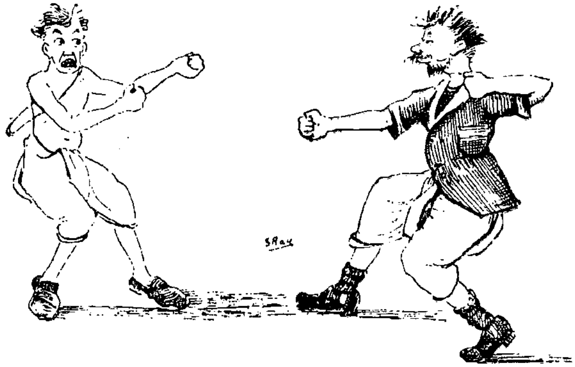
যদি দেখি কোন পাজি বসে ঠিক মাঝামাঝি,
কি যে করি ভেবে নাহি পাইরে—
ভেবে দেখ একি দায়, কোন্ ল্যাজে মারি তায়
দুটি বই ল্যাজ মোর নাই রে!"



বিজ্ঞান শিক্ষা

আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।
কোন্ দিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন্ দিকে থেকে যায় চাপা;
কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু, কতখানি ঠক্ ঠকে ফাঁপা।
মন তোর কোন্ দেশে থাকে, কেন তুই ভুলে যাস্ কথা—
আয় দেখি কোন্ ফাঁক দিয়ে, মগজেতে ফুটো তোর কোথা।
টোল-খাওয়া ছাতাপড়া মাথা, ফাটা-মত মনে হয় যেন,
আয় দেখি বিশ্লেষ ক'রে—চোপ্ রও ভয় পাস্ কেন?
কাৎ হয়ে কান ধ'রে দাঁড়া, জিভ্‌খানা উল্‌টিয়ে দেখা
ভালো ক'রে বুঝে শুনে দেখি—বিজ্ঞানে যে রকম লেখা।
মুণ্ডুতে 'ম্যাগ্‌নেট্' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্‌ট্' ক'রে,
ইঁট দিয়ে 'ভেলসিটি' ক'ষে দেখি মাথা ঘোরে কি না ঘোরে।

নারদ! নারদ!



“হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল সাদাকে বল্‌ছিলি লাল?
(আর) সেদিন নাকি রাত্রি জুড়ে নাক ডেকেছিস্‌ বিশ্রী সুরে?
(আর) তোদের পোষা বেড়ালগুলো শুন্‌ছি নাকি বেজায় হুলো?
(আর) এই যে শুনি তোদের বাড়ি কেউ নাকি রাখে না দাড়ি?
ক্যান্‌ রে ব্যাটা ইসটুপিড? ঠেঙিয়ে তোরে কর্‌ব ঢিট্‌!”
“চোপরাও তুম্‌ স্পিকটি নট্‌, মার্‌ব রেগে পটাপট্‌—
ফের যদি ট্যারাবি চোখ, কিম্বা আবার কর্‌বি রোখ,
কিম্বা যদি অম্‌নি ক'রে মিথ্যেমিথ্যি চ্যাঁচাস্‌ জোরে—
আই ডোণ্ট কেয়ার্‌ কানাকড়ি—জানিস্‌ আমি স্যাণ্ডো করি?”
“ফের লাফাচ্ছিস্‌! অল্‌ রাইট্‌ কামেন্‌ ফাইট্‌! কামেন্‌ ফাইট্‌!”
“ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি, টেরটা পাবে আজ এখনি!
আজকে যদি থাক্‌ত মামা পিটিয়ে তোমায় কর্‌ত ঝামা।
আরে! আরে! মার্‌বি নাকি? দাঁড়া একটা পুলিশ ডাকি!
হাঁহাঁহাঁহাঁ! রাগ করো না, কর্‌তে চাও কি তাই বল না?”
“হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো সত্যি বটেই আমি তো চটিনি মোটেই!
মিথ্যে কেন লড়তে যাবি? ভেরি-ভেরি সরি, মশলা খাবি?
‘শেক্‌হ্যাণ্ড’ আর ‘দাদা’ বল সব শোধ বোধ ঘরে চল।
ডোণ্ট পরোয়া অল্‌ রাইট্‌ হাউ ডুয়ুডু গুড্‌ নাইট্‌।”

কি মুস্কিল!



সব লিখেছে এই কেতাবে দুনিয়ার সব খবর যত,
সরকারী সব আফিসখানার কোন্ সাহেবের কদর কত।
কেমন ক'রে চাট্নি বানায়, কেমন ক'রে পোলাও করে,
হরেক্ রকম মুষ্টিযোগের বিধান লিখ্ছে ফলাও ক'রে।
সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দাকেতা,
পূজা পার্বণ তিথির হিসাব শ্রাদ্ধবিধি লিখ্ছে হেথা।
সব লিখেছে, কেবল দেখ পাচ্ছিনেকো লেখা কোথায়—
পাগ্লা ষাঁড়ে কর্লে তাড়া কেমন ক'রে ঠেকাব তায়!

ডানপিটে



বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে!—
কোন্‌ দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে।
একটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে,
ঠাঁই ঠাঁই শিশি ভাঙে শেলেট দিয়ে ঠুকে!
অন্যটা হামা দিয়ে আলমারি চড়ে,
খাট থেকে রাগ ক'রে দুম্‌দাম্‌ পড়ে!

বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে!—
শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে!
একটার দাঁত নেই, জিভ দিয়ে ঘ'ষে,
এক মনে মোমবাতি দেশলাই চোষে!
আরজন ঘরময় নীল কালি গুলে,
কপ্‌ কপ্‌ মাছি ধ'রে মুখে দেয় তুলে!

বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে!—
খুন হ'ত টম্‌ চাচা ওই রুটি খেলে!
সন্দেহে শুঁকে বুড়ো মুখে নাহি তোলে,
রেগে তাই দুই ভাই ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ ফোলে!
নেড়াচুল খাড়া হয়ে রাঙা হয় রাগে,
বাপ্‌ বাপ্‌ ব'লে চাচা লাফ দিয়ে ভাগে।

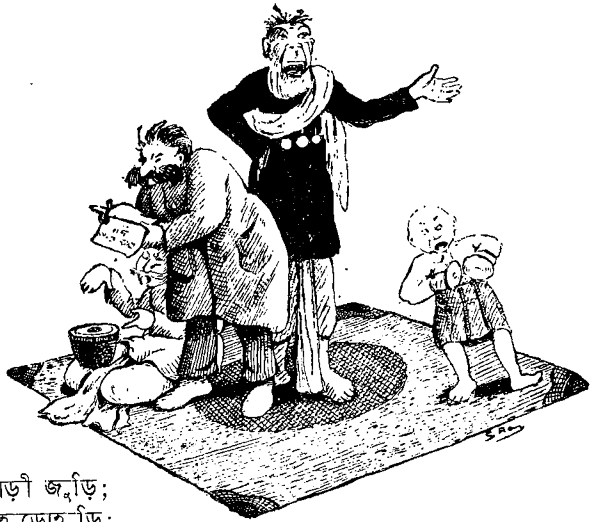
ভূতুড়ে খেলা

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখ্‌নু বিনা চশমাতে,
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছ্‌নাতে।
কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত পা নেড়ে উল্লাসে,
আহ্লাদেতে ধুপ্‌ধুপিয়ে কচ্ছে কেমন হল্লা সে।
শুন্‌তে পেলাম ভূতের মায়ের মুচ্‌কি হাসি কট্‌কটে—
দেখছে নেড়ে ঝুণ্টি ধ'রে বাচ্চা কেমন চট্‌পটে।
উঠছে তোদের হাসির হানা কাষ্ঠ সুরে ডাক্ ছেড়ে,
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশানি শব্দে যেমন করাৎ দিয়ে কাঠ চেরে।
যেমন খুশি মার্‌ছে ঘুঁষি, দিচ্ছে কষে কানমলা,
আদর ক'রে আছাড় মেরে শূন্যে ঝোলে চ্যাং দোলা।
বল্‌ছে আবার, "আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁট্‌কো রে,
দেখ্ না ফিরে প্যাখ্‌না ধরে হুতোম-হাসি মুখ ক'রে!

ওরে আমার বাঁদর নাচন আদর গেলা কোঁৎকা রে,
অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁৎকা রে!
ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টিরে,
ওরে আমার হামান ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টিরে।
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোছনা হাওয়ার স্বপনঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোব্‌রাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্‌রে,
ছিঁচকাঁদুনে ফোক্‌লা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিস্‌রে—"
এই না ব'লে যেই মেরেছে কাদার চাপ্‌টি ফট্ করে,
কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি—মিলিয়ে গেল চট্ ক'রে!



দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্



ছুট্‌ছে মোটর ঘটর্ ঘটর্ ছুট্‌ছে গাড়ী জুড়ি;
ছুট্‌ছে লোকে নানান্ ঝোঁকে কর্‌ছে হুড়োহুড়ি;
ছুট্‌ছে কত ক্ষ্যাপার মত পড়্‌ছে কত চাপা—
সাহেব মেমে থম্‌কে থেমে বল্‌ছে 'মামা! পাপা!'
　　—আমরা তবু তবলা ঠুকে গাচ্ছি কেমন তেড়ে,
　　"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

বর্ষাকালের বৃষ্টিবাদল রাস্তা জুড়ে কাদা,
ঠান্ডা রাতে সর্দিবাতে মর্‌বি কেন দাদা?
হোক্ না সকাল হোক্ না বিকাল হোক্ না দুপুর বেলা,
থাক্ না তোমার আপিস যাওয়া থাক্ না কাজের ঠেলা—
　　এই দেখ না চাঁদ্‌নি রাতের গান এনেছি কেড়ে,
　　"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

মুখ্যু যারা হচ্ছে সারা পড়্‌ছে ব'সে একা,
কেউ বা দেখ কাঁচুর মাচুর কেউ বা ভ্যাবাচ্যাকা;
কেউ বা ভেবে হদ্দ হল, মুখ্‌টি যেন কালি;
কেউ বা ব'সে বোকার মত মুণ্ডু নাড়ে খালি।
　　তার চেয়ে ভাই ভাবনা ভুলে গাও না গলা ছেড়ে,
　　"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

বেজার হয়ে যে যার মত কর্‌ছ সময় নষ্ট—
হাঁট্‌ছ কত খাট্‌ছ কত পাচ্ছ কত কষ্ট!
আসল কথা বুঝ্‌ছ না যে, করছ না যে চিন্তা,
শুনছ না যে গানের মাঝে তব্‌লা বাজে ধিন্‌তা?
　　পাল্লা ধ'রে গায়ের জোরে গিট্‌কিরি দাও ঝেড়ে,
　　"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাস্‌ব না-না, না-না" !

সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।

ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস্‌ যদি
মারব কিন্তু তোকে!"

যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়্‌সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!

সোয়াস্তি নেই মনে— মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠ্‌ছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে!

ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক্‌ জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে!

হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগ্‌ছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?

রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।



আহ্লাদী





হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদী,
তিন জনেতে জট্‌লা ক'রে ফোক্‌লা হাসির পাল্লা দি'।
হাসতে হাসতে আসছে দাদা আসছি আমি আসছে ভাই,
হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই।
ভাবছি মনে, হাসছি কেন? থাকব হাসি ত্যাগ ক'রে,
ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে ফেল্‌ছি হেসে ফ্যাক্‌ ক'রে।
পাচ্ছে হাসি চাইতে গিয়ে, পাচ্ছে হাসি চোখ বুজে,
পাচ্ছে হাসি চিম্‌টি কেটে নাকের ভিতর নোখ্‌ গুঁজে।
হাসছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড়
নৌকা ফানুস পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ী তেলের ভাঁড়।
পড়্‌তে গিয়ে ফেলছি হেসে 'ক খ গ' আর শ্লেট দেখে—
উঠ্‌ছে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।



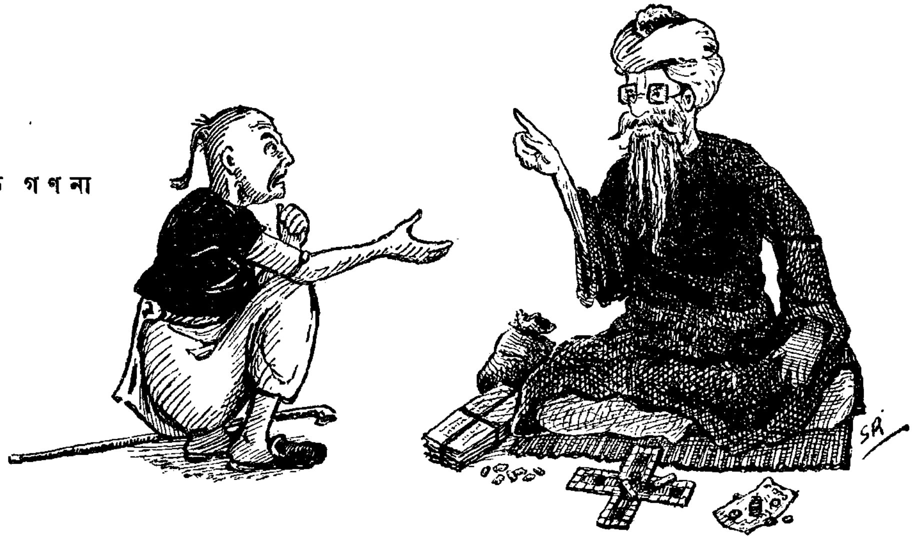
মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম্‌—
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম॥

বল্‌ব কি ভাই হুগ্‌লি গেলুম
বল্‌ছি তোমায় চুপি-চুপি—
দেখ্‌তে পেলাম তিনটে শুয়োর
মাথায় তাদের নেইকো টুপি॥

কহ ভাই কহ রে, অ্যাঁকা চোরা শহরে,
বদ্যিরা কেন কেউ আলুভাতে খায় না?
লেখা আছে কাগজে আলু খেলে মগজে,
ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না।

শুনেছ কি ব'লে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ?
টকটক থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

হাত গণনা



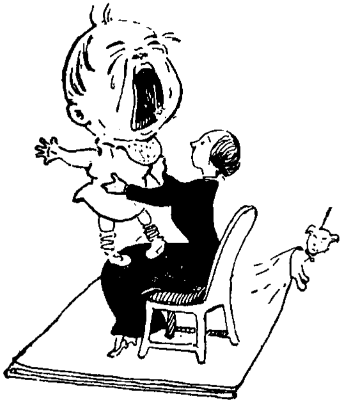
ও পাড়ার নন্দ গোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়ো,
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো।
ছিল না তার অসুখ বিসুখ, ছিল সে যে মনের সুখে,
দেখা যেত সদাই তারে হুঁকোহাতে হাস্যমুখে।
হঠাৎ কি তার খেয়াল হ'ল, চল্‌ল সে তার হাত দেখাতে—
ফিরে এল শুক্‌নো সরু, ঠকাঠক্‌ কাঁপছে দাঁতে!
শুধালে সে কয় না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে,
মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চক্ষু বেয়ে।
শুনে লোকে দৌড়ে এল, ছুটে এলেন বদ্যিমশাই,
সবাই বলে, "কাঁদছ কেন? কি হয়েছে নন্দ গোঁসাই?"
খুড়ো বলে, "বল্‌ব কি আর, হাতে আমার পষ্ট লেখা
আমার ঘাড়ে আছেন শনি, ফাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা।
এতদিন যায়নি জানা ফির্‌ছি কত গ্রহের ফেরে—
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে তখন আমায় রাখ্‌বে কে রে?
ষাট্‌টা বছর পার হয়েছি বাপদাদাদের পুণ্যফলে—
ওরে তোদের নন্দ খুড়ো এবার বুঝি পটোল তোলে।
কবে যে কি ঘট্‌বে বিপদ কিছু হায় যায় না বলা"—
এই ব'লে সে উঠ্‌ল কেঁদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা।
দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো,
বুড়ো আছে নেই কো হাসি, হাতে তার নেই কো হুঁকো।

গন্ধ বিচার

সিংহাসনে বস্‌ল রাজা বাজ্‌ল কাঁসর ঘণ্টা,
ছট্‌ফটিয়ে উঠ্‌ল কেঁপে মন্ত্রীবুড়োর মনটা।
বল্‌লে রাজা, "মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ?"
মন্ত্রী বলে, "এসেন্স দিছি—গন্ধ ত নয় মন্দ!"
রাজা বলেন, "মন্দ ভালো দেখুন শুঁকে বদ্যি,"
বদ্যি বলে, "আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।"
রাজা হাঁকেন, "বোলাও তবে—রাম নারায়ণ পাত্র।"
পাত্র বলে, "নস্যি নিলাম এক্ষনি এইমাত্র—
নস্যি দিয়ে বন্ধ যে নাক গন্ধ কোথায় ঢুকবে?"
রাজা বলেন, "কোটাল তবে এগিয়ে এস, শুঁক্‌বে।"
কোটাল বলে, "পান খেয়েছি মশলা তাতে কর্পূর,
গন্ধে তারি মুণ্ড আমার একেবারে ভরপুর।"
রাজা বলেন, "আসুক তবে শের পালোয়ান ভীমসিং,"
ভীম বলে, "আজ কচ্ছে আমার সমস্ত গা ঝিম্‌ঝিম্‌।
রাত্রে আমার বোখার হল বল্‌ছি হুজুর ঠিক বাৎ"—
ব'লেই শুল রাজসভাতে চক্ষু বুজে চিৎপাত।
রাজার শালা চন্দ্রকেতু তারেই ধ'রে শেষটা,
বল্‌ল রাজা, "তুমিই না হয় কর না ভাই চেষ্টা।"
চন্দ্র বলেন, "মারতে চাও ত ডাকাও নাকো জল্লাদ,
গন্ধ শুঁকে মর্‌তে হবে এ আবার কি আহ্লাদ?"
ছিল হাজির বৃদ্ধ নাজির বয়সটি তার নব্বই,
ভাব্‌ল মনে "ভয় কেন আর একদিন তো মরবই—"
সাহস ক'রে বল্‌লে বুড়ো, "মিথ্যে সবাই বক্‌ছিস,
শুঁকতে পারি হুকুম পেলে এবং পেলে বক্‌শিস্‌।"
রাজা বলেন, "হাজার টাকা ইনাম পাবে সদ্য,"
তাই না শুনে উৎসাহেতে উঠ্‌ল বুড়ো মদ্দ।
জামার পরে নাক ঠেকিয়ে—শুঁক্‌ল কত গন্ধ,
রইল অটল দেখ্‌ল লোকে বিস্ময়ে বাক্‌ বন্ধ।
রাজ্যে হল জয় জয়কার বাজ্‌ল কাঁসর ঢক্কা,
বাপ্‌রে কি তেজ বুড়োর হাড়ে পায় না সে যে অক্কা?

শোন শোন গল্প শোন, 'এক যে ছিল গুরু,'
এই আমার গল্প হল শুরু।
যদু আর বংশীধর যমজ ভাই তারা,
এই আমার গল্প হল সারা।

কাঁদুনে



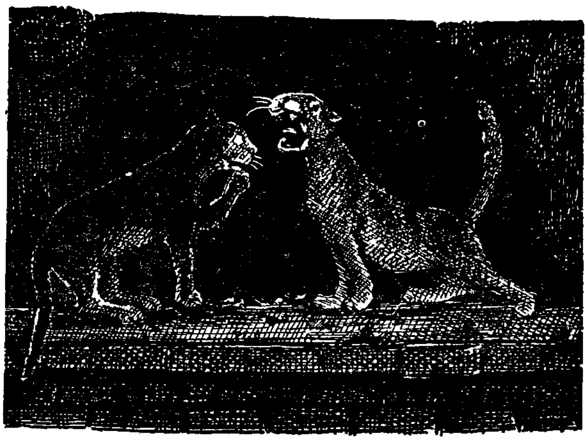
ছিঁচ্ কাঁদুনে মিচ্‌কে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে,
ঘ্যাঙায় শুধু ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ ঘ্যান্‌ঘ্যানে আর প্যান্‌প্যানে—
কুঁকিয়ে কাঁদে খিদের সময়, ফুঁপিয়ে কাঁদে ধম্‌কালে,
কিম্বা হঠাৎ লাগলে ব্যথা, কিম্বা ভয়ে চম্‌কালে;
অল্পে হাসে অল্পে কাঁদে কান্না থামায় অল্পেতেই,
মায়ের আদর দুধের বোতল কিম্বা দিদির গল্পেতেই—
তারেই বলি মিথ্যে কাঁদন; আসল কান্না শুন্‌বে কে?
অবাক্ হবে থম্‌কে রবে সেই কাঁদনের গুণ দেখে!
নন্দঘোষের পাশের বাড়ী বুথ্ সাহেবের বাচ্চাটার
কান্না খানা শুনলে বলি কান্না বটে সাচ্চা তার।
কাঁদ্‌বে না সে যখন তখন, রাখ্‌বে কেবল রাগ পুষে,
কাঁদ্‌বে যখন খেয়াল হবে খুন-কাঁদুনে রাক্ষুসে!
নাইক কারণ নাইক বিচার মাঝরাতে কি ভোরবেলা,
হঠাৎ শুনি অর্থবিহীন আকাশ-ফাটন জোর গলা।
হাঁক্‌ড়ে ছোটে কান্না যেমন জোয়ার বেগে নদীর বান,
বাপ মা বসেন হতাশ হয়ে শব্দ শুনে বধির কান।
বাস্‌রে সে কি লোহার গলা? এক মিনিটও শান্তি নেই?
কাঁদন ঝরে শ্রাবণ ধারে, ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই!
ঝুম্‌ঝুমি দাও, পুতুল নাচাও, মিষ্টি খাওয়াও একশোবার,
বাতাস কর, চাপ্‌ড়ে ধর, ফুটবে নাকো হাস্য তার।
কান্নাভরে উল্টে পড়ে কান্না ঝরে নাক দিয়ে,
গিল্‌তে চাহে দালানবাড়ী হাঁ'খানি তার হাঁক্ দিয়ে।
ভূত-ভাগান শব্দে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়ে—
কান্না শুনে ধন্যি বলি বুথ্ সাহেবের বাচ্চারে।

অবাক কাণ্ড

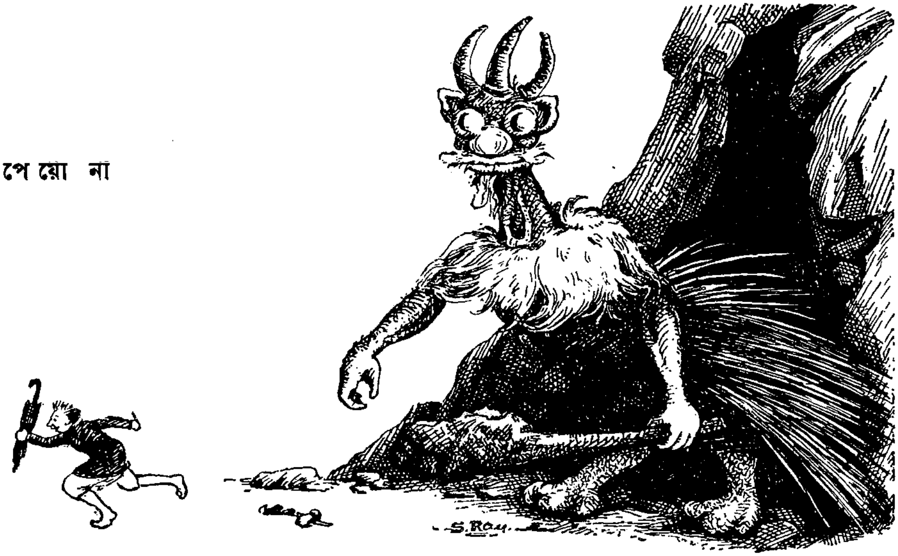
শুন্‌ছ দাদা! ঐ যে হোথায় বদ্যি বুড়ো থাকে,
সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে?
শুন্‌ছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে?
চক্ষু নাকি আপনি বোজে ঘুমটি তেমন পেলে?
চল্‌তে গেলে ঠ্যাং নাকি তার ভুঁয়ের পরে ঠেকে?
কান দিয়ে সব শোনে নাকি? চোখ দিয়ে সব দেখে?
শোয় নাকি সে মুণ্ডুটাকে শিয়র পানে দিয়ে?
হয় না কি হয় সত্যি মিথ্যা চল্ না দেখি গিয়ে!

হুলোর গান

বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখ্‌মলে ঢাকা।
জট্‌বাঁধা ঝুল্‌ কালো বটগাছতলে,
ধক্‌ধক্‌ জোনাকির চক্‌মকি জ্বলে,
চুপ্‌চাপ্‌ চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলো—
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চীৎকার ক'রে,
কোন্‌ গানে মন ভেজে শোন্‌ বলি তোরে—
পুবদিকে মাঝ রাতে ছোপ্‌ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট্‌ ক'রে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড়্‌ দুড়্‌ ছুটে যাই দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক্‌ ক'রে নিভে গেল বুকভরা আশা,
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি
বিল্‌কুল্‌ সব দেখি ভেল্‌কির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নীর মুখ যেন চিম্‌নির কালি।
মন-ভাঙা দুখ্‌ মোর কণ্ঠেতে পুরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।



ভয় পেয়ো না



ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মার্‌ব না—
সত্যি বল্‌ছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পার্‌ব না।
মন্‌টা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগ্‌টি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না—
জানো না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?

এস এস গর্তে এস, বাস ক'রে যাও চারটি দিন,
আদর ক'রে শিকেয় তুলে রাখ্‌ব তোমায় রাত্রি দিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাক্‌বে না?
মুগুর আমার হাল্‌কা এমন মারলে তোমায় লাগ্‌বে না।
অভয় দিচ্ছি, শুন্‌ছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বস্‌লে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!

আমি আছি, গিন্নী আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কাম্‌ড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

নোট্ বই



এই দেখ পেন্‌সিল, নোট্‌বুক এ হাতে,
এই দেখ ভরা সব কিল্‌বিল লেখাতে।
ভালো কথা শুনি যেই চট্ পট্ লিখি তায়—
ফড়িঙের ক'টা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায়;
আঙুলেতে আঠা দিলে কেন লাগে চট্‌চট্,
কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্।
দেখে শিখে প'ড়ে শুনে ব'সে মাথা ঘামিয়ে
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ।
কান করে কট্ কট্ ফোড়া করে টন্ টন্—
ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন।
কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খট্‌কা
ঝোলাগুড় কিসে দেয়? সাবান না পট্‌কা?
এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে
জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।
পেট কেন কাম্‌ড়ায়, বল দেখি পার কে?
বল দেখি ঝাঁজ কেন জোয়ানের আরকে?
তেজপাতে তেজ কেন? ঝাল কেন লঙ্কায়?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায়?
কার নাম দুন্দুভি? কাকে বলে অরণি?
বল্‌বে কি, তোমরাও নোট্‌বই পড়নি!

গল্প বলা

"এক যে রাজা"—"থাম্ না দাদা,
রাজা নয় সে, রাজ পেয়াদা।"
"তার যে মাতুল"—"মাতুল কি সে?
সবাই জানে সে তার পিসে।"
"তার ছিল এক ছাগল ছানা"—
"ছাগলের কি গজায় ডানা?"
"একদিন তার ছাতের 'পরে"—
"ছাত কোথা হে টিনের ঘরে?"
"বাগানের এক উড়ে মালী"—
"মালী নয়ত? মেহের আলি—"
"মনের সাধে গাইছে বেহাগ"—
"বেহাগ তো নয়? বসন্ত রাগ।"
"থোও না বাপু ঘ্যাঁচা ঘেঁচি"—
"আচ্ছা বল চুপ্ করেছি।"
"এমন সময় বিছ্‌না ছেড়ে,
হঠাৎ মামা আস্‌ল তেড়ে,
ধর্‌ল সে তার ঝুঁটির গোড়া—"
"কোথায় ঝুঁটি? টাক যে ভরা।"
"হোক না টেকো তোর তাতে কি?
লক্ষ্মীছাড়া মুখ্যু ঢেঁকি!
ধর্‌ব ঠেসে টুঁটির 'পরে,
পিট্‌ব তোমার মুণ্ডু ধরে—
কথার উপর কেবল কথা,
এখন বাপু পালাও কোথা?"

ট্যাঁশ্ গরু

ট্যাঁশ্ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে;
যার খুশি দেখে এস হারুদের আফিসে।
চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত,
ফিট্‌ফাট্ কালোচুলে টেরিকাটা চোস্ত।
তিন-বাঁকা শিং তার, ল্যাজখানি প্যাঁচান—
একটুকু ছোঁও যদি, বাপ্‌রে কি চ্যাঁচান!
লট্‌খটে হাড়গোড় খট্‌খট্ ন'ড়ে যায়,
ধম্‌কালে ল্যাগ্‌ব্যাগ্ চমকিয়ে প'ড়ে যায়।
বর্ণিতে রূপ গুণ সাধ্য কি কবিতার,
চেহারার কি বাহার—ঐ দেখ ছবি তার।
ট্যাঁশ্ গরু খাবি খায় ঠ্যাস্ দিয়ে দেয়ালে,
মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে না জানি কি খেয়ালে;
মাঝে মাঝে তেড়ে ওঠে, মাঝে মাঝে রেগে যায়,
মাঝে মাঝে কুপোকাৎ দাঁতে দাঁত লেগে যায়।
খায় না সে দানাপানি—ঘাস পাতা বিচালি
খায় না সে ছোলা ছাতু ময়দা কি পিঠালি;
রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়সে,
সাবানের সুপ আর মোমবাতি খায় সে।
আর কিছু খেলে তার কাশি ওঠে খক্‌খক্,
সারা গায়ে ঘিন্‌ঘিন্ ঠ্যাং কাঁপে ঠক্‌ঠক্।
একদিন খেয়েছিল ন্যাক্‌ড়ার ফালি সে—
তিন মাস আধমরা শুয়েছিল বালিশে।
কারো যদি শখ্ থাকে ট্যাঁশ্ গরু কিন্‌তে,
সস্তায় দিতে পারি, দেখ ভেবে চিন্তে।



ফস্‌কে গেল!

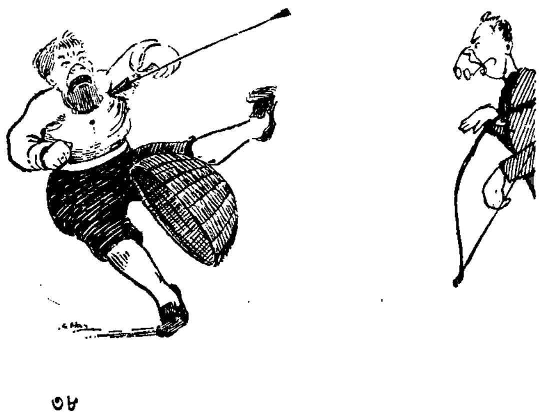


দেখ্‌ বাবাজি দেখ্‌বি নাকি   দেখ্‌রে খেলা দেখ্‌ চালাকি,
ভোজের বাজি ভেল্কি ফাঁকি পড়্‌ পড়্‌ পড়্‌বি পাখি—ধপ্‌!

লাফ দিয়ে তাই তালটি ঠুকে তাক ক'রে যাই তীর ধনুকে,
ছাড়্‌ব সটান্‌ ঊর্ধ্বমুখে হুশ্‌ ক'রে তোর লাগ্‌বে বুকে—খপ্‌!

গুড়্‌ গুড়্‌ গুড়্‌ গুড়িয়ে হামা খাপ্‌ পেতেছেন গোষ্ঠ মামা
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা এইবার বাণ চিড়িয়া নামা—চট্‌!

ঐ যা! গেল ফস্কে ফেঁসে—হেঁই মামা তুই ক্ষেপ্‌লি শেষে?
ঘ্যাঁচ্‌ ক'রে তোর পাঁজর ঘেঁষে লাগ্‌ল কি বাণ ছট্‌কে এসে—ফট্‌?



পালোয়ান



খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতী লোফেন যখন তখন,
দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন।
একদিন এক গুণ্ডা তাকে বাঁশ বাগিয়ে মার্‌ল বেগে—
ভাঙল সে বাঁশ শোলার মত মট্ ক'রে তার কনুই লেগে।
এইত সেদিন রাস্তা দিয়ে চল্‌তে গিয়ে দৈব বশে,
উপর থেকে প্রকাণ্ড ইট পড়্‌ল তাহার মাথায় খ'সে।
মুণ্ডুতে তার যেম্‌নি ঠেকা অম্‌নি সে ইট্ এক নিমেষে
গুঁড়িয়ে হ'ল ধুলোর মত, ষষ্ঠি চলেন মুচ্‌কি হেসে।
ষষ্ঠি যখন ধমক হাঁকে কাঁপ্‌তে থাকে দালান বাড়ী,
ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে উল্টে পড়ে গরুর গাড়ী।
ধুম্‌সো কাঠের তক্তা ছেঁড়ে মোচড় মেরে মুহূর্তেকে,
একশো জালা জল ঢালে রোজ স্নানের সময় পুকুর থেকে।
সকাল বেলার জলপানি তার তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া,
সঙ্গেতে তার চৌদ্দ হাঁড়ি দৈ কি মালাই মুড়্‌কি দেওয়া।
দুপুর হ'লে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেক্‌চি ভ'রে,
বরফ দেওয়া উনিশ কুঁজো সরবতে তার তৃষ্ণা হরে।
বিকাল বেলা খায় না কিছু গণ্ডা দশেক মণ্ডা ছাড়া,
সন্ধ্যা হ'লে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া।
রাত্রে সে তার হাত পা টেপায় দশটি চেলা মজুত থাকে,
দুম্‌দুমাদুম্ সবাই মিলে মুগুর দিয়ে পেটায় তাকে।
বল্‌লে বেশি ভাব্‌বে শেষে এসব কথা ফেনিয়ে বলা—
দেখবে যদি আপন চোখে যাওনা কেন বেনিয়াটোলা।



মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে,
রামধনুকের আব্‌ছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন্ আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপ্‌নি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।

আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাই বা তাহার অর্থ হোক্
নাইবা বুঝুক বেবাক্ লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুট্‌লে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ তব্‌লা বাজে—
রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত!
হ্যাংলা হাতী চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

খাই খাই

এসব কথা শুন্‌লে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা,
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।

কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে,
গাছের 'পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখ না গোঁফে।

একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান,
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্বকথাই সাবান।

বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙ্‌বে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি!

খাই খাই

খাইখাই কর কেন, এস বস আহারে—
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড় করে আনি সব,—থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য,
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি,
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে—
খুঁজে পেতে আনি খেতে—নয় বড় সিধে সে!
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিও।
ফল বিনা চিঁড়ে দৈ, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।
ব্যাঙ খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপ্‌রে কি গন্ধ!
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট!
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা,
কত কি যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।
দেখে শুনে চেখে খাও, যেটা চায় রসনা ;
তা না হলে কলা খাও—চটো কেন? বস না—
সবে হল খাওয়া শুরু, শোন শোন আরো খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে,
খাসা দেখ 'খাপ্ খায়' চাপ্‌কানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?
ডিঙি চড়ে স্রোতে প'ড়ে পাক খায় জেলেরা,
ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা ;





বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতমত—তাও লিখি তালিকায়।
ভিখারিটা তাড়া খায়, ভিখ্ নাহি পায়রে—
'দিন আনে দিন খায়' কত লোকে হায়রে।
হোঁচটের চোট্ খেয়ে খোকা ধরে কান্না
মা বলেন চুমু খেয়ে, 'সেরে গেছে, আর না।'
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য
কিলচড় লাথি ঘুঁষি হয় তার খাদ্য।
জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায়রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায়রে।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিম্‌সিম্,
পিছ্‌লে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিম্‌ঝিম্।
কত যে মোচড় খায় বেহালার কানটা,
কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাব্‌ড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাৎ হ'য়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগ্‌বাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা!
কথা শোন, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেয়ো না—
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেও না।
'ফেল্' ক'রে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে,
আদা-নুন খেয়ে লাগো পাশ কর এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেও নাকো, যেয়ো নাকো ভড়্‌কে,
খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বসে খাও খড়্‌কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা।



দাঁড়ের কবিতা



চুপ কর্, শোন্ শোন্, বেয়াকুল হোস্‌নে
ঠেকে গেছি বাপ্‌রে কি ভয়ানক প্রশ্নে!
ভেবে ভেবে লিখে লিখে বসে বসে দাঁড়েতে
ঝিম্‌ঝিম্ টন্‌টন্ ব্যথা করে হাড়েতে।
এক ছিল দাঁড়ি মাঝি—দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘষ্‌ত।
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল।
কাক বলে রেগেমেগে, "বাড়াবাড়ি ঐ ত!
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড়কাক হই ত?
ভারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন্ বলি তবে রে—
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস্ কবে রে?
পাখা হলে 'পাখি' হয় ব্যাকরণ বিশেষে—
কাঁকড়ার 'দাঁড়া' আছে, দাঁড়ি নয় কিসে সে?
দ্বারে বসে দারোয়ান, তারে যদি 'দ্বারী' কয়,
দাঁড়ে-বসা যত পাখি সব তবে দাঁড়ি হয়!
দূর দূর! ছাই দাঁড়ি! দাড়ি নিয়ে পাড়ি দে!"
দাঁড়ি বলে, "বাস্ বাস্! ঐখেনে দাঁড়ি দে।"

পাকাপাকি

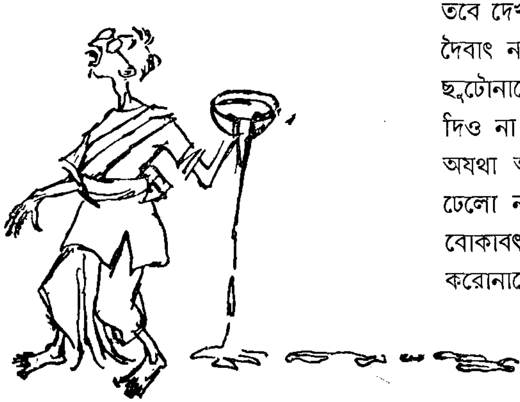
আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইঁট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রঙ, পাকা কই তাহারে;
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে।
হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে,
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে।
লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে!
কান পাকে ফোড়া পাকে, পেকে করে টন্‌টন্‌—
কথা যার পাকা নয়, কাজে তার ঠন্‌ঠন্‌।
রাঁধুনী বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়িতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে।
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে॥

পড়ার হিসাব

ফির্‌ল সবাই ইস্কুলেতে সাঙ্গ হল ছুটি—
আবার চলে বই-বগলে সবাই গুটি গুটি।
পড়ার পরে কার কি রকম মনটি ছিল এবার,
সময় এল এখন তারই হিসেবখানা দেবার।
কেউ পড়েছেন পড়ার পুঁথি, কেউ পড়েছেন গল্প,
কেউ পড়েছেন হদ্দমতন, কেউ পড়েছেন অল্প।
কেউ বা তেড়ে গড়গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া,
কেউ বা কেবল কাঁচুমাচু মোটে না দেয় সাড়া।
গুরুমশাই এসেই ক্লাশে বলেন, "ওরে গদাই
এবার কিছু পড়্‌লি? নাকি খেল্‌তি কেবল সদাই?"
গদাই ভয়ে চোক পাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে শেষে
বললে, "এবার পড়ার ঠেলা বেজায় সর্বনেশে—
মামার বাড়ি যেম্নি যাওয়া অম্নি গাছে চড়া,
একেবারে অম্নি ধপাস পড়ার মত পড়া!"

পরিবেশণ

'পরি'পূর্বক 'বিষ'ধাতু তাহে 'অনট্' ব'সে
তবে ঘটায় পরিবেষণ, লেখে অমরকোষে।
—অর্থাৎ ভোজের ভাণ্ড হাতে লয়ে মেলা
ডেলা ডেলা ভাগ করি পাতে পাতে ফেলা।
এই দিকে এস তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সম্মুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড।
কেহ কহে "দৈ আন" কেহ হাঁকে "লুচি"
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা—
অনাহারে কতধারে হল প্রাণ হত্যা।
কোন প্রভু হস্তিদেহ ভুঁড়িখানা ভারি
ঊর্ধ্ব হতে থপ্ করি খাদ্য দেন্ ছাড়ি।
কোন চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস কুড়ি')
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর বৃদ্ধ যায় মুদি চক্ষু দুটি,
"কারো কিছু চাই" বলি তড়বড় ছুটি—
সহসা ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়মুড় পড়ে কার নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীর পদে এস দেখি ত্রস্তে—
ওই দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে।
তবে দেখ, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না ঢোকে কভু যেন নিজ গালে।
ছুটোনাকো ওরকম মিছে খালি হাতে
দিও না মাছের মুড়া নিরামিষ পাতে।
অযথা আক্রোশে কিবা অন্যায় আদরে
ঢেলো না অম্বল কারো নূতন চাদরে।
বোকাবৎ দন্তপাটি করিয়া বাহির
করোনাকো অকারণে কৃতিত্ব জাহির।



বিষম চিন্তা

মাথায় কত প্রশ্ন আসে, দিচ্ছে না কেউ জবাব তার—
সবাই বলে, ''মিথ্যে বাজে বকিস্‌নে আর খবরদার!''
অমন ধারা ধমক দিলে কেমন করে শিখব সব?
বললে সবাই ''মুখ্যু ছেলে'', বলবে আমায় "গো গর্দভ!"
কেউ কি জানে দিনের বেলায় কোথায় পালায় ঘুমের ঘোর?
বর্ষা হলেই ব্যাঙের গলায় কোত্থেকে হয় এমন জোর?
গাধার কেন শিং থাকে না, হাতির কেন পালক নেই?
গরম তেলে ফোড়ন দিলে লাফায় কেন তাধেই ধেই?
সোডার বোতল খুললে কেন ফঁসফঁসিয়ে রাগ করে?
কেমন করে রাখবে টিকি মাথায় যাদের টাক পড়ে?
ভূত যদি না থাকবে তবে কোত্থেকে হয় ভূতের ভয়?
মাথায় যাদের গোল বেধেছে তাদের কেন ''পাগোল'' কয়?
কতই ভাবি এসব কথা, জবাব দেবার মানুষ কই?
বয়স হলে কেতাব খুলে জানতে পাব সমস্তই।

আড়ি

কিসে কিসে ভাব নেই? ভক্ষক ও ভক্ষ্যে—
বাঘে ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে।

শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরি,
সাপে আর নেউলে ত চিরকাল বৈরী!

আদা আর কাঁচকলা মেলে কোনোদিন্ সে?
কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।

তেলে দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটা দেখনি?
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ রাগ যেন খেতে আসে এখনি।

তার চেয়ে বেশি আড়ি আমি পারি কহিতে—
তোমাদের কারো কারো, কেতাবের সহিতে।

অবুঝ





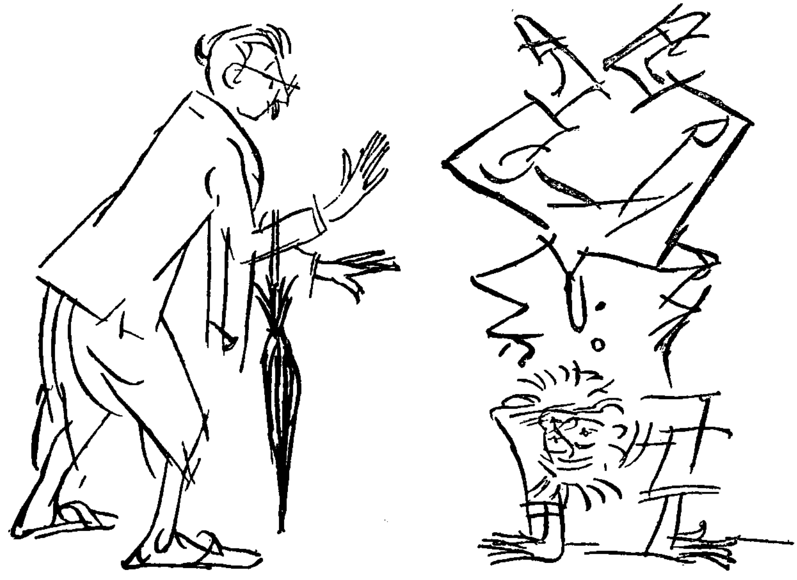
চুপ করে থাক্, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল না,
এক্কেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।
দেখ্ ত দেখি আজও আমার মনের তেজটি নেভেনি—
এইবার শোন্ বল্‌ছি এখন—কি বলছিলেম ভেবেনি!
বলছিলাম কি, আমি একটা বই লিখেছি কবিতার
উঁচু রকম পদ্যে লেখা আগা গোড়াই সবি তার।
তাইতে আছে "দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর,
শ্মশানঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর।"
এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও—
বুঝ্‌ছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও।
এরই মধ্যে হাই তুলিস্ যে? পুঁতে ফেল্‌ব এখনি,
ঘুঘু দেখেই নাচ্‌তে শুরু, ফাঁদ ত বাবা দেখনি!
কি বললি তুই? সাতান্নবার শুনেছিস্ ঐ কথাটা?
এমন মিথ্যে কইতে পারিস্ লক্ষ্মীছাড়া বখাটা!
আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাধ্যি নেই কো পেরোবার
হিসেব দেব, বলেছি এই চোদ্দবার কি তেরোবার।
সাতান্ন তুই গুনতে পারিস্? মিথ্যেবাদী! গুনে যা—
ও শ্যামাদাস! পালাস্ কেন? রাগ করিনি, শুনে যা।

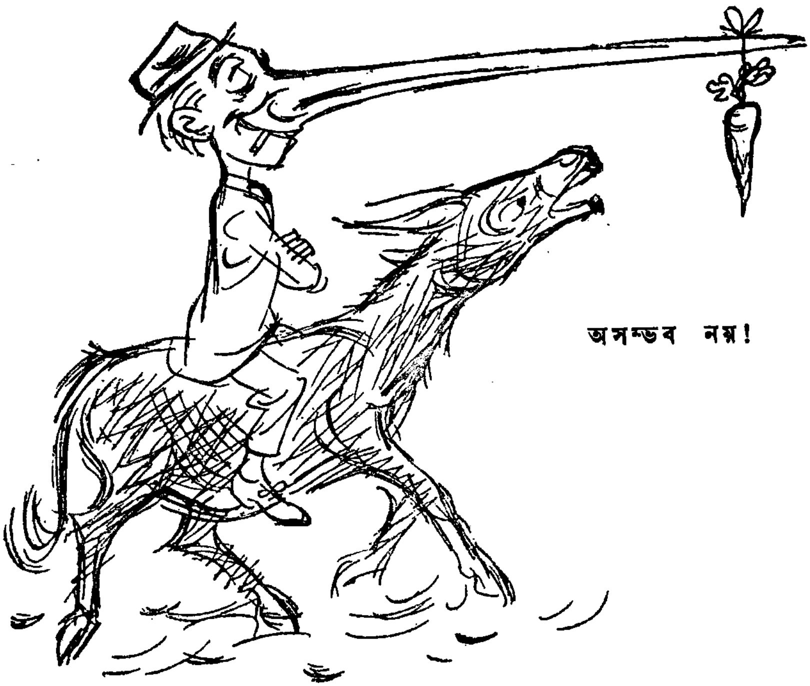
নাচের বাতিক

বয়স হল অষ্টআশি, চিম্‌সে গায়ে ঠুন্‌কো হাড়,
নাচ্‌ছে বুড়ো উল্টোমাথায়—ভাঙ্‌লে বুঝি মুণ্ডু ঘাড়!
হেঁইয়ো ব'লে হাত পা ছেড়ে পড়ছে তেড়ে চিৎপটাং,
উঠ্‌ছে আবার ঝট্‌পটিয়ে এক্কেবারে পিঠ সটান্।
বুঝিয়ে বলি, ''বৃদ্ধ তুমি এই বয়েসে কর্‌ছ কি?
খাও না খানিক মশ্‌লা গুলে হুঁকোর জল আর হর্‌তকী।
ঠাণ্ডা হবে মাথার আগুন, শান্ত হবে ছট্‌ফটি—''
বৃদ্ধ বলে, ''থাম্ না বাপু, সব তাতে তোর পট্‌পটি!
ঢের খেয়েছি মশ্‌লা পাঁচন, ঢের মেখেছি চর্বি তেল;
তুই ভেবেছিস আমায় এখন চাল্ মেরে তুই করবি ফেল?''
এই না ব'লে ডাইনে বাঁয়ে লম্ফ দিয়ে হুশ্ ক'রে
হঠাৎ খেয়ে উল্টোবাজি ফেল্‌লে আমায় 'পুশ্' ক'রে।

''নাচ্‌লে অমন উল্টো রকম,'' আবার বলি বুঝিয়ে তায়,
''রক্তগুলো হুড়্‌হুড়িয়ে মগজ পানে উজিয়ে যায়।''
বললে বুড়ো, ''কিন্তু বাবা, আসল কথা সহজ এই—
ঢের দেখেছি পরখ্ করে, কোথাও আমার মগজ নেই।
তাইতে আমার হয় না কিছু—মাথায় যে সব ফক্কিফাঁক—
যতটা নাচি উল্টো নাচন, যতই না খাই চর্কিপাক।''
বলতে গেলাম ''তাও কি হয়''—অম্নি হঠাৎ ঠ্যাং নেড়ে
আবার বুড়ো হুড়্‌মুড়িয়ে ফেললে আমায় ল্যাং মেরে।

ভাবছি সবে মারব ঘুঁষি এবার বুড়োর রগ্‌ ঘেঁষে,
বললে বুড়ো, ''করব কি বল্‌? করায় এ সব অভ্যেসে।
ছিলাম যখন রেল-দারোগা চড়্‌তে হত ট্রেইনেতে
চলতে গিয়ে ট্রেনগুলো সব পড়ত প্রায়ই ড্রেইনেতে।
তুব্‌ড়ে যেত রেলের গাড়ি লাগত গুঁতো চাক্কাতে,
ছিট্‌কে যেতাম যখন তখন হঠাৎ এক এক ধাক্কাতে।
নিত্যি ঘুমাই এক চোখে তাই, নড়লে গাড়ি—অম্নি 'বাপ'—
এম্‌—নি ক'রে ডিগ্‌বাজিতে এক্কেবারে শূন্য লাফ।
তাইতে হল নাচের নেশা, হঠাৎ হঠাৎ নাচন পায়,
বসতে শুতে আপ্‌নি ভুলে ডিগ্‌বাজি খাই আচম্‌কায়!
নাচতে গিয়ে দৈবে যদি ঠ্যাং লাগে তোর পাঁজ্‌রাতে,
তাই ব'লে কি চটতে হবে? কিম্বা রাগে গজ্‌রাতে?''
আমিও বলি, ''ঘাট হয়েছে, তোমার খুরে দণ্ডবৎ!
লাফাও তুমি যেমন খুশি, আমরা দেখি অন্য পথ।''





অসম্ভব নয়!

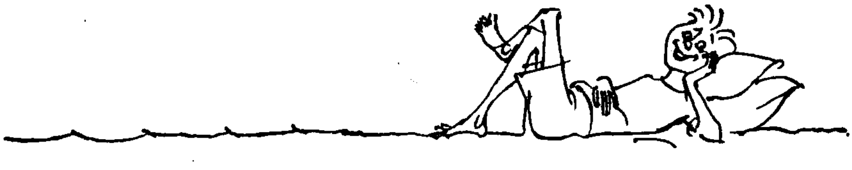
এক যে ছিল সাহেব, তাহার
গ্নণের মধ্যে নাকের বাহার।
তার যে গাধা বাহন, সেটা
যেমন পেট্নক তেমনি ঢ্যাঁটা।
ডাইনে বল্‌লে যায় সে বামে
তিনপা যেতে দ্নবার থামে।
চল্‌তে চল্‌তে থেকে থেকে
খানায় খন্দে পড়ে বেঁকে।
ব্যাপার দেখে এম্নিতরো
সাহেব বললে "সব্নর করো—
মাম্‌দোবাজি আমার কাছে?
এ রোগেরও ওষ্নধ আছে।"

এই না ব'লে ভীষণ ক্ষেপে
গাধার পিঠে বস্‌ল চেপে
ম্নলোর ঝ্নঁটি ঝ্নলিয়ে নাকে।
—আর কি গাধা ঝিমিয়ে থাকে?
ম্নলোর গন্ধে টগবগিয়ে
দৌড়ে চলে লম্ফ দিয়ে—
যতই ছোটে 'ধরব' ব'লে
ততই ম্নলো এগিয়ে চলে!
খাবার লোভে উদাস প্রাণে
কেবল ছোটে ম্নলোর টানে—
ডাইনে বাঁয়ে ম্নলোর তালে
ফেরেন গাধা নাকের চালে।

কাজের লোক

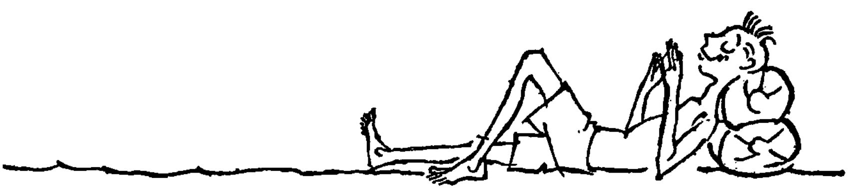
প্রথম। বাঃ—আমার নাম 'বাঃ'!
বসে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা!
লেখাপড়ার ধার ধারিনে, বছর ভরে ছুটি,
হেসে খেলে আরাম ক'রে দুশো মজা লুটি।
কারে কবে কেয়ার করি, কিসের করি ডর?
কাজের নামে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।
গাধার মতন খাটিস্ তোরা মুখটা করে চুন—
আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন।

সকলে। আস্ত একটি গাধা তুমি স্পষ্ট গেল দেখা,
হাস্‌ছ যত, কান্না তত কপালেতে লেখা।



দ্বিতীয়। 'যদি' বলে ডাকে আমায় নামটি আমার 'যদি'—
আশায় আশায় বসে থাকি হেলান দিয়ে গদি।
সব কাজেতে থাকত যদি খেলার মত মজা,
লেখাপড়া হত যদি জলের মত সোজা—
স্যাণ্ডো সমান ষণ্ডা হতাম যদি গায়ের জোরে,
প্রশংসাতে আকাশ পাতাল যদি যেত ভরে—
উঠে পড়ে লেগে যেতাম বাজে তর্ক ফেলে।
করতে পারি সবি—যদি সহজ উপায় মেলে।

সকলে। হাতের কাছে সুযোগ, তবু 'যদি'র আশায় বসে
নিজের মাথা খাচ্ছ বাপু নিজের বুদ্ধি দোষে।



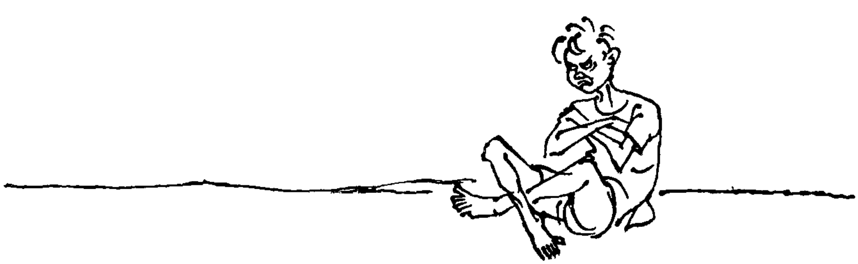
তৃতীয়। আমার নাম 'বটে'! আমি সদাই আছি চটে—
কট্‌মটিয়ে তাকাই যখন, সবাই পালায় ছুটে।
চশমা পরে বিচার ক'রে, চিরে দেখাই চুল—
উঠ্‌তে বস্‌তে কচ্ছে সবাই হাজার গণ্ডা ভুল।
আমার চোখে ধুলো দেবে সাধ্যি আছে কার?
ধমক শুনে ভূতের বাবা হ'চ্ছে পগার পার!
হাসছ? বটে! ভাবছ বুঝি মস্ত তুমি লোক,
একটি আমার ভেংচি খেলে উল্টে যাবে চোখ।

সকলে। দিচ্ছ গালি লোকের তাতে কিবা এল গেল?
আকাশেতে থুতু ছুঁড়ে—নিজের গায়েই ফেল।



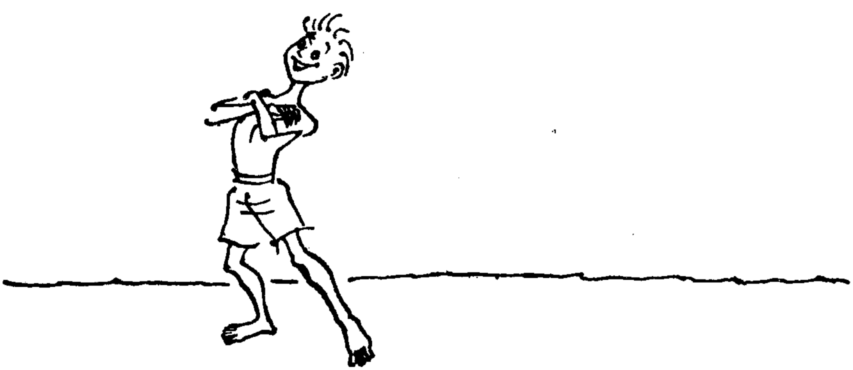
চতুর্থ। আমার নাম 'কিন্তু', আমায় 'কিন্তু' বলে ডাকে,
সকল কাজে একটা কিছু গলদ লেগে থাকে।
দশটা কাজে লাগি কিন্তু আটটা করি মাটি,
ষোল আনা কথায় কিন্তু সিকি মাত্র খাঁটি।
লম্ফঝম্ফ বহুৎ কিন্তু কাজের নাইকো ছিরি—
ফোঁস্ ক'রে যাই তেড়ে—আবার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরি।
পাঁচটা জিনিস গড়্‌তে গেলে, দশটা ভেঙে চুর—
বল্ দেখি ভাই কেমন আমি সাবাস বাহাদুর!

সকলে। উচিত তোমায় বেঁধে রাখা নাকে দিয়ে দড়ি,
বেগারখাটা পণ্ডকাজের মূল্য কানাকড়ি।



পঞ্চম। আমার নাম 'তবু', তোমরা কেউ কি আমায় চেনো?
দেখ্‌তে ছোট তবু আমার সাহস আছে জেনো।
এতটুকু মানুষ তবু দ্বিধা নাইকো মনে,
যে কাজেতেই লাগি আমি খাটি প্রাণপণে।
এম্নি আমার জেদ, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,
একুশ বারে না হয় যদি, বাইশ বারে কষি।
হাজার আসুক বাধা তবু উৎসাহ না কমে,
হাজার লোকে চোখ রাঙালে তবু না যাই দ'মে।

সকলে। নিষ্কম্মারা গেল কোথা, পালাল কোন দেশে?
কাজের মানুষ কারে বলে দেখুক এখন এসে।
হেসে খেলে, শুয়ে বসে কত সময় যায়,
সময়টা যে কাজে লাগায়, চালাক বলে তায়।



বললে গাধা মনের দুঃখে অনেকখানি ভেবে—
"বয়েস গেল খাটতে খাটতে, বৃদ্ধ হলাম এবে,
কেউ করে না তোয়াজ তবু, সংসারের কি রীতি!
ইচ্ছে করে এক্ষুনি দিই কাজে কর্মে ইতি।
কোথাকার ঐ নোংরা কুকুর, আদর যে তার কত—
যখন তখন ঘুমোচ্ছে সে লাটসাহেবের মত!
ল্যাজ নেড়ে যেই, ঘেউ ঘেউ ঘেউ, লাফিয়ে দাঁড়ায় কোলে,
মনিব আমার বোক্‌চন্দর্‌, আহ্লাদে যান গলে।
আমিও যদি সেয়ানা হতুম, আরামে চোখ মুদে
রোজ মনিবের মন ভোলাতুম অম্নি নেচে কুঁদে।
ঠ্যাং নাচাতুম, ল্যাজ দোলাতুম, গান শোনাতুম সাধা—
এ বুদ্ধিটা হয়নি আমার—সাধে কি বলে গাধা!"

বুদ্ধি এঁটে বসল গাধা আহ্লাদে ল্যাজ নেড়ে,
নাচ্‌ল কত, গাইল কত, প্রাণের মায়া ছেড়ে।
তারপরেতে শেষটা ক্রমে স্ফূর্তি এল প্রাণে
চলল গাধা খোদ্‌ মনিবের ড্রয়িংরুমের পানে।

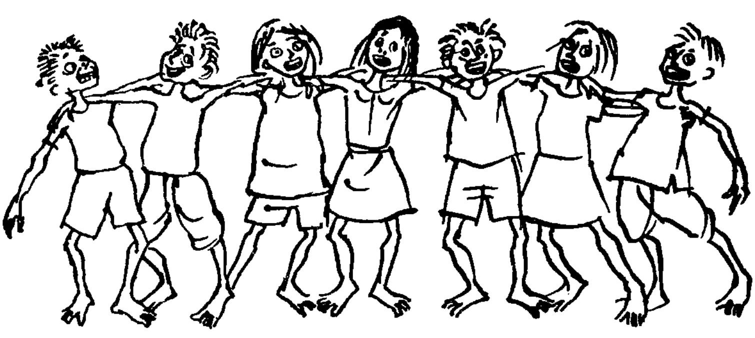
মনিবসাহেব ঝিমুচ্ছিলেন চেয়ারখানি জুড়ে,
গাধার গলার শব্দে হঠাৎ তন্দ্রা গেল উড়ে।
চম্‌কে উঠে গাধার নাচন যেমনি দেখেন চেয়ে,
হাসির চোটে সাহেব বুঝি মরেন বিষম খেয়ে।



ভাব্‌লে গাধা—এই তো মনিব জল হয়েছেন হেসে
এইবারে যাই আদর নিতে কোলের কাছে ঘেঁষে।
এই না ভেবে এক্কেবারে আহ্লাদেতে ক্ষেপে
চড়্‌ল সে তার হাঁটুর উপর দুই পা তুলে চেপে।
সাহেব ডাকেন 'ত্রাহি ত্রাহি' গাধাও ডাকে 'ঘ্যাঁকো'
(অর্থাৎ কিনা 'কোলে চড়েছি, এখন আমায় দ্যাখো!')
ডাক শুনে সব দৌড়ে এল ব্যস্ত হয়ে ছুটে,
দৌড়ে এল চাকর বাকর মিস্ত্রী মজুর মুটে,
দৌড়ে এল পাড়ার লোকে, দৌড়ে এল মালী—
কারুর হাতে ডাণ্ডা লাঠি, কারু বা হাত খালি।
ব্যাপার দেখে অবাক সবাই, চক্ষু ছানাবড়া—
সাহেব বললে, "উচিত মতন শাসনটি চাই কড়া।"
হাঁ হাঁ ব'লে ভীষণ রকম উঠ্‌ল সবাই চটে
দে দমাদম্‌ মারের চোটে গাধার চমক্‌ ছোটে।
ছুটল গাধা প্রাণের ভয়ে গানের তালিম ছেড়ে,
ছুটল পিছে একশো লোকে হুড়মুড়িয়ে তেড়ে।
তিন পা যেতে দশ ঘা পড়ে, রক্ত ওঠে মুখে—
কষ্টে শেষে রক্ষা পেল কাঁটার ঝোপে ঢুকে।
কাঁটার ঘায়ে চামড়া গেল, সার হল তার কাঁদা;
ব্যাপার শুনে বললে সবাই, "সাধে কি বলে গাধা?"

হিংসুটিদের গান

আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিশ্রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্‌,
তোমরা ত তা পাচ্ছ না কেউ পেলেও পাবে কম্‌কম্‌।
আমরা শোব খাট্‌ পালঙে মায়ের কাছে ঘেঁষ্‌টে,
তোমরা শোবে অন্ধকারে একলা ভয়ে ভেস্তে।
আমরা যাব জাম্‌তাড়াতে চড়ব কেমন ট্রেইনে,
চেঁচাও যদি ''সঙ্গে নে যাও'' বল্‌ব "কলা এই নে"!
আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙিন্‌ জুতোয় মচ্‌মচ্‌,
তোমরা হাঁদা নোংরা ছিছি হ্যাংলা নাকে ফঁচ্‌ফঁচ্‌।
আমরা পরি রেশ্‌মি জরি, আমরা পরি গয়না,
তোমরা সেসব পাও না ব'লে তাও তোমাদের সয় না।
আমরা হব লাটমেজাজী, তোমরা হবে কিপ্‌টে,
চাইবে যদি কিচ্ছু তখন ধর্‌ব গলা চিপ্‌টে।



নিঃস্বার্থ

গোপ্‌লাটা কি হিংসুটে মা! খাবার দিলেম ভাগ করে,
বল্লে নাকো মুখেও কিছু, ফেল্লে ছুঁড়ে রাগ করে।
জ্যাঠাইমা যে মেঠাই দিলেন "দুই ভায়েতে খাও" ব'লে—
দশটি ছিল, একটি তাহার চাখতে নিলেম ফাও বলে।
আর যে ন'টি, ভাগ করে তায়, তিন্‌টে দিলেম গোপ্‌লাকে—
তবুও কেবল হ্যাংলা ছেলে আমার ভাগেই চোখ রাখে।
বুঝিয়ে বলি, "কাঁদিস্ কেন? তুই যে নেহাত কনিষ্ঠ—
বয়েস বুঝে সাম্‌লে খাবি—তা নৈলে হয় অনিষ্ট।
তিনটি বছর তফাৎ মোদের, জ্যায়দা হিসাব গুন্‌তি তাই,
মোদ্দা আমার ছয়খানি হয়, তিন বছরের তিন্‌টি পাই।"
তাও মানে না, কেবল কাঁদে—স্বার্থপরের শয়তানী—
শেষটা আমায় মেঠাইগুলো খেতেই হল সবখানি।

জালা-কুঁজো সংবাদ

পেটমোটা জালা কয়, "হেসে আমি মরিবে
কুঁজো তোর হেন গলা এতটুকু শরীরে!"
কুঁজো কয়, "কথা কস্ আপনাকে না চিনে,
ভুঁড়িখানা দেখে তোর কেঁদে আর বাঁচিনে।"
জালা কয়, "সাগরের মাপে গড়া বপুখান,
ডুবুরিরা কত তোলে তবু জল অফুরান।"
কুঁজো কয়, "ভালো কথা! তবে যদি দৈবে,
ভুঁড়ি যায় ভেস্‌তিয়ে, জল কোথা রইবে?"
"নিজ কথা ভুলে যাস্?" জালা কয় গর্জে,
"ঘাড়ে ধরে হেঁট ক'রে জল নেয় তোর যে!"
কুঁজো কয়, "নিজ পায়ে তবু খাড়া রই তো—
বিঁড়ে বিনা কুপোকাৎ, তেজ তোর ঐতো!"

তেজিয়ান্

চলে খচ্‌খচ্‌ রাগে গজ্‌গজ্‌ জুতা মচ্‌মচ্‌ তানে,
ভুরু কট্‌মট্‌ ছড়ি ফট্‌ফট্‌ লাথি চট্‌পট্‌ হানে।

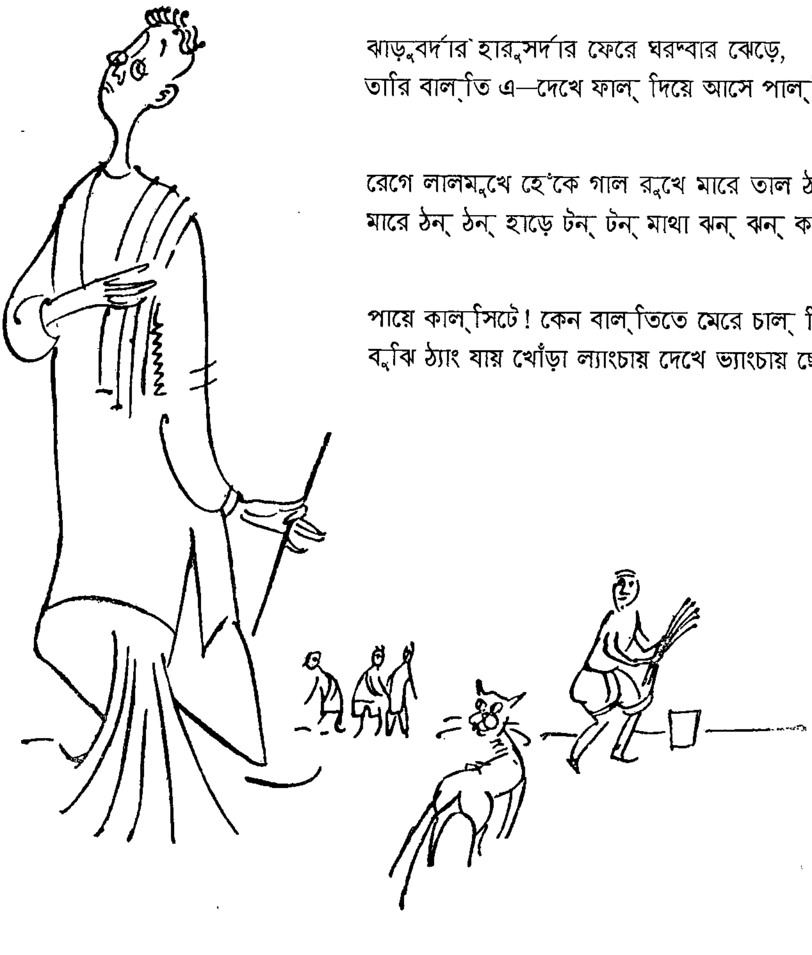
দেখে বাঘ-রাগ লোকে 'ভাগ্‌ভাগ্‌' করে আগভাগ থেকে,
ভয়ে লাফ ঝাঁপ বলে 'বাপ্‌ বাপ্‌' সবে হাবভাব দেখে।

লাথি চার চার খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাত ক'রে হুট্‌পাট্‌ চলে ফুট্‌পাথ্‌ পরে।

ঝাড়ুবর্দার হারুসর্দার ফেরে ঘরদ্বার ঝেড়ে,
তারি বাল্‌তি এ—দেখে ফাল্‌ দিয়ে আসে পাল্‌টিয়ে তেড়ে।

রেগে লালমুখে হেঁকে গাল রুখে মারে তাল ঠুকে দাপে,
মারে ঠন্‌ ঠন্‌ হাড়ে টন্‌ টন্‌ মাথা ঝন্‌ ঝন্‌ কাঁপে!

পায়ে কাল্‌সিটে! কেন বাল্‌তিতে মেরে চাল্‌ দিতে গেলে?
বুঝি ঠ্যাং যায় খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।



হরিষে বিষাদ



দেখছে খোকা পঞ্জিকাতে এই বছরে কখন কবে
ছুটির কত খবর লেখে, কিসের ছুটি কদিন হবে।

ঈদ্ মহরম দোল্ দেওয়ালি বড়দিন আর বর্ষশেষে—
ভাবছে যত ফুল্লমুখে ফুর্তিভরে ফেলছে হেসে।

এমনকালে নীল আকাশে হঠাৎ-খ্যাপা মেঘের মত,
উথ্‌লে ছোটে কান্নাধারা ডুবিয়ে তাহার হর্ষ যত।

"কি হল তোর?" সবাই বলে, "কলমটা কি বিঁধল হাতে?"
"জিবে কি তোর দাঁত বসালি? কামড়াল কি ছারপোকাতে?"

প্রশ্ন শুনে কান্না চড়ে অশ্রু ঝরে দ্বিগুণ বেগে,
পঞ্জিকাটি আছড়ে ফেলে বললে কেঁদে আগুন রেগে;

"ঈদ্ পড়েছে জষ্ঠি মাসে গ্রীষ্মে যখন থাকেই ছুটি,
বর্ষশেষ আর দোল্ ত দেখি রোব্‌বারেতেই পড়ল দুটি।

দিনগুলোকে করলে মাটি মিথ্যে পাজি পঞ্জিকাতে—
মুখ ধোবনা ভাত খাবনা ঘুম যাবনা আজকে রাতে।"

ওরে ছাগল, বল্‌ত আগে
সুড়সুড়িটা কেমন লাগে?
কই গেল তোর জারিজুরি
লম্ফঝম্ফ বাহাদুরি।
নিত্যি যে তুই আসতি তেড়ে
শিং নেড়ে আর দাড়ি নেড়ে।
ওরে ছাগল করবি রে কি?
গুঁতোবি তো আয়না দেখি।





হাঁ হাঁ হাঁ, এ কেমন কথা?
এমন ধারা অভদ্রতা!
শান্ত যারা ইতরপ্রাণী
তাদের পরে চোখরাঙানি!
ঠাণ্ডা মেজাজ কয় না কিছু
লাগতে গেছ তারই পিছু?
শিক্ষা তোদের এম্নিতর
ছি—ছি—ছি! লজ্জা বড়।

ছাগল ভাবে সামনে একি!
একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি।
গুঁতোর চোটে ধড়াধ্বড়
হুড়মুড়িয়ে ধুলোয় পড়।
তবে রে পাজি লক্ষ্মীছাড়া
আমার 'পরেই বিদ্যেঝাড়া,
পাত্রাপাত্র নাই কিরে হুঁশ্‌
দে দমাদম্‌ ধুপুস ধাপুস।



সঙ্গীহারা

সবাই নাচে ফুর্তি করে সবাই গাহে গান,
একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান?
দেখ্‌ছ নাকি আমার সাথে সবাই করে আড়ি—
তাইতো আমার মেজাজ খ্যাপা মুখটি এমন হাঁড়ি।

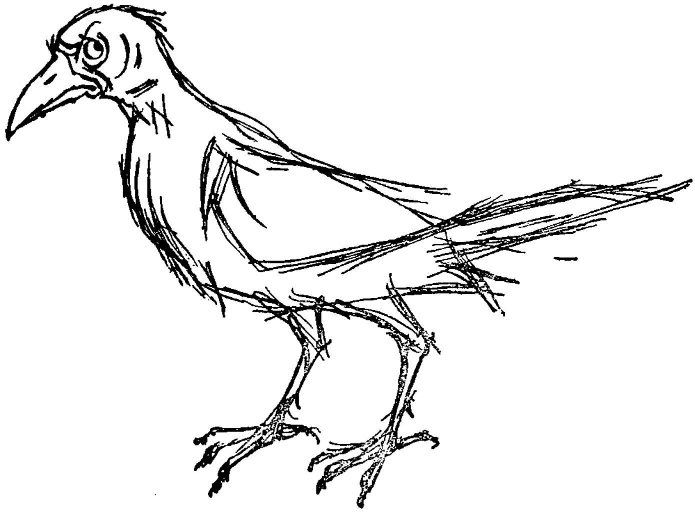
তাও কি হয়! ঐ যে মাঠে শালিখ পাখি ডাকে
তার কাছে কৈ যাওনিতো ভাই শুধাওনিতো তাকে!
শালিখ পাখি বেজায় ঠ্যাঁটা চেঁচায় মিছিমিছি,
হল্লা শুনে হাড় জ্বলে যায় কেবল কিচিমিচি।

মিষ্টি সুরে দোয়েল পাখি জুড়িয়ে দিল প্রাণ
তার কাছে কৈ বসলে নাতো শুনলে না তার গান!
দোয়েল পাখির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর কি লাগে ভালো?
যেমন রূপে তেমন গুণে তেমনি আবার কালো।

রূপ যদি চাও যাও না কেন মাছরাঙার কাছে,
অমন খাসা রঙের বাহার আর কি কারো আছে?
মাছরাঙা! তারেও কি আর পাখির মধ্যে ধরি
রকম সকম সঙের মতন, দেমাক দেখে মরি।

পায়রা ঘুঘু কোকিল চড়াই চন্দনা টুনটুনি
কারে তোমার পছন্দ হয়, সেই কথাটি শুনি!
এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখি নেহাৎ ছোট জাত—
দেখলে আমি তফাৎ হঠি অমনি পঁচিশ হাত!

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি যে—
সবার তুমি খুঁৎ পেয়েছ নিখুঁৎ কেবল নিজে!
মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নাই লেখা
তাইতে তোমায় কেউ পোঁছে না তাইতে থাক একা।



মূর্খ মাছি

মাকড়সা। সান্-বাঁধা মোর আঙিনাতে
জাল্ বুনেছি কাল্‌কে রাতে,
ঝুল ঝেড়ে সব সাফ করেছি বাসা।
আয় না মাছি আমার ঘরে,
আরাম পাবি বসলে পরে,
ফরাশ্ পাতা দেখবি কেমন খাসা!

মাছি। থাক্ থাক্ থাক্ আর বলে না,
আন্‌কথাতে মন গলে না—
ব্যবসা তোমার সবার আছে জানা।
ঢুক্‌লে তোমার জালের ঘেরে
কেউ কোনদিন আর কি ফেরে?
বাপ্‌রে! সেথায় ঢুক্‌তে মোদের মানা।

মাকড়সা। হাওয়ায় দোলে জালের দোলা
চারদিকে তার জাল্‌না খোলা
আপ্‌নি ঘুমে চোখ যে আসে জুড়ে!
আয় না হেথা হাত পা ধুয়ে
পাখ্‌না মুড়ে থাক্ না শুয়ে—
ভন্ ভন্ ভন্ মরবি কেন উড়ে?

মাছি। কাজ নেই মোর দোলায় দুলে,
কোথায় তোমার কথায় ভুলে
প্রাণটা নিয়ে টান্ পড়ে ভাই শেষে।
তোমার ঘরে ঘুম যদি পায়
সে ঘুম কভু ভাঙ্‌বে না হায়—
সে ঘুম নাকি এমন সর্বনেশে!

মাকড়সা। মিথ্যে কেন ভাবিস্ মনে?
দেখ্‌না এসে ঘরের কোণে,
ভাঁড়ার ভরা খাবার আছে কত!
দে-টপাটপ্ ফেল্‌বি মুখে
নাচ্‌বি গাবি থাক্‌বি সুখে
ভাবনা ভুলে বাদ্‌শা-রাজার মতো।

মাছি। লোভ দেখালেই ভুলবে ভবি,
ভাব্‌ছ আমায় তেম্‌নি লোভী!
মিথ্যে দাদা ভোলাও কেন খালি?
কর্‌ব কি ছাই ভাঁড়ার দেখে?
প্রণাম করি আড়াল থেকে—
আজকে তোমার সেই গুড়ে ভাই বালি।

মাকড়সা। নধর কালো বদন ভ'রে
রূপ যে কত উপ্‌চে পড়ে!
অবাক দেখি মুকুটমালা শিরে!
হাজার চোখে মাণিক জ্বলে!
ইন্দ্রধনু পাখার তলে!—
ছয় পা ফেলে আয় না দেখি ধীরে।

মাছি। মন ফুর্‌ফুর্‌ ফুর্তি নাচে—
একটুখানিক যাই না কাছে!
যাই যাই যাই—বাপ্‌রে একি ধাঁধাঁ!
—ও দাদা ভাই রক্ষে কর!
ফাঁদ পাতা এ কেমনতরো!
আট্‌কা পড়ে হাত পা হল বাঁধা।

দুষ্টুলোকের মিষ্টি কথায়
নাচলে লোকের স্বস্তি কোথায়?
এম্নি দশাই তার কপালে লেখে।
কথার পাকে মানুষ মেরে
মাকড়জীবী ঐ যে ফেরে
গড় করি তায় অনেক তফাৎ থেকে ॥

বিখ্যাত ইংরেজি কবিতার অনুসরণে

জীবনের হিসাব

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে
মাঝিরে কন, "বল্‌তে পারিস্‌ সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মর্‌লিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি!"

খানিক বাদে কহেন বাবু "বল্‌ত দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় হতে নেবে?
বল্‌ত কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি?"
মাঝি সে কয়, "আরে মশাই অত কি আর জানি?"
বাবু বলেন, "এই বয়সে জানিসনেও তাকি?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি।"

আবার ভেবে কহেন বাবু "বল্‌তো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চুড়ো?
বল্‌ত দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?"
বৃদ্ধ বলে, "আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?"
বাবু বলেন, "বল্‌ব কি আর, বল্‌ব তোরে কি তা,—
দেখ্‌ছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।"

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুব্‌ল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, "একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুব্‌ল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?"
মাঝি শুধায়, "সাঁতার জানো?" মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।"



আশ্চর্য !

নিরীহ কলম, নিরীহ কালি,
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি—
"বাঁদর বেকুব আজব হাঁদা
বকাট্ ফাজিল অকাট্ গাধা।"
আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি, যতন করি—
"শান্ত মানিক শিষ্ট সাধু
বাছারে, ধনরে, লক্ষ্মী যাদু।"
মনের কথাটি ছিল যে মনে,
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে,
আঁচড়ে আঁকিতে আখর ক'টি
কেহ খুশী, কেহ উঠিল চটি!
রকম রকম কালির টানে
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে,
মারে না, ধরে না, হাঁকে না বুলি
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি?
শাদায় কালোয় কি খেলা জানে?
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে।

নিরুপায়

বসি বছরের পয়লা তারিখে
মনের খাতায় রাখিলাম লিখে—
"সহজ উদরে ধরিবে যেটুক,
সেইটুকু খাব হব না পেটুক।"
মাস দুই যেতে খাতা খুলে দেখি
এরি মাঝে মন লিখিয়াছে একি!
লিখিয়াছে "যদি নেমন্তনে
কেঁদে ওঠে প্রাণ লুচির জন্যে,
উচিত হবে কি কাঁদান তাহারে?
কিম্বা যখন বিপুল আহারে,
তেড়ে দেয় পাতে পোলাও কালিয়া
পায়েস অথবা রাবড়ি ঢালিয়া—
তখন কি করি, আমি নিরুপায়!
তাড়াতে না পারি, বলি আয় আয়,
ঢুকে আয় মুখে দুয়ার ঠেলিয়া
উদার রয়েছি উদর মেলিয়া!"

ঠাকুরদাদার চশমা কোথা?
ওরে গন্‌শা, হাবুল, ভোঁতা,
দেখ্‌না হেথা, দেখ্‌না হোথা—খোঁজ্‌ না নিচে গিয়ে।

কই কই কই? কোথায় গেল?
টেবিল টানো, ডেস্কো ঠেল,
ঘরদোর সব উল্টে ফেল—খোঁচাও লাঠি দিয়ে।

খুঁজছে মিছে কুঁজোর পিছে,
জুতোর ফাঁকে, খাটের নিচে,
কেউ বা জোরে পর্দা খিঁচে—বিছ্‌না দেখে ঝেড়ে—

হারিয়ে পাওয়া

লাফিয়ে ঘুরে হাঁপিয়ে ঘেমে
ক্লান্ত সবে পড়্‌ল থেমে,
ঠাকুরদাদা আপনি নেমে আসেন তেড়েমেড়ে।

বলেন রেগে, "চশমাটা কি
ঠ্যাং গজিয়ে ভাগ্‌ল নাকি?
খোঁজার নামে কেবল ফাঁকি—দেখ্‌ছি আমি এসে!"

যেমন বলা দারুণ রোষে,
কপাল থেকে অম্নি খ'সে
চশমা পড়ে তক্তপোশে—সবাই ওঠে হেসে!



হঠাৎ কেন দুপুর রোদে চাদর দিয়ে মুড়ি,
চোরের মত নন্দগোপাল চল্‌ছে গুড়ি গুড়ি?
লুকিয়ে বুঝি মুখোশখানা রাখছে চুপি চুপি?
আজকে রাতে অন্ধকারে টেরটা পাবেন গুপি!

আয়না হাতে দাঁড়িয়ে গুপি হাসছে কেন খালি?
বিকট রকম পোশাক করে মাখ্‌ছে মুখে কালি!
এম্নি করে লম্ফ দিয়ে ভেংচি যখন দেবে
নন্দ কেমন আঁৎকে যাবে—হাস্‌ছে সে তাই ভেবে।

আঁধার রাতে পাতার ফাঁকে ভূতের মতন কেরে?
ফন্দি এঁটে নন্দগোপাল মুখোশ মুখে ফেরে!
কোথায় গুপি, আসুক না সে ইদিক্‌ পানে ঘুরে—
নন্দদাদার হুঙ্কারে তার প্রাণটি যাবে উড়ে।

নন্দগুপি



হেথায় কেরে মূর্তি ভীষণ মুখটি ভরা গোঁফে?
চিমটে হাতে জংলা গুপি বেড়ায় ঝাড়ে ঝোপে!
নন্দ যখন বাড়ির পথে আস্‌বে গাছের আড়ে,
"মার্‌ মার্‌ মার্‌ কাট্‌রে" বলে পড়্‌বে তাহার ঘাড়ে!

নন্দ চলেন এক পা দু পা আস্তে ধীরে গতি,
টিপিটিপি চলেন গুপি সাবধানেতে অতি—
মোড়ের মুখে ঝোপের কাছে মার্‌তে গিয়ে উঁকি
দুই সেয়ানে একেবারে হঠাৎ মুখোমুখি!

নন্দ তখন ফন্দি ফাঁদন কোথায় গেল ভুলি
কোথায় গেল গুপির মুখে মার্‌ মার্‌ মার্‌ বুলি!
নন্দ পড়েন দাঁতকপাটি মুখোশ্‌ টুখোশ্‌ ছেড়ে
গুপির গায়ে জ্বরটি এল কম্প দিয়ে তেড়ে।

গ্রামের লোকে দৌড়ে তখন বদ্যি আনে ডেকে
কেউ বা নাচে কেউ বা কাঁদে রকম সকম দেখে।
নন্দগুপির মন্দ কপাল এম্‌নি হল শেষে
দেখ্‌লে তাদের লুটোপুটি সবাই মরে হেসে!



চলে হন্ হন্ ছোটে পন্ পন্
ঘোরে বন্ বন্ কাজে ঠন্ ঠন্
বায়ু শন্ শন্ শীতে কন্ কন্
কাশি খন্ খন্ ফোড়া টন্ টন্
মাছি ভন্ ভন্ থালা ঝন্ ঝন্



দাদা গো দাদা, সত্যি তোমার সুরগুলো খুব খেলে!
এম্নি মিঠে—ঠিক যেন কেউ গুড় দিয়েছে ঢেলে!
দাদা গো দাদা, এমন খাসা কণ্ঠ কোথায় পেলে?—
এই খেলে যা! গান শোনাতে আমার কাছেই এলে?
দাদা গো দাদা, পায় পড়ি তোর, ভয় পেয়ে যায় ছেলে—
গাইবে যদি ঐখেনে গাও, ঐ দিকে মুখ মেলে।

কেন সব কুকুরগুলো খামখা চ্যাঁচায় রাতে?
কেন বল্ দাঁতের পোকা থাকে না ফোক্লা দাঁতে?
পৃথিবীর চ্যাপ্টা মাথা, কেন সে কাদের দোষে?—
এস ভাই চিন্তা করি দুজনে ছায়ায় বসে।

বর্ষ গেল, বর্ষ এল

বর্ষ গেল বর্ষ এল, গ্রীষ্ম এলেন বাড়ি—
পৃথ্বী এলেন চক্র দিয়ে এক বছরের পাড়ি।
সত্যিকারের এই পৃথিবী বয়স কেবা জানে,
লক্ষ হাজার বছর ধরে চল্‌ছে একই টানে।
আপন তালে আকাশ পথে আপনি চলে বেগে,
গ্রীষ্মকালের তপ্তরোদে বর্ষাকালের মেঘে,
শরৎকালের কান্নাহাসি হাল্কা বাদল হাওয়া,
কুয়াশা-ঘেরা পর্দা ফেলে হিমের আসা যাওয়া—
শীতের শেষে রিক্ত বেশে শূন্য করে ঝুলি,
তার প্রতিশোধ ফুলে ফলে বসন্তে লয় তুলি।
না জানি কোন নেশার ঝোঁকে যুগযুগান্ত ধরে,
ছয়টি ঋতুর দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘোরে!
না জানি কোন ঘূর্ণীপাকে দিনের পরে দিন,
এমন ক'রে ঘোরায় তারে নিদ্রাবিরামহীন!
কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম রাখে লক্ষযুগের প্রথা,
না জানি তার চাল চলনের হিসাব রাখে কোথা!



গ্রীষ্ম

ঐ এল বৈশাখ ঐ নামে গ্রীষ্ম,
খাইখাই রবে যেন ভয়ে কাঁপে বিশ্ব!
চোখে যেন দেখি তার ধূলিমাখা অঙ্গ,
বিকট কুটিলজটে ভ্রূকুটির ভঙ্গ,
রোদে রাঙা দুই আঁখি শুকায়েছে কোটরে,
ক্ষুধার আগুন যেন জ্বলে তার জঠরে!
মনে হয় বুঝি তার নিঃশ্বাস মাত্রে
তেড়ে আসে পালাজ্বর পৃথিবীর গাত্রে!
ভয় লাগে হয় বুঝি ত্রিভুবন ভস্ম—
ওরে ভাই ভয় নাই পাকে ফল শস্য!
তপ্ত ভীষণ চুলা জ্বালি নিজ বক্ষে
পৃথিবী বসেছে পাকে, চেয়ে দেখ চক্ষে,—
আম পাকে, জাম পাকে, ফল পাকে কত যে,
বুদ্ধি যে পাকে কত ছেলেদের মগজে!

বর্ষার কবিতা

কাগজ কলম লয়ে বসিয়াছি সদ্য,
আষাঢ়ে লিখিতে হবে বরষার পদ্য।
কি যে লিখি কি যে লিখি ভাবিয়া না পাই রে,
হতাশে বসিয়া তাই চেয়ে থাকি বাইরে।
সারাদিন ঘনঘটা কালো মেঘ আকাশে,
ভিজে ভিজে পৃথিবীর মুখখানা ফ্যাকাশে।
বিনা কাজে ঘরে বাঁধা কেটে যায় বেলাটা,
মাটি হল ছেলেদের ফুটবল খেলাটা।
আপিসের বাবুদের মুখে নাই ফূর্তি,
ছাতা কাঁধে জুতা হাতে ভ্যাবাচ্যাকা মূর্তি।
কোনখানে হাঁটু জল, কোথা ঘন কর্দম—
চলিতে পিছল পথে পড়ে লোকে হর্‌দম।
ব্যাঙেদের মহাসভা আহ্লাদে গদ্‌গদ্‌,
গান করে সারারাত অতিশয় বদ্‌খদ্‌।

বর্ষশেষ

শুন রে আজব কথা, শুন বলি ভাই রে—
বছরের আয়ু দেখ আর বেশি নাই রে।
ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে, কোথা হতে বল সে!
কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে!
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার।
কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোনো উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর দূর দেশ।
রবি যায় শশী যায় গ্রহ তারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায়।
ঘুরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে,
তালে তালে হেলে দুলে চলেরে আনন্দে।

শ্রাবণে

জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত—
অফুরান নাম্‌তায় বাদলের ধারাপাত।
আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম্‌ বারিধার।
স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,
নদীনালা ঘোলাজল ভরে ওঠে ভরসায়।
উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্লাবনের।
জলেজলে জলময় দশদিক্‌ টলমল্‌,
অবিরাম একই গান, ঢালো জল, ঢালো জল।
ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের,
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের।
শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুক্‌ধুক্‌,
ধরণীর আশাভয় ধরণীর সুখদুখ।

অতীতের ছবি

অতীতের ছবি

১

ছিল এ-ভারতে এমন দিন
মানুষের মন ছিল স্বাধীন;
সহজ উদার সরল প্রাণে
বিস্ময়ে চাহিত জগত পানে।
আকাশে তপন তারকা চলে,
নদী যায় ভেসে, সাগর টলে,
বাতাস ছুটিছে আপন কাজে,
পৃথিবী সাজিছে নানান্ সাজে;
ফুলে ফলে ছয় ঋতুর খেলা,
কত রূপ কত রঙের মেলা;
মুখরিত বন পাখির গানে,
অটল পাহাড় মগন ধ্যানে;
নীলাকাশে ঘন মেঘের ঘটা,
তাহে ইন্দ্রধনু বিজলী ছটা,
তাহে বারিধারা পড়িছে ঝরি—
দেখিত মানুষ নয়ন ভরি।
কোথায় চলেছে কিসের টানে
কোথা হতে আসে, কেহ না জানে।
ভাবিত মানব দিবস-যামী,
ইহারি মাঝারে জাগিয়া আমি,
কিছু নাহি বুঝি কিছু না জানি,
দেখি দেখি আর অবাক মানি।
কেন চলি ফিরি কিসের লাগি
কখন ঘুমাই কখন জাগি,
কত কান্না হাসি দুখে ও সুখে
ক্ষুধা তৃষ্ণা কত বাজিছে বুকে।
জন্ম লভি জীব জীবন ধরে,
কোথায় মিলায় মরণ পরে?
ভাবিতে ভাবিতে আকুল প্রাণে
ডুবিত মানব গভীর ধ্যানে।
অকূল রহস্য-তিমির তলে,
জ্ঞানজ্যোতির্ময় প্রদীপ জ্বলে,
সমাহিত চিতে যতন করি
অচঞ্চল শিখা সে আলো ধরি
দিব্য জ্ঞানময় নয়ন লভি,
হেরিল নূতন জগত ছবি।

অনাদি নিয়মে অনাদি স্রোতে
ভাসিয়া চলেছে অকূল পথে
প্রতি ধূলিকণা নিখিল টানে
এক হতে ধায় একেরি পানে,
চলেছে একেরি শাসন মানি,
লোকে লোকান্তরে একেরি বাণী।
এক সে অমৃতে হয়েছে হারা
নিখিল জীবন-মরণ ধারা।
সে অমৃতজ্যোতি আকাশ ঘেরি,
অন্তরে বাহিরে অমৃত হেরি।
যাঁহা হতে জীব জনম লভে,
যাঁহা হতে ধরে জীবন সবে,
যাঁহার মাঝারে মরণ পরে
ফিরি পুন সবে প্রবেশ করে,
তাঁহারে জানিবে যতন ধরি
তিনি ব্রহ্ম তাঁরে প্রণাম করি।
আনন্দেতে জীব জনম লভে
আনন্দে জীবিত রয়েছে সবে;
আনন্দে বিরাম লভিয়া প্রাণ
আনন্দের মাঝে করে প্রয়াণ।
শুন বিশ্বলোক, শুনহ বাণী
অমৃতের পুত্র সকল প্রাণী,
দিব্যধামবাসী শুনহ সবে—
জেনেছি তাঁহারে, যিনি এ ভবে
মহান পুরুষ, নিখিল গতি,
তমসার পরে পরম জ্যোতি।
তেজোময় রূপ হেরিয়া তাঁরে
স্তব্ধ হয় মন, বচন হারে।
বামে ও দখিনে উপরে নীচে,
ভিতরে বাহিরে, সমুখে পিছে,
কিবা জলেস্থলে আকাশ পরে,
আঁধারে আলোকে চেতনে জড়ে;
আমার মাঝারে, আমারে ঘেরি
এক ব্রহ্মময় প্রকাশ হেরি।
সে আলোকে চাহি আপন পানে
আপনারে মন স্বরূপ জানে।

আমি আমি করি দিবস-যামী,
না জানি কেমন কোথা সে 'আমি'।
অজয় অমর অরূপ রূপ
নহি আমি এই জড়ের স্তূপ,
দেহ নহে মোর চির-নিবাস
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ।
বিশ্ব আত্মা মাঝে হয়ে মগন
আপন স্বরূপ হেরিলে মন
না থাকে সন্দেহ না থাকে ভয়
শোক তাপ মোহ নিমেষে লয়,
জীবনে মরণে না রহে ছেদ,
ইহ-পরলোকে না রহে ভেদ।
ব্রহ্মানন্দময় পরম ধাম,
হেথা আসি সবে লভে বিরাম;
পরম সম্পদ পরম গতি,
লভ তাঁরে জীব যতনে অতি।

২

কালচক্রে হায় এমন দেশে
ঘোর দুঃখদিন আসিল শেষে।
দশদিক হতে আঁধার আসি
ভারত আকাশ ফেলিল গ্রাসি।
কোথা সে প্রাচীন জ্ঞানের জ্যোতি,
সত্য অন্বেষণে গভীর মতি;
কোথা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন ধন,
কোথা ঋষিগণ ধ্যানে মগন;
কোথা ব্রহ্মচারী তাপস যত,
কোথা সে ব্রাহ্মণ সাধনা রত?
একে একে সবে মিলাল কোথা,
আর নাহি শুনি প্রাচীন কথা।
মহামূল্য নিধি ঠেলিয়া পায়
হেলায় মানুষ হারাল তায়।
আপন স্বরূপ ভুলিয়া মন
ক্ষুদ্রের সাধনে হল মগন।
ক্ষুদ্র চিন্তা মাঝে নিয়ত মজি,
ক্ষুদ্র স্বার্থ-সুখ জীবনে ভজি;
ক্ষুদ্র তৃপ্তি লয়ে মূঢ়ের মত
ক্ষুদ্রের সেবায় হইল রত।

রচি নব নব বিধি-বিধান
নিগড়ে বাঁধিল মানব প্রাণ;
সহস্র নিয়ম নিষেধ শত,
তাহে বদ্ধ নর জড়ের মত;
লিখি দাসখত ললাটে তার
রুদ্ধ করি দিল মনের দ্বার।
জ্বলন্ত যাঁহার প্রকাশ ভবে
হায়রে তাঁহারে ভুলিল সবে;
কল্পনার পিছে ধাইল মন,
কল্পিত দেবতা হল সৃজন,
কল্পিত রূপের মূরতি গড়ি,
মিথ্যা পূজাচার রচন করি,
ব্যাখ্যা করি তার মহিমা শত,
মিথ্যা শাস্ত্রবাণী রচিল কত।
তাহে তপ্ত হয়ে অবোধ নরে
রহে উদাসীন মোহের ভরে
না জাগে জিজ্ঞাসা অলস মনে,
দেখিয়া না দেখে পরম ধনে।
ব্রাহ্মণেরে লোকে দেবতা মানি
নির্বিচারে শুনে তাহারি বাণী।
পিতৃপুরুষের প্রসাদ বরে
বসি উচ্চাসনে গরব ভরে
পূজা-উপাচার নিয়ত লভি
ভুলিল ব্রাহ্মণ নিজ পদবী।
কিসে নিত্যকাল এ ভারতভবে
আপন শাসন অটুট রবে
এই চিন্তা সদা করি বিচার
হল স্বার্থপর হৃদয় তার।
ভেদবুদ্ধিময় মানব মন
নব নব ভেদ করে সৃজন।
জাতিরে ভাঙিয়া শতধা করে,
তাহার উপরে সমাজ গড়ে;
নানা বর্ণ নানা শ্রেণীবিচার,
নানা কূটবিধি হল প্রচার।
ভেদ বুদ্ধি কত জীবন মাঝে
অশনে বসনে সকল কাজে,
ধর্ম অধিকারে বিচার ভেদ

মানুষে মানুষে করে প্রভেদ।
ভেদ জনে জনে, নারী ও নরে,
জাতিতে জাতিতে বিচার ঘরে।
মিথ্যা অহংকারে মোহের বশে
জাতির একতা বাঁধন খসে;
হয়ে আত্মঘাতী ভারতভবে
আপন কল্যাণ ভুলিল সবে।

৩

এখনও গভীর তমসা রাতি,
ভারত ভবনে নিভিছে বাতি—
মানুষ না দেখি ভারতভূমে,
সবাই মগন গভীর ঘুমে।
কত জাতি আজ হেলার ভরে
হেথায় আসিয়া বসতি করে।
ভারতের বুকে নিশান গাঁথি
বসেছে সবলে আসন পাতি।
নিজ ধনবান নিজ বিভব
বিদেশীর হাতে সঁপিয়া সব,
ভারতের মুখে না ফুটে বাণী,
মৌন রহে দেশ শরম মানি।
—হেনকালে শুন ভেদি আঁধার
সুগম্ভীর বাণী উঠিল কার—
"ভাব সেই একে ভাবহ তাঁরে,
জলে স্থলে শূন্যে হেরিছ যাঁরে;
নিয়ত যাঁহার স্বরূপ ধ্যানে
দিব্য জ্ঞান জাগে মানব প্রাণে।
ছাড় তুচ্ছ পূজা জড় সাধন,
মিথ্যা দেবসেবা ছাড় এখন;
বেদান্তের বাণী স্মরণ কর,
ব্রহ্মজ্ঞান-শিখা হৃদয়ে ধর।
সত্য মিথ্যা দেখ করি বিচার
খুলি দাও যত মনের দ্বার।
মানুষের মত স্বাধীন প্রাণে
নির্ভয়ে তাকাও জগত পানে—
দিকে দিকে দেখ ঘুচিছে রাতি,
দিকে দিকে জাগে কত না জাতি;
দিকে দিকে লোক সাধনারত
জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলেছে কত।
নাহি কি তোমার জ্ঞানের খনি!
বেদান্ত-রতন মুকুটমণি?
অসারে মজে কি ভুলেছ তুমি
ধর্মে গরীয়ান ভারতভূমি?"
—শুনি মৃতদেশ পরান পায়,
বিস্ময়ে মানুষ ফিরিয়া চায়।
দেখে দিব্যরূপ পুরুষবরে
কান্তি তেজোময় নয়ন হরে,
সবল শরীর সুঠাম অতি,
ললাট প্রসর, নয়নে জ্যোতি,
গম্ভীর স্বভাব, বচন ধীর,
সত্যের সংগ্রামে অজেয় বীর;
অতুল প্রখর প্রতিভাবরে
নানা শাস্ত্র ভাষা বিচার করে।
রামমোহনের[১] জীবন স্মরি,
কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি।
দেশের দুর্গতি সকলখানে
হেরিয়া বাজিল রাজার প্রাণে।
কত অসহায় অবোধ নারী
সতীত্বের নামে সকল ছাড়ি,
কেহ স্ব-ইচ্ছায়, কেহবা ভয়ে,
শাসনে-তাড়নে পিষিত হয়ে,
পতির চিতায় পুড়িয়া মরে—
শুনি কাঁদে প্রাণ তাদের তরে।
নারীদুঃখ নাশ করিল পণ,
ঘুচিল নারীর সহমরণ।
নিষ্কাম করম-যোগীর মত
দেশের কল্যাণ সাধনে রত,
নানা শাস্ত্রবাণী করে চয়ন,
দেশ দেশান্তের ঋষিবচন;
পশ্চিমের নব জ্ঞানের বাণী
দেশের সমুখে ধরিল আনি।
কিরূপেতে পুন এ ভারতভবে
ব্রহ্মজ্ঞান কথা প্রচার হবে,
নিয়ত যতন তাহারি তরে,
কত শ্রম কত প্রয়াস করে;
তর্ক আলোচনা কত বিচার
কত গ্রন্থ রচি' করে প্রচার;
—ক্রমে বিনাশিতে জড় ধরম
'ব্রহ্ম সমাজে'র হল জনম।
শুনে দেশবাসী নূতন কথা,

মূরতিবিহীন পূজার প্রথা;
উপাসনা-গৃহ দেখে নূতন
যেথায় স্বদেশী-বিদেশী জন
শূদ্র দ্বিজ আদি মিলিয়া সবে
নির্বিচারে সদা আসন লভে।
মহাপুরুষের বিপুল শ্রমে
দেশে যুগান্তর আসিল ক্রমে।
স্বদেশের তরে আকুল প্রাণ
প্রবাসেতে রাজা করে প্রয়াণ;
সেথায় সুদূর বিলাতে হায়
অকালেতে রাজা ত্যজিল কায়।
অসমাপ্ত কাজ রহিল পড়ে,
ফিরে যায় লোকে নিরাশা ভরে;
একে একে সব যেতেছে চলে—
ভাসে রামচন্দ্র[২] নয়নজলে।
রাজার জীবন নিয়ত স্মরি'
উপাসনা-গৃহে রহে সে পড়ি,
নিয়ম ধরিয়া পূজার কালে
নিষ্ঠাভরে সেথা প্রদীপ জ্বালে।
একা বসি ভাবে, রাজার কাজ
এমন দুর্দিনে কে লবে আজ?

৪

ধনী যুবা এক শ্মশান ঘাটে
একা বসি তার রজনী কাটে।
অদূরে অন্তিম শয়নোপরি
দিদিমা তাহার আছেন পড়ি,
সমুখে পূর্ণিমা গগনতলে,
পিছনে শ্মশানে আগুন জ্বলে,
তাহারি মাঝারে নদীর তীরে
হরিনাম ধ্বনি উঠিছে ধীরে।
একাকী যুবক বসিয়া কূলে
সহসা কি ভাবি আপনা ভুলে।
প্রসন্ন আকাশ চাঁদিম রাতি
ধরিল অপূর্ব নূতন ভাতি,
তুচ্ছ বোধ হল ধন-বিভব
বিলাস বাসনা অসার সব,
অজানা কি যেন সহসা স্মরি
পলকে পরান উঠিল ভরি।
আর কি সে মন বিরাম মানে?
গভীর পিপাসা জাগিল প্রাণে।
কোথা শান্তি পাবে ব্যাকুল তৃষা
শুধায় সবারে না পায় দিশা।
—সহসা একদা তাহার ঘরে
ছিন্নপত্র এক উড়িয়া পড়ে;
কি যেন বচন লিখিত তায়
অর্থ তার যুবা ভাবি না পায়।
বিদ্যাবাগীশের নিকটে তবে
যুবা সে বাণীর মরম লভে—
"যাহা কিছু এই জগততলে
অনিত্যের স্রোতে ভাসিয়া চলে
ব্রহ্মে আচ্ছাদিত জানিবে তায়"—
শুনিয়া যুবক প্রবোধ পায়।
শুনি মহাবাণী চমক লাগে,
আরো জানিবারে বাসনা জাগে;
ব্রহ্মজ্ঞান লাভে পিপাসু মন
গভীর সাধনে হল মগন;
যত ডোবে আরো ডুবিতে চায়—
ডুবি নব নব রতন পায়।
হেনকালে হল অশনিপাত—
যুবকের পিতা দ্বারকানাথ,
অতুল সম্পদ ধন বিভব
ঋণের পাথারে ডুবায়ে সব
কিছু না বুঝিতে জানিতে কেহ
অকালে সহসা ত্যজিল দেহ।
আত্মীয়-স্বজন কহিল সবে,
"যে উপায়ে হোক্ বাঁচিতে হবে—
কর অস্বীকার ঋণের দায়
নহিলে তোমার সকলি যায়।"
নাহি টলে তায় যুবার মন,
পিতৃঋণ শোধ করিল পণ,
হয়ে সর্বত্যাগী ফকির দীন
ছাড়ি দিল সব শোধিতে ঋণ।
উত্তমর্ণজনে অবাক মানি
কহে শ্রদ্ধাভরে অভয় বাণী,
"বিষয় বিভব থাকুক তব,
মোরা তাহা হতে কিছু না লব।
সাধুতা তোমার তুলনাহীন;
সাধ্যমত তুমি শোধিও ঋণ।"
বরষের পরে বরষ যায়,

যুবক এখন প্রবীণ-প্রায়।
সংসারে বাসনা-বিগত মন,
ঋষিকল্পরূপ ধ্যানে মগন,
ব্রহ্ম-ধ্যান-জ্ঞানে পূরিত প্রাণ,
ব্রহ্মানন্দ রস করিছে পান;
বচনেতে যেন অমৃত ঝরে—
নমি নমি তাঁরে ভকতি ভরে।
ব্রাহ্মসমাজের আসন হতে
দীপ্ত অগ্নিময় বচন স্রোতে
ব্রহ্মজ্ঞান ধারা বহিয়া যায়,
কত শত লোকে শুনিতে ধায়।
"ব্রহ্মে কর প্রীতি নিয়ত সবে,
প্রিয়কার্য তাঁর সাধহ ভবে।
হের তাঁরে নিজ হৃদয় মাঝে,
সেথা ব্রহ্মজ্যোতি নিয়ত রাজে।
জ্ঞানসমুজ্জ্বল বিমল প্রাণে,
যে জানে তাঁহারে ধ্রুব সে জানে।
জানিবার পথ নাহিক আর,
নহে শাস্ত্রবাণী প্রমাণ তাঁর।
বহু তর্ক বহু বিচার বলে
বহু জপ তপ সাধন ফলে
বহু তত্ত্বকথা আলোড়ি চিতে
নাহি পায় সেই বচনাতীতে।"
ব্রাহ্মসমাজের অসাড় প্রাণে,
মহর্ষির[৩] বাণী চেতনা আনে।
দলে দলে লোক সেথায় ছোটে
উৎসাহের স্রোতে আসিয়া জোটে।
মত্ত অনুরাগে কেশব[৪] ধায়,
প্রতিভার জ্যোতি নয়নে ভায়;
আকুল আহে পরান খুলি
ঝাঁপ দিল স্রোতে আপনা ভুলি।
হেরি মহর্ষির পুলক বাড়ে,
"ব্রহ্মানন্দ" নাম দিলেন তাঁরে।
লভি নব প্রাণ সমাজ-কায়
নব নব ভাবে বিকাশ পায়;
ধর্মগ্রন্থ নব, নব সাধন,
ব্রহ্ম উপাসনা বিধি নূতন,
ধর্মপ্রাণ কত নারী ও নরে
তাহে নিমগন পুলক ভরে।
সমাজে সুদিন এল আবার,
ক্রমে প্রসারিল জীবন তার।
কেশব আপন প্রতিভা বলে
যতনে গঠিল যুবকদলে।
নগরে নগরে হল প্রচার—
"ধর্মরাজ্যে নাহি জাতিবিচার;
নাহি ভেদ হেথা নারী ও নরে,
ভক্তি আছে যার সে যায় ত'রে।
জাতিবর্ণ-ভেদ কুরীতি যত
ভাঙি দাও চিরদিনের মত।
দেশ দেশান্তরে ধাউক মন,
সর্বধর্মবাণী কর চয়ন;
ধর্মে ধর্মে নাহি বিরোধ রবে,
মহা সমন্বয় গঠিত হবে।"
পশিল সে বাণী দেশের প্রাণে,
মুগ্ধ নরনারী অবাক মানে।
নগরে নগরে তুফান উঠে,
ঘরে ঘরে কত বাঁধন টুটে;
ব্রহ্ম নামে সবে ছুটিয়া চলে,
প্রাণ হতে প্রাণে আগুন জ্বলে।
আসিল গোঁসাই[৫] ব্যাকুল হয়ে
প্রেমে ভরপুর ভকতি লয়ে।
আসিল প্রতাপ[৬] স্বভাব ধীর,
গম্ভীর বচন জ্ঞানে গভীর।
স্বল্পভাষী সাধু অঘোরনাথ[৭]
যোগমগ্ন মন দিবসরাত।
গৌরগোবিন্দের[৮] সাধক প্রাণ
হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর অতুল জ্ঞান।
কান্তিচন্দ্র[৯] সদা সেবায় রত
সেবাধর্ম তাঁর জীবন-ব্রত।
ত্রৈলোক্যনাথের[১০] সরস গান
নব নব ভাবে মাতায় প্রাণ।
আরো কত সাধু ধরমমতি
বঙ্গচন্দ্র[১১] আদি প্রচার-ব্রতী
একসাথে মিলি প্রেমের ভরে
প্রেমপরিবার গঠন করে।
কাল কিবা খাবে কেহ না জানে,
আকুল উৎসাহ সবার প্রাণে।
নূতন মন্দির নব সমাজ

নব ভাবে কত নূতন কাজ।
দিনে দিনে নব প্রেরণা পায়,
উৎসাহের স্রোত বাড়িয়া যায়।
সমাজ-চালনা বিধি-বিচার
কেশবের হাতে সকল ভার;
কেশবপ্রেরণা সবার মূলে
তাঁর নামে সবে আপনা ভুলে।
ধন্য ব্রহ্মানন্দ যাঁহার বাণী
শিরে ধরে লোকে প্রমাণ মানি।
যাঁহার সাধনা আজিও হেরি
রয়েছে সমাজ জীবন ঘেরি;
যাঁহার মূরতি স্মরণ করি,
যাঁহার জীবন হৃদয়ে ধরি,
শত শত লোক প্রেরণা পায়—
আজি ভক্তিভরে প্রণমি তাঁয়।
আবার বহিল নূতন ধারা,
সমাজের প্রাণে বাজিল সাড়া;
ভাসি বহুজনে সে নব স্রোতে
বাহির হইল নূতন পথে।
মিলি অনুরাগে যতন ভরে
এই "সাধারণ" সমাজ গড়ে।
ওদিকে কেশব নূতন বলে
বাঁধিল আবার আপন দলে।
নব ভাবে "নববিধান" গড়ি,
নূতন সংহিতা রচনা করি,
ভগ্নদেহ লয়ে অবশপ্রায়,
খাটিতে খাটিতে ত্যজিল কায়।

৬

ধরি নব পথ নূতন ধারা
নবীন প্রেরণে আসিল যারা
আজি তাঁহাদের চরণ ধরি
ভক্তিভরে সবে স্মরণ করি।
শাস্ত্রী শিবনাথ সকল ফেলি
বিষয় বাসনা চরণে ঠেলি
বহু নির্যাতন বহিয়া শিরে,
অনুরাগে ভাসি নয়ন নীরে,
সর্বত্যাগী হয়ে ব্যাকুল প্রাণে
ছুটে আসে ওই কিসের টানে?
দেখ ওই চলে পাগলমত
ভক্তশ্রেষ্ঠ বীর বিনয়নত,
বিজয় গোঁসাই সরল প্রাণ—
হেরি আজি তাঁর প্রেম বয়ান।
সাধু রামতনু[১২] জ্ঞানে প্রবীণ,
শিশুর মতন চির নবীন।
শিবচন্দ্র দেব সুধীর মন,
কর্মনিষ্ঠাময় সাধু জীবন।
নগেন্দ্রনাথের[১৩] যুকতি বাণে
কূট তর্ক যত নিমেষে হানে।
আনন্দমোহন[১৪] প্রেমে উদার
আনন্দ মোহন মূরতি যার।
উমেশচন্দ্রের[১৫] জীবন মন,
নীরব সাধনে সদা মগন।
দুর্গামোহনের[১৬] জীবনগত
সমাজের সেবা দানের ব্রত।
দ্বারকানাথেরে[১৭] স্মরণ হয়
ন্যায়ধর্মে বীর অকুতোভয়।
পূর্ববঙ্গে হোথা সাধক কত
নবধর্মবাণী প্রচারে রত।
সংসারে নির্লিপ্ত ভাবুক প্রাণ
সার্থক প্রচারে কালীনারায়ণ[১৮]—
কত নাম কব, কত যে জ্ঞানী,
কত ভক্ত সাধু যোগী ও ধ্যানী;
কত মধুময় প্রেমিক মন,
আড়ম্বরহীন সেবকজন;
আসিল হেথায় আকাশ ভরে
সবার যতনে সমাজ গড়ে।
এই যে মন্দির, হেরিছ যার
ইঁটকাঠময় স্থূল আকার;
ইহারি মাঝারে কত যে স্মৃতি,
কত আকিঞ্চন সমাজপ্রীতি,
ব্যাকুল ভাবনা দিবসরাত
বিনিদ্র সাধনে জীবনপাত।
বহু কর্মময় এই সমাজ,
সে সব কাহিনী না কব আজ,—
আজিকে কেবল স্মরণে আনি
ব্রাহ্মসমাজের মহান্ বাণী।
যে বাণী শুনিনু রাজার মুখে,
মহর্ষি যাহারে ধরিল বুকে,
কেশব যে বাণী প্রচার করে—

স্মরি আজ তাহা ভকতি ভরে।
রক্তাক্ষরে লিখা যে-বাণী রটে
এই সমাজের জীবনপটে—
"স্বাধীন মানবহৃদয়তলে
বিবেকের শিখা নিয়ত জ্বলে।
গুরুর আদেশ সাধুর বাণী
ইহার উপরে কারে না মানি।"
স্বাধীন মনের এই সমাজ
মুক্ত ধর্মলাভ ইহার কাজ।
হেথায় সকল বিরোধ ঘুচি
রবে নানা মত নানান্ রুচি,
কাহারো রচিত বিধি বিধান
রুধিবে না হেথা কাহারো প্রাণ।
প্রতি জীবনের বিবেক ভাতি
সবার জীবনে জ্বলিবে বাতি।
নরনারী হেথা মিলিয়া সবে
সম অধিকারে আসন লভে।
'প্রেমেতে বিশাল, জ্ঞানে গভীর,
চরিত্রে সংযত, করমে বীর;
ঈশ্বরে ভকতি, মানবে প্রীতি,'—
হেথা মানুষের জীবন নীতি।

ফুরাল কি সব হেথায় আসি?
আসিবে না প্রেম জড়তা নাশি?
জাগিবে না প্রাণ ব্যাকুল হয়ে,
নব নব বাণী জীবনে লয়ে?
জ্বলিবে না নব সাধন শিখা?
নব ইতিহাস হবে না লিখা?
চিররুদ্ধ রবে পূজার দ্বার?
আসিবে না নব পূজারী আর?
কোথাও আশার আলো কি নাহি?
শুধাই সবার বদন চাহি।

---

[১] রামমোহন রায় [২] রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ [৩] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪] কেশবচন্দ্র সেন [৫] বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী [৬] প্রতাপচন্দ্র মজুমদার [৭] অঘোরনাথ গুপ্ত [৮] গৌরগোবিন্দ রায় [৯] কান্তিচন্দ্র মিত্র [১০] ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল [১১] বঙ্গচন্দ্র রায় [১২] রামতনু লাহিড়ী [১৩] নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [১৪] আনন্দমোহন বসু [১৫] উমেশচন্দ্র দত্ত [১৬] দুর্গামোহন দাস [১৭] দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় [১৮] কালীনারায়ণ গুপ্ত

অন্যান্য কবিতা

মেঘ

সাগর যেথা লুটিয়ে পড়ে নতুন মেঘের দেশে—
আকাশ-ধোয়া নীল যেখানে সাগর জলে মেশে।
মেঘের শিশু ঘুমায় সেথা আকাশ-দোলায় শুয়ে—
ভোরের রবি জাগায় তারে সোনার কাঠি ছুঁয়ে।
সন্ধ্যা সকাল মেঘের মেলা—কূলকিনারা ছাড়ি,
রং বেরঙের পাল তুলে দেয় দেশবিদেশে পাড়ি।
মাথায় জটা, মেঘের ঘটা আকাশ বেয়ে ওঠে,
জোছ্‌না রাতে চাঁদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটে।
কোন্ অকূলের সন্ধানেতে কোন্ পথে যায় ভেসে—
পথহারা কোন্ গ্রামের পরে নাম-জানা-নেই-দেশে।
ঘূর্ণীপথের ঘোরের নেশা দিক্‌বিদিকে লাগে,
আগল ভাঙা পাগল হাওয়া বাদল রাতে জাগে;
ঝড়ের মুখে স্বপন টুটে আঁধার আসে ঘিরে!
মেঘের প্রাণে চমক হানে আকাশ চিরে চিরে!
বুকের মাঝে শঙ্খ বাজে—দুন্দুভি দেয় সাড়া!
মেঘের মরণ ঘনিয়ে নামে মত্ত বাদল ধারা।

দিনের হিসাব

ভোর না হতে পাখিরা জোটে গানের চোটে ঘুমটি ছোটে—
চোখ্‌টি খোলো, গাত্র তোলো,— আরে মোলো সকাল হলো।
হায় কি দশা পড়্‌তে বসা, অঙ্ক কষা, কলম ঘষা,—
দশটা হলে হট্টগোলে দৌড়ে চলে বই বগলে!
স্কুলের পড়া বিষম তাড়া, কানটি নাড়া বেঞ্চে দাঁড়া,
মরে কি বাঁচে! সমুখে পাছে বেত্র নাচে নাকের কাছে॥
খেল্‌তে যে চায় খেল্‌বে কি ছাই বৈকেলে হায় সময় কি পায়?
খেলাটি ক্রমে যেম্নি জমে দখিনে বামে সন্ধ্যা নামে;
ভাঙ্‌ল মেলা সাধের খেলা— আবার ঠেলা সন্ধ্যাবেলা—
মুখ্‌টি হাঁড়ি তাড়াতাড়ি দিচ্ছে পাড়ি যে যার বাড়ি।
ঘুমের ঝোঁকে ঝাপ্‌সা চোখে ক্ষীণ আলোকে অঙ্ক টোকে;
ছুটি পাবার সুযোগ আবার আয় রবিবার হপ্তা কাবার!

নূতন বৎসর

'নূতন বছর! নূতন বছর!' সবাই হাঁকে সকাল সাঁঝে,
আজকে আমার সূর্যি মামার মুখটি জাগে মনের মাঝে।
মুস্কিলাসান্ করলে মামা, উস্কিয়ে তার আগুনখানি,
ইস্কুলেতে লাগ্‌ল তালা, থাম্‌ল সাধের পড়ার ঘানি।

এক্‌জামিনের বিষম ঠেলা চুক্‌ল রে ভাই, ঘুচ্‌ল জ্বালা,
নূতন সালের নূতন তালে হোক্ তবে আজ 'হকির' পালা।
কোন্‌খানে কোন্ মেজের কোণে, কলম কানে, চশমা নাকে,
বিরামহারা কোন্ বেচারা দেখেন কাগজ, ভয় কি তাঁকে?

অঙ্কে দিবেন হকির গোলা, শঙ্কা ত নাই তাহার তরে,
তঙ্কা হাজার মিলুক তাঁহার, ডঙ্কা মেরে চলুন ঘরে।
দিনেক যদি জোটেন খেলায় সাঁঝের বেলায় মাঠের মাঝে,
'গোল্লা' পেয়ে ঝোল্লা ভরে আবার না হয় যাবেন কাজে!

আয় তবে আয়, নবীন বরষ! মলয় বায়ের দোলায় দুলে,
আয় সঘনে গগন বেয়ে, পাগলা ঝড়ের পালটি তুলে।
আয় বাংলার বিপুল মাঠে শ্যামল ধানের ঢেউ খেলিয়ে,
আয়রে সুখের ছুটির দিনে আম-কাঁটালের খবর নিয়ে!

আয় দুলিয়ে তালের পাখা, আয় বিছিয়ে শীতল ছায়া,
পাখির নীড়ে চাঁদের হাটে আয় জাগিয়ে মায়ের মায়া।
তাতুক না মাঠ, ফাটুক না কাঠ, ছুটুক না ঘাম নদীর মত,
জয় হে তোমার, নূতন বছর! তোমার যে গুণ, গাইব কত?

পুরান বছর মলিন মুখে যায় সকলের বালাই নিয়ে,
ঘুচ্‌ল কি ভাই মনের কালি সেই বুড়োকে বিদায় দিয়ে?
নূতন সালে নূতন বলে, নূতন আশায়, নূতন সাজে,
আয় দয়ালের নাম লয়ে ভাই, যাই সকলে যে যার কাজে!

লোভী ছেলে

কি ভেবে যে আপন মনে
হাসি আসে ঠোঁটের কোণে,—

আধ আধ ঝাপ্‌সা বুলি
কোন কথা কয়না খুলি।

বসে বসে একলা নিজে
লোভী ছেলে ভাবেন কি যে—

শুধু শুধু চামচ চেটে
মনে মনে সাধ কি মেটে?

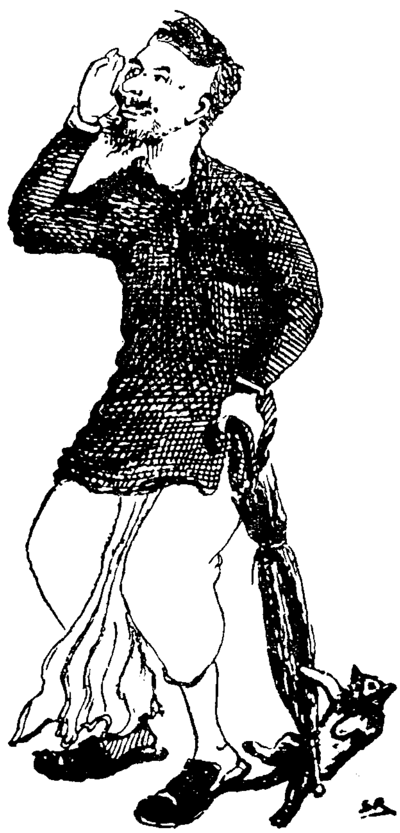
একটুখানি মিষ্টি দিয়ে
রাখ আমায় চুপ করিয়ে,

নৈলে পরে চেঁচিয়ে জোরে
তুলব বাড়ি মাথায় ক'রে।

আবোলতাবোল

এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি)!
তার যে ছিল ময়ূর—(না না,
ময়ূর কিসের? ছাগল ছানা)।
উঠানে তার থাক্‌ত পোঁতা—
—(বাড়িই নেই, তার উঠান কোথা)?
শুনেছি তার পিশ্‌তুতো ভাই—
—(ভাই নয়ত, মামা-গোঁসাই)।
বল্‌ত সে তার শিষ্যটিরে—
—(জন্ম-বোবা, বল্‌বে কিরে)।
যা হোক, তারা তিনটি প্রাণী—
—(পাঁচটি তারা, সবাই জানি)!
থও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি
—(আচ্ছা বল, চুপ করেছি)॥
তারপরে সেই সন্ধ্যাবেলা,
যেম্নি না তার ওষুধ গেলা,
অম্‌নি তেড়ে জটায় ধরা—
—(কোথায় জটা? টাক যে ভরা!)
হোক্ না টেকো তোর তাতে কি?
গোম্‌রামুখো মুখ্যু ঢেঁকি!
ধরব ঠেসে টুঁটির পরে
পিট্‌ব তোমার মুণ্ডু ধরে।
এখন বাছা পালাও কোথা?
গল্প বলা সহজ কথা?

কানে খাটো বংশীধর



কানে খাটো বংশীধর যায় মামাবাড়ি,
গুনগুনে গান গায় আর নাড়ে দাড়ি॥
চলেছে সে একমনে ভাবে ভরপুর,
সহসা বাজিল কানে সুমধুর সুর॥
বংশীধর বলে, ''আহা, না জানি কি পাখি
সুদূরে মধুর গায় আড়ালেতে থাকি॥
দেখ, দেখ সুরে তার কত বাহাদুরি,
কালোয়াতি গলা যেন খেলে কারিকুরি॥''
এদিকে বেড়াল ভাবে, ''এযে বড় দায়,
প্রাণ যদি থাকে তবে ল্যাজখানি যায়॥
গলা ছেড়ে চেঁচামেচি এত করি হায়,
তবু যে ছাড়ে না বেটা, কি করি উপায়॥
আর তো চলে না সহ্য এত বাড়াবাড়ি,
যা থাকে কপালে দেই এক থাবা মারি॥''
বংশীধর ভাবে, ''একি! বেসুরা যে করে,
গলা গেছে ভেঙে তাই 'ফ্যাঁস্' সুর ধরে॥''
হেনকালে বেরসিক বেড়ালের চাঁটি,
একেবারে সব গান করে দিল মাটি।

অন্ধ মেয়ে

গভীর কালো মেঘের পরে রঙিন্ ধনু বাঁকা,
রঙের তুলি বুলিয়ে মেঘে খিলান যেন আঁকা!
সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি
রঙিন্ বেশে রঙিন্ ফুলে রঙিন্ প্রজাপতি!

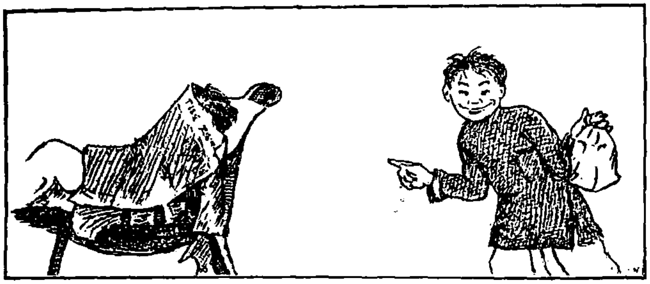
অন্ধ মেয়ে দেখ্‌ছে না তা—নাইবা যদি দেখে—
শীতল মিঠা বাদল হাওয়া যায় যে তারে ডেকে!
শুনছে সে যে পাখির ডাকে হরষ কোলাকুলি
মিষ্টি ঘাসের গন্ধে তারও প্রাণ গিয়েছে ভুলি!

দুঃখ সুখের ছন্দে ভরা জগৎ তারও আছে,
তারও আঁধার জগৎখানি মধুর তারি কাছে॥

সাহস!

পুলিশ দেখে ডরাইনে আর, পালাইনে আর ভয়ে,
আরশুলা কি ফড়িং এলে থাক্‌তে পারি সয়ে।
আঁধার ঘরে ঢুক্‌তে পারি এই সাহসের গুণে,
আর করে না বুক দুর্ দুর্ জুজুর নামটি শুনে।
রাত্তিরেতে একলা শুয়ে তাও ত থাকি কত,
মেঘ ডাকলে চেঁচাইনেকো আহাম্মুকের মত।
মামার বাড়ির কুকুর দুটোর বাঘের মত চোখ,
তাদের আমি খাবার খাওয়াই এম্‌নি আমার রোখ্!
এম্‌নি আরো নানান্ দিকে সাহস আমার খেলে
সবাই বলে "খুব বাহাদুর" কিংবা "সাবাস্ ছেলে"।
কিন্তু তবু শীতকালেতে সকালবেলায় হেন
ঠাণ্ডা জলে নাইতে হ'লে কান্না আসে কেন?
সাহস টাহস সব যে তখন কোন্‌খানে যায় উড়ে—
ষাঁড়ের মতন কণ্ঠ ছেড়ে চেঁচাই বিকট সুরে!

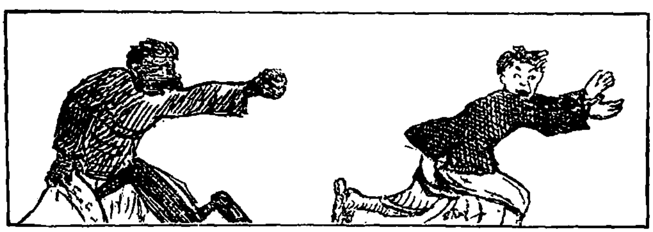
ও বাবা!



পড়তে বসে মুখের পরে কাগজখানি থুয়ে
রমেশ ভায়া ঘুমোয় পড়ে আরাম ক'রে শুয়ে।
শুনছ নাকি ঘড়র্ ঘড়র্ নাক ডাকান ধুম?
সখ যে বড় বেজায় দেখি—দিনের বেলায় ঘুম!



বাতাস পোরা এই যে থলি দেখ্‌ছ আমার হাতে,
দুড়ুম ক'রে পিট্‌লে পরে শব্দ হবে তাতে।
রমেশ ভায়া আঁৎকে উঠে পড়্‌বে কুপোকাৎ
লাগাও তবে—ধুমধড়াক্কা! ক্যাবাৎ! ক্যাবাৎ!



ও বাবারে! এ কেরে ভাই? মারবে নাকি চাঁটি?
আমি ভাবছি রমেশ বুঝি! সব করেছে মাটি!
আবার দেখ চোখ পাকিয়ে আস্‌ছে আমায় তেড়ে—
আর কেন ভাই? দৌড়ে পালাই, প্রাণের আশা ছেড়ে!

আজব খেলা

সোনার মেঘে আল্‌তা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়
সকাল সাঁঝে সূর্যি মামা নিত্যি আসে যায়।

নিত্যি খেলে রঙের খেলা আকাশ ভ'রে ভ'রে
আপন ছবি আপনি মুছে আঁকে নূতন ক'রে।

ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো জেলে
সাঁঝের আঁকা রঙিন ছবি রাতের কালি ঢেলে।

আবার আঁকে আবার মোছে দিনের পরে দিন
আপন সাথে আপন খেলা চলে বিরামহীন।

ফুরায় না কি সোনার খেলা? রঙের নাহি পার?
কেউ কি জানে কাহার সাথে এমন খেলা তার?

সেই খেলা, যে ধরার বুকে আলোর গানে গানে
উঠ্‌ছে জেগে—সেই কথা কি সূর্যি মামা জানে?

ছুটি

ঘুচবে জ্বালা পুঁথির পালা ভাবছি সারাক্ষণ—
পোড়া স্কুলের পড়ার পরে আর কি বসে মন?
দশটা থেকেই নষ্ট খেলা, ঘণ্টা হতেই শুরু
প্রাণটা করে 'পালাই পালাই' মনটা উড়ু উড়ু—
পড়ার কথা খাতায় পাতায়, মাথায় নাহি ঢোকে!
মন চলে না—মুখ চলে যায় আবোলতাবোল ব'কে!
কানটা ঘোরে কোন্ মুলুকে হুঁশ থাকে না তার,
এ কান দিয়ে ঢুকলে কথা, ও কান দিয়ে পার।
চোখ থাকে না আর কিছুতেই, কেবল দেখে ঘড়ি;
বোর্ডে আঁকা অঙ্ক ঠেকে আঁচড়কাটা খড়ি।
কল্পনাটা স্বপ্নে চ'ড়ে ছুটছে মাঠে ঘাটে—
আর কি রে মন বাঁধন মানে? ফিরতে কি চায় পাঠে?
পড়ার চাপে ছট্‌ফটিয়ে আর কিরে দিন চলে?
ঝুপ ক'রে মন ঝাঁপ দিয়ে পড়্ ছুটির বন্যাজলে।

বেজায় খুসি

বাহবা বাবুলাল! গেলে যে হেসে!
বগলে কাতুকুতু কে দিল এসে?
এদিকে মিটিমিটি দেখ কি চেয়ে?
হাসি যে ফেটে পড়ে দু'গাল বেয়ে!
হাসে যে রাঙা ঠোঁট দন্ত মেলে
চোখের কোণে কোণে বিজলী খেলে।
হাসির রসে গ'লে ঝরে যে লালা
কেন এ খি-খি-খি-খি হাসির পালা?
যে দেখে সেই হাসে হাহাহা হাহা
বাহবা বাবুলাল বাহবা বাহা!

লক্ষ্মী

হাত-পা-ভাঙা নোংরা পুতুল মুখটি ধুলোয় মাখা,
গাল দুটি তার খাবলা-মতন চোখ দুটি তার ফাঁকা,—

কোথায় বা তার চুল বিনুনি কোথায় বা তার মাথা,
আধখানি তার ছিন্ন জামা, গায় দিয়েছে কাঁথা।

পুতুলের মা ব্যস্ত কেবল তার সেবাতেই রত
খাওয়ান শোয়ান আদর করেন ঘুম ডেকে দেন কত।

বলতে গেলাম "বিশ্রী পুতুল" অম্‌নি বলেন রেগে—
"লক্ষ্মী পুতুল, জ্বর হয়েছে তাইত এখন জেগে।"

দ্বিগুণ জোরে চাপড়ে দিল 'আয় আয় আয়' ব'লে—
নোংরা পুতুল লক্ষ্মী হ'য়ে পড়ল ঘুমে ঢুলে!

আয়রে আলো আয়

পূব গগনে রাত পোহাল,
ভোরের কোণে লাজুক আলো   নয়ন মেলে চায়।
আকাশতলে ঝলক জ্বলে,
মেঘের শিশু খেলার ছলে   আলোক মাখে গায়॥
সোনার আলো, রঙিন্ আলো,
স্বপ্নে আঁকা নবীন আলো—   আয়রে আলো আয়।
আয়রে নেমে আঁধার পরে,
পাষাণ কালো ধৌত ক'রে   আলোর ঝরণায়॥
ঘুম ভাঙান পাখির তানে
জাগ্‌রে আলো আকুল গানে   অকূল নীলিমায়।
আলসভরা আঁখির কোণে,
দুঃখ ভয়ে আঁধার মনে,   আয়রে আলো আয়॥

মনের মতন

কান্না হাসির পোঁটলা বেঁধে, বর্ষভরা পুঁজি,
বৃদ্ধ বছর উধাও হ'ল ভুতের মুলুক খুঁজি।

নূতন বছর এগিয়ে এসে হাত পাতে ঐ দ্বারে,
বল্ দেখি মন, মনের মতন কি দিবি তুই তারে?

আর কি দিব?—মুখের হাসি, ভরসাভরা প্রাণ,
সুখের মাঝে দুখের মাঝে আনন্দময় গান।

আলোছায়া

হোক্‌না কেন যতই কালো
        এমন ছায়া নাইরে নাই—
লাগ্‌লে পরে রোদের আলো
        পালায় না যে আপ্‌নি ভাই!

শুষ্কমুখে আঁধার ধোঁয়া
        কঠিন হেন কোথায় বল্‌,
লাগ্‌লে যাতে হাসির ছোঁয়া
        আপ্‌নি গলে হয় না জল॥

মেঘের খেয়াল

আকাশের ময়দানে বাতাসের ভরে,
ছোট বড় সাদা কালো কত মেঘ চরে।
কচি কচি থোপা থোপ্পা মেঘেদের ছানা
হেসে খেলে ভেসে যায় মেলে কচি ডানা।
কোথা হতে কোথা যায় কোন্‌ তালে চলে,
বাতাসের কানে কানে কত কথা বলে।

বুড়ো বুড়ো ধাড়ি মেঘ ঢিপি হয়ে উঠে—
শুয়ে ব'সে সভা করে সারাদিন জুটে।
কি যে ভাবে চুপ্‌চাপ্‌, কোন্‌ ধ্যানে থাকে,
আকাশের গায়ে গায়ে কত ছবি আঁকে।
কত আঁকে কত মোছে, কত মায়া করে,
পলে পলে কত রং কত রূপ ধরে।

জটাধারী বুনো মেঘ ফোঁস ফোঁস ফোলে,
গুরুগুরু ডাক ছেড়ে কত ঝড় তোলে।
ঝিলিকের ঝিকিমিকি চোখ করে কানা,
হুড়্‌ হুড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ দশদিকে হানা।
ঝুল্‌-কালো চারিধার, আলো যায় ঘুচে,
আকাশের যত নীল সব দেয় মুছে।

কত বড়

ছোট্ট সে একরতি ইঁদুরের ছানা,
ফোটে নাই চোখ তার, একেবারে কানা।
ভাঙা এক দেরাজের ঝুল্‌মাখা কোণে
মার বুকে শুয়ে শুয়ে মার কথা শোনে।

যেই তার চোখ ফোটে সেই দেখে চেয়ে—
দেরাজের ভারি কাঠ চারিদিক ছেয়ে।
চেয়ে বলে, মেলি তার গোল গোল আঁখি—
"ওরে বাবা! পৃথিবীটা এত বড় নাকি?"

আদুরে পুতুল

যাদুরে আমার আদুরে গোপাল, নাকটি নাদুস থোপ্‌না গাল,
ঝিক্‌মিকি চোখ মিট্‌মিটি চায়, ঠোঁট দুটি তায় টাট্‌কা লাল।
মোমের পুতুল ঘুমিয়ে থাকুক্ দাঁত মেলে আর চুল খুলে—
টিনের পুতুল চীনের পুতুল কেউ কি এমন তুলতুলে?
গোব্‌দা গড়ন এম্‌নি ধরন আব্‌দারে কেউ ঠোঁট ফুলোয়?
মখমলি রং মিষ্টি নরম—দেখ্‌ছ কেমন হাত বুলোয়!
বল্‌বি কি বল্ হাব্‌লা পাগল আবোল তাবোল কান ঘেঁষে
ফোক্‌লা গদাই যা বল্‌বি তাই ছাপিয়ে পাঠাই "সন্দেশে"।

ভারি মজা

এই নেয়েছ, ভাত খেয়েছ, ঘণ্টাখানেক হবে—
আবার কেন হঠাৎ হেন নামলে এখন টবে?
এক্‌লা ঘরে ফুর্তি ভরে লুকিয়ে দুপুরবেলা,
স্নানের ছলে ঠাণ্ডা জলে জল-ছপ্‌ছপ্‌ খেলা।
জল ছিটিয়ে, টব পিটিয়ে, ভাবছ, ''আমোদ ভারি,—
কেউ কাছে নাই, যা খুশি তাই করতে এখন পারি।''
চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌—ঐ দুপ্‌ দুপ্‌! ঐ জেগেছে মাসি,
আসছে ধেয়ে, শুনতে পেয়ে দুষ্টু মেয়ের হাসি।

নাচন

নাচ্ছি মোরা মনের সাধে গাচ্ছি তেড়ে গান
হুলো মেনী যে যার গলার কালোয়াতীর তান।
নাচ্ছি দেখে চাঁদা মামা হাস্‌ছে ভরে গাল
চোখটি ঠেরে ঠাট্টা করে দেখ্‌না বুড়োর চাল।

বিচার

ইঁদুর দেখে মাম্‌দো কুকুর বল্‌লে তেড়ে হেঁকে—
"বল্‌ব কি আর, বড়ই খুশি হলেম তোরে দেখে।
আজকে আমার কাজ কিছু নেই, সময় আছে মেলা,
আয় না খেলি দুইজনাতে মোকদ্দমা খেলা।
তুই হবি চোর, তোর নামেতে করব নালিশ রুজু"—
"জজ্‌ কে হবে?" বল্‌লে ইঁদুর, বিষম ভয়ে জুজু,
"কোথায় উকিল প্যায়দা পুলিশ, বিচার কিসে হবে?"
মাম্‌দো বলে, "তাও জানিস্‌নে? শোন্‌ বলে দেই তবে।
আমিই হব উকিল হাকিম, আমিই হব জুরি,
কান ধ'রে তোর বল্‌ব, 'ব্যাটা, ফের করেছিস্‌ চুরি?'
সটান দেব ফাঁসির হুকুম অম্‌নি একেবারে—
বুঝ্‌বি তখন চোর বাছাধন বিচার বলে কারে।"

ছিটেফোঁটা

তিন বুড়ো পণ্ডিত টাকচুড়ো নগরে
চ'ড়ে এক গামলায় পাড়ি দেয় সাগরে।
গামলাতে ছেঁদা ছিল আগে কেউ দেখেনি,
গানখানি তাই মোর থেমে গেল এখনি॥

*

"ম্যাও ম্যাও হুলোদাদা, তোমার যে দেখা নাই?"
"গেছিলাম রাজপুরী রানীমার সাথে ভাই!"
"তাই নাকি? বেশ বেশ, কি দেখেছ সেখানে?"
"দেখেছি ইঁদুর এক রানীমার উঠানে॥"

*

গাধাটার বুদ্ধি দেখ!—চাঁটি মেরে সে নিজের গালে,
কে মেরেছে দেখবে ব'লে চড়্তে গেছে ঘরের চালে।

*

ছোট ছোট ছেলেগুলো কিসে হয় তৈরি,
—কিসে হয় তৈরি?
কাদা আর কয়লা, ধুলো মাটি ময়লা,
এই দিয়ে ছেলেগুলো তৈরি।
ছোট ছোট মেয়েগুলি কিসে হয় তৈরি,
—কিসে হয় তৈরি?
ক্ষীর ননী চিনি আর ভাল যাহা দুনিয়ার
মেয়েগুলি তাই দিয়ে তৈরি॥

*

রং হল চিঁড়েতন, সব গেল ঘুলিয়ে,
গাধা যায় মামাবাড়ি টাকে হাত বুলিয়ে।
বেড়াল মরে বিষম খেয়ে, চাঁদের ধর্‌ল মাথা,
হঠাৎ দেখি ঘর বাড়ি সব ময়দা দিয়ে গাঁথা॥

ইংরেজি ছড়ার আভাসে রচিত

বন্দনা

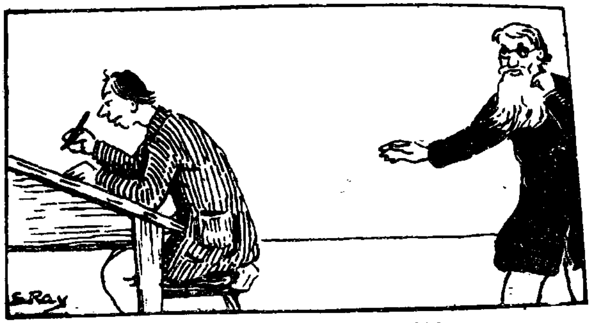
নমি সত্য সনাতন নিত্য ধনে,
নমি ভক্তিভরে নমি কায়মনে।
নমি বিশ্বচরাচর লোকপতে
নমি সর্বজনাশ্রয় সর্বগতে।
নমি সৃষ্টি-বিধারণ শক্তিধরে,
নমি প্রাণপ্রবাহিত জীব জড়ে।
তব জ্যোতিবিভাসিত বিশ্বপটে
মহাশূন্যতলে তব নাম রটে।
কত সিন্ধুতরঙ্গিত ছন্দ ভরে
কত স্তব্ধ হিমাচল ধ্যান করে।
কত সৌরভ সঞ্চিত পুষ্পদলে
কত সূর্য বিলুণ্ঠিত পাদতলে।
কত বন্দনঝঙ্কৃত ভক্তচিতে
নমি বিশ্ব বরাভয় মৃত্যুজিতে।

খোকা ঘুমায়

কোন্‌খানে কোন্ সুদূর দেশে, কোন্ মায়ের বুকে,
কাদের খোকা মিষ্টি এমন ঘুমায় মনের সুখে?
অজানা কোন্ দেশে সেথা কোন্‌খানে তার ঘর?
কোন্ সমুদ্র, কত নদী, কত দেশের পর?
কেমন সুরে, কি ব'লে মা ঘুমপাড়ানি গানে
খোকার চোখে নিত্যি সেথা ঘুমটি ডেকে আনে?
ঘুমপাড়ানি মাসীপিসী তাদেরও কি থাকে?
"ঘুম্‌টি দিয়ে যাওগো" ব'লে মা কি তাদের ডাকে?
শেয়াল আসে বেগুন খেতে, বর্গি আসে দেশে?
ঘুমের সাথে মিষ্টি মধুর মায়ের সুরটি মেশে?
খোকা জানে মায়ের মুখটি সবার চেয়ে ভালো,
সবার মিষ্টি মায়ের হাসি, মায়ের চোখের আলো।
স্বপন মাঝে ছায়ার মত মায়ের মুখটি ভাসে,
তাইতে খোকা ঘুমের ঘোরে আপন মনে হাসে।

খোকার ভাবনা

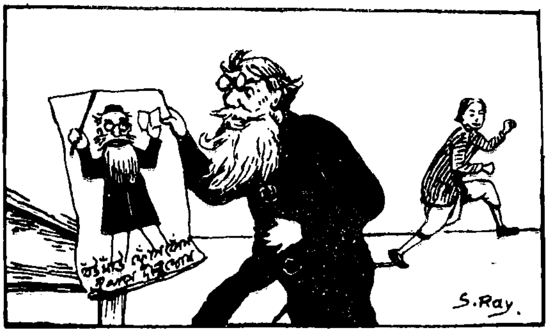
মোমের পুতুল লোমের পুতুল আগ্‌লে ধ'রে হাতে
তবুও কেন হাব্‌লা ছেলের মন ওঠে না তাতে?
একলা জেগে একমনেতে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে,
আন্‌মনা সে কিসের তরে আঙুলখানি চোষে?
নাইকো হাসি নাইকো খেলা নাইকো মুখে কথা,
আজ সকালে হাব্‌লাবাবুর মন গিয়েছে কোথা?
ভাব্‌ছে বুঝি দুধের বোতল আস্‌ছে নাকো কেন?
কিংবা ভাবে মায়ের কিসে হচ্ছে দেরী হেন।
ভাব্‌ছে এবার দুধ খাবে না কেবল খাবে মুড়ি,
দাদার সাথে কোমর বেঁধে করবে হুড়োহুড়ি,
ফেল্‌বে ছুঁড়ে চামচটাকে পাশের বাড়ির চালে,
না হয় তেড়ে কামড়ে দেবে দুষ্টু দাদুর গালে।
কিংবা ভাবে একটা কিছু ঠুক্‌তে যদি পেতো—
পুতুলটাকে করত ঠুকে এক্কেবারে থেঁতো।



এমনি পড়ায় মন বসেছে, পড়ার নেশায় টিফিন ভোলে।
সাম্‌নে গিয়ে উৎসাহ দেই মিষ্টি দুটো বাক্য বলে।



পড়্‌ছ বুঝি? বেশ বেশ বেশ! এক মনেতে পড়্‌লে পরে
লক্ষ্মীছেলে—সোনার ছেলে" বলে সবাই আদর করে।



এ আবার কি? চিত্র নাকি? বাঁদর পাজি লক্ষ্মীছাড়া—
আমায় নিয়ে রংতামাসা! পিটিয়ে তোমায় কর্‌ছি খাড়া।

'ভাল ছেলের' নালিশ

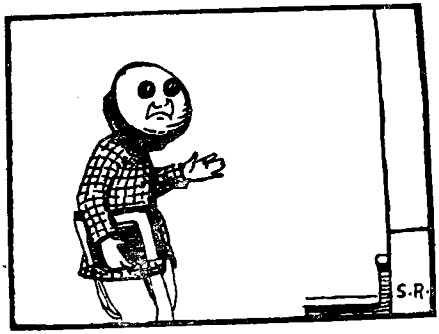
মাগো! প্রসন্নটা দুষ্টু এমন! খাচ্ছিল সে পরোটা
গুড় মাখিয়ে, আরাম ক'রে ব'সে—
আমায় দেখে একটা দিল, নয়কো তাও বড়টা,
দুইখানা সে আপনি খেল ক'ষে!
তাইতে আমি কান ধ'রে তার একটুখানি পেঁচিয়ে
কিল মেরেছি 'হ্যাংলা ছেলে' বলে—
অম্‌নি কিনা মিথ্যে করে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে
গেল সে তার মায়ের কাছে চলে!
মাগো! এম্‌নিধারা শয়তানি তার, খেল্‌তে গেলাম দুপুরে,
বল্‌ল, 'এখন খেল্‌তে আমার মানা'—
ঘণ্টাখানেক পরেই দেখি দিব্যি ছাতের উপরে
ওড়াচ্ছে তার সবুজ ঘুড়িখানা।
তাইতে আমি দৌড়ে গিয়ে ঢিল মেরে আর খুঁচিয়ে
ঘুড়ির পেটে দিলাম ক'রে ফুটো—
আবার দেখ বুক ফুলিয়ে সটান্‌ মাথা উঁচিয়ে
আন্‌ছে কিনে নতুন ঘুড়ি দুটো!

ছবি ও গল্প

ছবির টানে গল্প লিখি নেইক এতে ফাঁকি
যেমন ধারা কথায় শুনি হুবহু তাই আঁকি।



পরীক্ষায় গোল্লা পেয়ে হাবু ফেরেন বাড়ি



চক্ষু দুটি ছানাবড়া মুখখানি তার হাঁড়ি



রাগে আগুন হলেন বাবা সকল কথা শুনে



আচ্ছা ক'রে পিটিয়ে তারে দিলেন তুলো ধুনে



মারের চোটে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় ক'রে তোলে



শুনে মায়ের বুক ফেটে যায় 'হায় কি হল' ব'লে



পিসী ভাসেন চোখের জলে কুট্‌নো কোটা ফেলে



আহ্লাদেতে পাশের বাড়ি আটখানা হয় ছেলে।

বেজায় রাগ

ও হাড়্‌গিলে, হাড়্‌গিলে ভাই, খাপ্পা বড্ড আজ!
ঝগড়া কি আর সাজে তোমার? এই কি তোমার যোগ্য কাজ?
হোম্‌রা চোম্‌রা মান্য তোমরা বিদ্যেবুদ্ধি মর্যাদায়
ওদের সঙ্গে তর্ক করছ—নাই কি কোন লজ্জা তায়?
জান্‌ছ নাকি বল্‌ছে ওরা? "কিচির মিচির কিচ্চিরি,"
অর্থাৎ কিনা, তোমার নাকি চেহারাটা বিচ্ছিরি!
বল্‌ছে, আচ্ছা বলুক, তাতে ওদেরই ত মুখ ব্যথা,
ঠ্যাঁটা লোকের শাস্তি যত, ওরাই শেষে ভুগ্‌বে তা।
ওরা তোমায় খোঁড়া বলছে? বেয়াদব ত খুব দেখি!
তোমার পায়ে বাতের কষ্ট—ওরা সেসব বুঝবে কি?
তাই বলে কি নাচ্‌বে রাগে? উঠ্‌বে চ'টে চট্‌ ক'রে?
মিথ্যে আরো ত্যক্ত হবে ওদের সাথে টক্করে।
ঐ শোন কি বলছে আবার ক'চ্ছে কত বক্তৃতা—
বল্‌ছে তোমার নেড়া মাথায় ঘোল ঢালাবে—সত্যি তা?
চড়াই পাখির বড়াই দেখ তোমায় দিচ্ছে টিট্‌কিরি—
বল্‌ছে, তোমার মিষ্টি গলায় গান ধরত গিট্‌কিরি।
বল্‌ছে, তোমার কাঁথাটাকে 'রিফুকর্ম' করবে কি?
খোঁড়া ঠ্যাঙে নামবে জলে? আর কোলা ব্যাং ধরবে কি?
আর চ'টো না, আর শুনো না, ঠ্যাঁটা মুখের টিপ্পনি,
ওদের কথায় কান দিতে নেই স'রে পড় এক্ষনি।



বাবু

অতি খাসা মিহি সুতি
ফিন্‌ফিনে জামা ধুতি,
চরণে লপেটা জুতি জরিদার।

এ হাতে সোনার ঘড়ি,
ও হাতে বাঁকান ছড়ি,
আতরের ছড়াছড়ি চারিধার।

চক্‌চকে চুল ছাঁটা
তায় তোফা টেরিকাটা—
সোনার চশমা আঁটা নাসিকায়।

ঠোঁট দুটি এঁকে বেঁকে
ধোঁয়া ছাড়ে থেকে থেকে,
হালচাল দেখে দেখে হাসি পায়।

ঘোষেদের ছোট মেয়ে
পিক্ ফেলে পান খেয়ে,
নিচু পানে নাহি চেয়ে, হায়রে।

সেই পিক থ্যাপ ক'রে
লেগেছে চাদর ভরে
দেখে বাব্‌ু কেঁদে মরে যায়রে।

ওদিকে ছ্যাকরাগাড়ি
ছ্‌ুটে চলে তাড়াতাড়ি
ছিট্‌কিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ঘোলাজল।

সহসা সে জল লাগে
জামার পিছন বাগে,
বাব্‌ু করে মহারাগে কোলাহল॥



শিশুর দেহ

চশমা-আঁটা পণ্ডিতে কয়, শিশুর দেহ দেখে—
"হাড়ের পরে মাংস গেঁথে, চামড়া দিয়ে ঢেকে,
শিরার মাঝে রক্ত দিয়ে, ফুসফুসেতে বায়ু,
বাঁধল দেহ সুঠাম করে পেশী এবং স্নায়ু।"
কবি বলেন, "শিশুর মুখে হেরি তরুণ রবি,
উৎসারিত আনন্দে তার জাগে জগৎ ছবি।
হাসিতে তার চাঁদের আলো, পাখির কলকল,
অশ্রুকণা ফুলের দলে শিশির ঢলঢল।"
মা বলেন, "এই দুরুদুরু মোর বুকেরই বাণী,
তারি গভীর ছন্দে গড়া শিশুর দেহখানি।
শিশুর প্রাণে চঞ্চলতা আমার অশ্রুহাসি,
আমার মাঝে লুকিয়েছিল এই আনন্দরাশি।
গোপনে কোন্ স্বপ্নে ছিল অজানা কোন্ আশা,
শিশুর দেহে মূর্তি নিল আমার ভালবাসা।"

বিষম কাণ্ড

কর্তা চলেন, গিন্নী চলেন, খোকাও চলেন সাথে,
তড়্‌বড়িয়ে বুক ফুলিয়ে শুতে যাচ্ছেন রাতে।
তেড়ে হন্‌হন্ চলে তিনজন যেন পল্টন চলে,
সিঁড়ি উঠ্‌তেই, একি কাণ্ড! এ আবার কি বলে!
ল্যাজ লম্বা, কান গোল্ গোল্, তিড়িং বিড়িং ছোটে,
চোখ্ মিট্‌মিট্, কুট্‌স্ কাট্‌স্—এটি কোন্‌জন বটে!
হেই! হুস্! হ্যাস্! ওরে বাস্‌রে মতলবখান কিরে,
করলে তাড়া যায় না তবু, দেখ্‌ছে আবার ফিরে।
ভাবছে বুড়ো, করবো গুঁড়ো ছাতার বাড়ি মেরে,
আবার ভাবে ফস্‌কে গেলে কাম্‌ড়ে দেবে তেড়ে।
আরে বাপ্‌রে! বস্‌ল দেখ দুই পায়ে ভর ক'রে,
বুক দুর্ দুর্ বুড়ো ভল্লুর, মোমবাতি যায় প'ড়ে।
ভীষণ ভয়ে দাঁত কপাটি তিন মহাবীর কাঁপে,
গড়িয়ে নামে হুড়্‌মুড়িয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে।

আনন্দ

যে আনন্দ ফুলের বাসে, যে আনন্দ পাখির গানে,
যে আনন্দ অরুণ আলোয়, যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
যে আনন্দে বাতাস বহে, যে আনন্দ সাগরজলে,
যে আনন্দ ধূলির কণায়, যে আনন্দ তৃণের দলে,
যে আনন্দে আকাশ ভরা, যে আনন্দ তারায় তারায়,
যে আনন্দ সকল সুখে, যে আনন্দ রক্তধারায়,
সে আনন্দ মধুর হয়ে তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
সে আনন্দ আলোর মত থাকুক তব জীবন ভরি।

গ্রীষ্ম

সর্বনেশে গ্রীষ্ম এসে বর্ষশেষে রুদ্রবেশে
আপন ঝোঁকে বিষম রোখে আগুন ফোঁকে ধরার চোখে।
তাপিয়ে গগন কাঁপিয়ে ভুবন মাতল তপন নাচল পবন।
রৌদ্র ঝলে আকাশতলে অগ্নি জ্বলে জলেস্থলে।
ফেলছে আকাশ তপ্ত নিশাস ছুটছে বাতাস ঝলসিয়ে ঘাস,
ফুলের বিতান শুকনো শ্মশান যায় বুঝি প্রাণ হায় ভগবান।
দারুণ তৃষায় ফিরছে সবায় জল নাহি পায় হায় কি উপায়,
তাপের চোটে কথা না ফোটে হাঁপিয়ে ওঠে ঘর্ম ছোটে।
বৈশাখী ঝড় বাধায় রগড় করে ধড়্ফড়্ ধরার পাঁজর,
দশ দিক হয় ঘোর ধূলিময় জাগে মহাভয় হেরি সে প্রলয়,
করি তোলপাড় বাগান বাদাড় ওঠে বারবার ঘন হুঙ্কার,
শুনি নিয়তই থাকি থাকি ওই হাঁকে হৈ হৈ মাভৈ মাভৈঃ।

কিছু চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
এই যে খোকা, কি নেবে ভাই
জলছবি আর লাট্টু লাটাই
কেক বিস্কুট লাল দেশলাই
খেলনা বাঁশি কিংবা ঘুড়ি
লেড্ পেনসিল রবার ছুরি?
এসব আমার বাক্সে নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
বৌমা কি চাও শুনতে পাই?
ছিটের কাপড় চিকন লেস্
ফ্যান্সি জিনিস ছুঁচের কেস্
আল্‌তা সিঁদুর কুন্তলীন
কাঁচের চুড়ি বোতাম পিন্?
আমার কাছে ওসব নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
আপনি কি চান কর্তামশাই?
পকেট বই কি খেলার তাস
চুলের কলপ জুতোর ব্রাশ্
কলম কালি গঁদের তুলি
নস্যি চুরুট সুর্তি গুলি?
ওসব আমার কিছুই নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

বিষম ভোজ

"অবাক কাণ্ড!" বল্‌লে পিসী, "এক চাঙাড়ি মেঠাই এল—
এই ছিল সব খাটের তলায়, এক নিমিষে কোথায় গেল?"
"সত্যি বটে" বল্‌লে খুড়ী, "আনল দু'সের মিঠাই কিনে—
হঠাৎ কোথায় উপ্‌সে গেল? ভেল্কিবাজি দুপুর দিনে?"
"দাঁড়াও দেখি" বল্‌লে দাদা, "কর্‌ছি আমি এর কিনারা
কোথায় গেল পট্‌লা ট্যাঁপা—পাচ্ছিনে যে তাদের সাড়া?"
পর্দাঘেরা আড়াল দেওয়া বারান্দাটার ঐ কোণেতে
চল্‌ছে কি সব ফিস্‌ ফিস্‌ ফিস্‌ শুনল দাদা কানটি পেতে।
পট্‌লা ট্যাঁপা ব্যস্ত দুজন টপ্‌টপাটপ্‌ মিঠাই ভোজে,
হঠাৎ দেখে কার দুটো হাত এগিয়ে তাদের কানটি খোঁজে।
কানের উপর প্যাঁচ্‌ ঘোরাতেই দুচোখ বেয়ে অশ্রু ছোটে,
গিল্‌বে কি ছাই মুখের মিঠাই, কান বুঝি যায় টানের চোটে।
পটলবাবুর হোম্‌রা গলা মিল্‌ল ট্যাঁপার চিকন সুরে
জাগল্‌ করুণ রাগরাগিণী বিকট তানে আকাশ জুড়ে।

সন্দেশ

সন্দেশের গন্ধে বুঝি দৌড়ে এলে মাছি?
কেন ভন্‌ভন্‌ হাড় জ্বালাতন ছেড়ে দেওনা বাঁচি!
নাকের গোড়ায় সুড়্‌সুড়ি দাও শেষটা দিবে ফাঁকি?
সুযোগ বুঝে সুড়ুৎ ক'রে হুল ফোটাবে নাকি?

ছুটি

ছুটি! ছুটি! ছুটি!
মনের খুশি রয়না মনে হেসেই লুটোপুটি।
ঘুচল এবার পড়ার তাড়া অঙ্ক কাটাকুটি
দেখ্‌ব না আর পণ্ডিতের ঐ রক্ত আঁখি দুটি।
আর যাব না স্কুলের পানে নিত্য গুটি গুটি
এখন থেকে কেবল খেলা কেবল ছুটোছুটি।
পাড়ার লোকের ঘুম ছুটিয়ে আয়রে সবাই জুটি
গ্রীষ্মকালের দুপুর রোদে গাছের ডালে উঠি।
আয়রে সবাই হল্লা ক'রে হরেক মজা লুটি
একদিন নয় দুইদিন নয় দুই দুই মাস ছুটি।

বড়াই

গাছের গোড়ায় গর্ত ক'রে ব্যাং বেঁধেছেন বাসা,
মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গান ধরেছেন খাসা।
রাজার হাতি হাওদা-পিঠে হেলে দুলে আসে—
"বাপ্‌রে" ব'লে ব্যাং বাবাজি গর্তে ঢোকেন ত্রাসে!
রাজার হাতি মেজাজ ভারি হাজার রকম চাল;
হঠাৎ রেগে মটাৎ ক'রে ভাঙ্‌ল গাছের ডাল।
গাছের মাথায় চড়াই পাখি অবাক হ'য়ে কয়—
"বাস্‌রে বাস্‌! হাতির গায়ে এমন জোরও হয়"!
মুখ বাড়িয়ে ব্যাং বলে, "ভাই, তাইত তোরে বলি—
আমরা, অর্থাৎ চার-পেয়েরা, এম্নিভাবেই চলি"॥

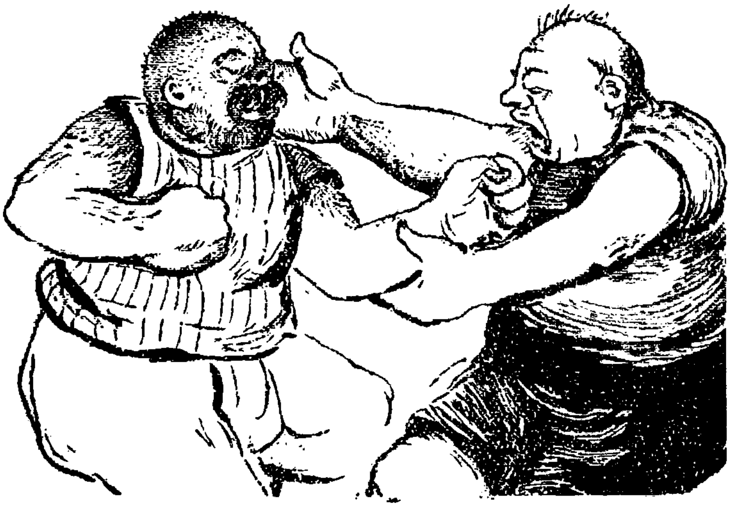
সম্পাদকের দশা

সম্পাদকীয়—

একদা নিশীথে এক সম্পাদক গোবেচারা।
পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি হইলেন দেশছাড়া॥
অনাহারী সম্পাদকী হাড়ভাঙা খাটুনি সে।
জানে তাহা ভুক্তভোগী অপরে বুঝিবে কিসে?
লেখক পাঠক আদি সকলেরে দিয়া ফাঁকি।
বেচারি ভাবিল মনে—বিদেশে লুকায়ে থাকি॥
এদিকে ত ক্রমে ক্রমে বৎসরেক হল শেষ।
'নোটিশ' পড়িল কত 'সম্পাদক নিরুদ্দেশ'॥
লেখক পাঠকদল রুষিয়া কহিল তবে।
জ্যান্ত হোক মৃত হোক ব্যাটারে ধরিতে হবে॥
বাহির হইল সবে শব্দ করি 'মার মার'।
--দৈবের লিখন, হায়, খণ্ডাইতে সাধ্য কার॥
একদা কেমনে জানি সম্পাদক মহাশয়।
পড়িলেন ধরা—আহা দুরদৃষ্ট অতিশয়॥

তারপরে কি ঘটিল কি করিল সম্পাদক।
সে সকল বিবরণে নাহি তত আবশ্যক॥
মোট কথা হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে।
বসিলেন আপনার প্রাচীন গদিতে এসে॥
(অর্থাৎ লেখকদল লাঠ্যৌষধি শাসনেতে।
বসায়েছে তার পুনঃ সম্পাদকী আসনেতে॥)
ঘুচে গেছে বেচারীর ক্ষণিক সে শান্তি সুখ।
লেখকের তাড়া খেয়ে সদা তার শুষ্কমুখ॥
দিস্তা দিস্তা গদ্য পদ্য দর্শন সাহিত্য প'ড়ে।
পুনরায় বেচারির নিত্যি নিত্যি মাথা ধরে॥
লোলচর্ম অস্থি সার জীর্ণ বেশ রুক্ষ্ম কেশ।
মুহূর্ত সোয়াস্তি নাই—লাঞ্ছনার নাহি শেষ॥

কাণা-খোঁড়া সংবাদ



পুরাতন কালে ছিল দুই রাজা,
নামধাম নাহি জানা,
একজন তার খোঁড়া অতিশয়,
অপর ভূপতি কানা।
মন ছিল খোলা, অতি আলাভোলা,
ধরমেতে ছিল মতি,
পর ধনে সদা ছিল দোঁহাকার
বিরাগ বিকট অতি।
প্রতাপের কিছু নাহি ছিল ত্রুটি
মেজাজ রাজারি মত,
শুনেছি কেবল বুদ্ধিটা নাকি
নাহি ছিল সরু তত।
ভাই ভাই মত ছিল দুই রাজা,
না ছিল ঝগড়াঝাঁটি,
হেনকালে আসি তিন হাত জমি
সকল করিল মাটি।

তিন হাত জমি হেন ছিল তাহা
কেহ নাহি জানে কার,
কহে খোঁড়া রায় "এক চক্ষু যার
এ জমি হইবে তার।"
শুনি কানা রাজা ক্রোধ করি কয়,
"আরে অভাগার পুত্র!
এ জমি তোমারি— দেখ না এখনি
খুলিয়া কাগজ পত্র।"
নক্সা রেখেছে একশো বছর
বাক্সে বাঁধিয়া আঁটি,
কীট কুটমতি কাটিয়া কাটিয়া
করিয়াছে তারে মাটি;
কাজেই তর্ক না মিটিল হায়,
বিরোধ বাধিল ভারি,
হইল যুদ্ধ হুদ্দ মতন
চৌদ্দ বছর ধরি।
মরিল সৈন্য, ভাঙিল অস্ত্র,
রক্ত চলিল বহি,
তিন হাত জমি তেমনি রহিল,
কারও হার জিত নাহি।

তবে খোঁড়া রাজা কহে, "হায়, হায়,
তর্ক বিষম বটে,
ঘোরতর রণে অতি অকারণে
মরণ সবার ঘটে।"
বলিতে বলিতে চটাৎ করিয়া
হঠাৎ মাথায় তার,
অদ্ভুত এক বুদ্ধি আসিল
অতীব চমৎকার।
কহিল তখন খোঁড়া মহারাজ,
"শুন মোর কানা ভাই,
তুচ্ছ কারণে রক্ত ঢালিয়া
কখনও সুযশ নাই।

তার চেয়ে জমি দান করে ফেল,
আপদ শান্তি হবে।"
কানা রাজা কহে, "খাসা কথা ভাই!
কারে দিই কহ তবে।"
কহেন খঞ্জ, "আমার রাজ্যে
আছে তিন মহাবীর—
একটি পেটুক, অপর অলস,
তৃতীয় কুস্তিগীর।
তোমার মুলুকে কে আছে এমন,
এদের হারাতে পারে?—
সবার সমুখে তিন হাত জমি
বক্‌শিস্‌ দিব তারে।"
কানা রাজা কহে, "ভীমের দোসর
আছে ত মল্ল মম,
ফলাহারে পটু, প'চাশি পেটুক,
অলস কুমড়া সম।
দেখা যাবে কার বাহাদুরি বেশি
আসুক তোমার লোক;
যে জিতিবে সেই পাবে এই জমি"—
খোঁড়া বলে, "তাই হোক।"

পড়িল নোটিস ময়দান মাঝে
আলিশান সভা হবে,
তামাসা দেখিতে চারিদিক হতে
ছুটিয়া আসিল সবে।
ভয়ানক ভিড়ে ভরে পথঘাট,
লোকে হল লোকাকার,
মহা কোলাহল দাঁড়াবার ঠাঁই
কোনোখানে নাহি আর।
তারপর ক্রমে রাজার হুকুমে
গোলমাল গেল থেমে,
দুই দিক হতে দুই পালোয়ান
আসরে আসিল নেমে।

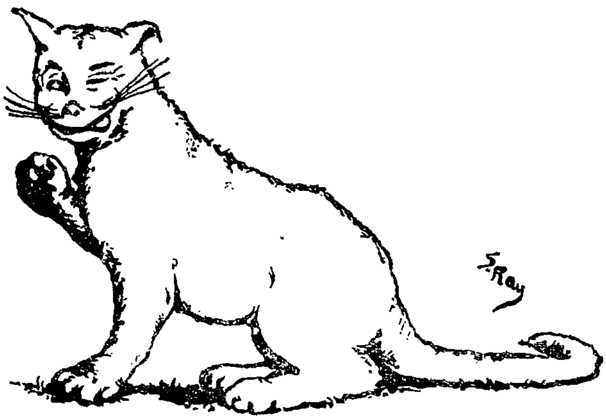
লম্ফে ঝম্ফে যুঝিল মল্ল
গজ-কচ্ছপ হেন,
রুষিয়া মুষ্টি হানিল দোঁহায়—
বজ্র পড়িল যেন!
গুঁতাইল কত, ভোঁতাইল নাসা,
উপাড়িল গোঁফ দাড়ি,
যতেক দন্ত করিল অন্ত
ভীষণ চাপট মারি।
তারপরে দোঁহে দোঁহারে ধরিয়া
ছুঁড়িল এমনি জোরে,
গোলার মতন গেল গো উড়িয়া
দুই বীর বেগভরে।
কি হল তাদের কেহ নাহি জানে,
নানা কথা কয় লোকে,
আজও কেহ তার পায়নি খবর,
কেহই দেখেনি চোখে।

যাহোক এদিকে, কুস্তির শেষে
এল পেটুকের পালা,
যেন অতিকায় ফুটবল্ দুটি,
অথবা ঢাকাই জালা।
ওজনেতে তারা কেহ নহে কম,
ভোজনেতে ততোধিক,
বপু সুবিপুল, ভুঁড়ি বিভীষণ,—
ভারি সাতমণ ঠিক!
অবাক দেখিছে সভার সকলে,
আজব কাণ্ড ভারি—
ধামা ধামা লুচি নিমেষে ফুরায়,
দই ওঠে হাঁড়ি হাঁড়ি!
দাঁড়িপাল্লায় মাপিয়া সকলে
দেখে আহারের পরে,
দুজনেই ঠিক বেড়েছে ওজনে
সাড়ে তিন মণ ক'রে।

কানা রাজা বলে "একি হল জ্বালা,
আক্কেল নাই কারো,
কেহ কি বোঝে না সোজা কথা এই,—
হয় জেতো নয় হারো।"
তার পর এল কুঁড়ে দুইজন
ঝাঁকার উপর চড়ে,
সভামাঝে দোঁহে শুয়ে চিৎপাত
চুপচাপ রহে পড়ে।
হাত নাহি নাড়ে, চোখ নাহি মেলে,
কথা নাই কারো মুখে,
দিন দুই তিন রহিল পড়িয়া,
নাসা গীত গাহি সুখে।
জঠরে যখন জ্বলিল আগুন,
পরান কণ্ঠাগত,
তখন কেবল মেলিয়া আনন
থাকিল মড়ার মত।
দয়া করে তবে সহৃদয় কেহ
নিকটে আসিয়া ছুটি,
মুখের নিকটে ধরিল তাদের
চাটিম্ কদলী দুটি।
খঞ্জের লোকে কহিল কষ্টে,
"ছাড়িয়ে দেনারে ভাই,"
কানার ভৃত্য রহিল হাঁ ক'রে
মুখে তার কথা নাই!
তখন সকলে কাষ্ঠ আনিয়া
তায় কেরোসিন ঢালি,
কুঁড়েদের গায়ে চাপাইয়া রোষে
দেশলাই দিল জ্বালি।
খোঁড়ার প্রজাটি "বাপ্‌রে" বলিয়া
লাফ্ দিয়া তাড়াতাড়ি,
কম্পিত পদে চম্পট দিল
একেবারে সভা ছাড়ি।

"দুয়ো" বলি সবে দেয় করতালি
পিছু পিছু ডাকে "ফেউ"
কানার অলস বলে, "কি আপদ!
ঘুমুতে দিবিনা কেউ?"
শুনে সবে বলে "ধন্য ধন্য
কুঁড়ে-কুল-চূড়ামণি!"
ছুটিয়া তাহারে বাহির করিল
আগুন হইতে টানি।
কানার লোকের গুণপনা দেখে
কানা রাজা খুসী ভারি,
জমিত দিলই— আরও দিল কত,
টাকাকড়ি ঘরবাড়ি।

হযবরল



বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল; ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি রুমালটা বলল, 'ম্যাঁও!' কি আপদ! রুমালটা ম্যাও করে কেন?

চেয়ে দেখি রুমাল তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটা-সোটা লাল টক্‌টকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।' অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।'

আমি খানিক ভেবে বললাম, 'তাহলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।' বেড়াল বলল, 'বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।' আমি বললাম, 'চন্দ্রবিন্দু কেন?' শুনে বেড়ালটা 'তাও জানো না?' ব'লে এক চোখ বুজে ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করে বিশ্রী রকম হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, ঐ চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।' বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো?' আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেই রকম বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ হুঁ করে গেলাম।

তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।' আমি বললাম, 'বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না?' বেড়াল বলল, 'কেন? সে আর মুশকিল কি?' আমি বললাম,

'কি করে যেতে হয় তুমি জানো?' বেড়াল এক গাল হেসে বলল, 'তা আর জানিনে? কলকেতা, ডায়মণ্ড-হারবার, রানাঘাট, তিব্বত,—বাস্‌! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল।' আমি বললাম, 'তাহলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার?' শুনে বেড়ালটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ, সে আমার কর্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তাহলে সে ঠিক ঠিক বলতে পারত।'



আমি বললাম, 'গেছো-দাদা কে? তিনি থাকেন কোথায়?' বেড়াল বলল, 'গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে? গাছেই থাকে।' আমি বললাম, 'কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?' বেড়াল খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটি হচ্ছে না, সে হবার যো নেই'। আমি বললাম, 'কি রকম?' বেড়াল বলল, 'সে কি রকম জানো? মনে কর, তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, তাহলে শুনবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে, তিনি গেছেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'তাহলে তোমরা কি করে দেখা কর?'

বেড়াল বলল, 'সে অনেক হাঙ্গাম। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই; তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে; তারপর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে। তারপর দেখতে হবে—'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কি রকম হিসেব?' বেড়াল বলল, 'সে ভারি শক্ত। দেখবে কি রকম?' এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর গেছোদাদা।' বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল। তারপর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর তুমি' বলে আবার ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ আবার একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।' এমনি করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা

আঁচড় কাটে, আর বলে, 'এই মনে কর তিব্বত'—'এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে'—'এই মনে কর গাছের গায়ে একটা ফুটো—'

এই রকম শুনতে শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম, 'দূর ছাই! কি সব আবোল-তাবোল বকছে, একটুও ভালো লাগে না।' বেড়াল বলল, 'আচ্ছা তাহলে আর একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ—আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব কর।' আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে।

কি আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, 'সাত দুগুণে কত হয়?' আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে? এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হল, 'কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়?' তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা দাঁড়কাক শ্লেট পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে, আর এক একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, 'সাত দুগুণে চোদ্দ।' কাকটা অমনি দুলে দুলে মাথা নেড়ে বলল, 'হয়নি, হয়নি—ফেল্।'



আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, 'নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ।' কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।' আমি বললাম, 'তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয় না? এখন কেন?' কাক বলল, 'তুমি যখন বলছিলে, তখনো পুরো চোদ্দ হয়নি। তখন ছিল, তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে ধাঁ করে '১৪' লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত—চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'

আমি বললাম, 'এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনিনি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দ হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দ। একঘণ্টা আগে হলেও যা, দশ দিন পরে হলেও তাই।' কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?' আমি বললাম, 'সময়ের দাম কি রকম?' কাক বলল, 'এখানে কদিন থাকতে, তাহলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করবার যো নেই। এইতো, কদিন খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটা সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার

সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।' বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

এমন সময়ে হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুড়ুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো তাতে কল্‌কে-টল্‌কে কিচ্ছু নেই—আর মাথা ভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি সব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'কই, হিসেবটা হল?' কাক খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'এই হল বলে।' বুড়ো বলল, 'কি আশ্চর্য! উনিশ দিন পার হয়ে গেল, এখনো হিসেবটা হয়ে উঠল না?' কাক দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কতদিন বললে?' বুড়ো বলল, 'উনিশ।' কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল, 'লাগ্ লাগ্ লাগ্ কুড়ি।' বুড়ো বলল, 'একুশ', কাক বলল, 'বাইশ', বুড়ো বলল, 'তেইশ', কাক বলল, 'সাড়ে তেইশ'; ঠিক যেন নিলেম ডাকছে। ডাকতে ডাকতে কাকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ডাকছ না যে?' আমি বললাম, 'খামখা ডাকতে যাব কেন?'

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখেনি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বন্‌বন্ করে আট দশ পাক ঘুরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর হুঁকোটাকে দূরবীনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বার বার দেখতে লাগল। তারপর কোত্থেকে একটা পুরানো দরজীর ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, 'খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।'

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, 'এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুওর?' বুড়ো বলল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখ।' দেখলাম ফিতের লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি '২৬' লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা কিছু মাপে সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

তারপর বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'ওজন কত?' আমি বললাম, 'জানি না।' বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে টিপে বলল, 'আড়াই সের।' আমি বললাম, 'সেকি! পট্‌লার ওজনই তো একুশ সের—সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট।' কাকটা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে তোমাদের হিসেব অন্য রকম।' বুড়ো বলল, 'তাহলে লিখে নাও—ওজন আড়াই সের, বয়েস সাঁইত্রিশ।'

আমি বললাম, 'দুৎ! আমার বয়েস হল আট বছর তিনমাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।'

বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়তি না কমতি?' আমি বললাম, 'সে আবার কি?' বুড়ো বলল, 'বলি, বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে?' আমি বললাম, 'বয়েস আবার কমবে কি?' বুড়ো বলল, 'তা নয় তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি? তাহলেই তো গেছি! কোনদিন দেখব বয়েস বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি?' আমি বললাম, 'তা তো হবেই। আশি বছর বয়েস হলে মানুষ বুড়ো হবে না?' বুড়ো বলল, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দি। তখন আর একচল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না—উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ

করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল আবার উঠল—এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।' শুনে আমার ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল।

কাক বলল, 'তোমরা একটু আস্তে আস্তে কথা কও, আমার হিসেবটা চট্‌পট্ সেরে নি।' বুড়ো অমনি চট্ করে আমার পাশে এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল, 'একটা চমৎকার গল্প বলব। দাঁড়াও একটু ভেবে নি।' এই বলে তার হুঁকো দিয়ে টেকো মাথা চুলকাতে চুলকাতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মনে হয়েছে. শোনো—

'তারপর এদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে "হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ" বলে হুড়্‌মুড়্ করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁশি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ-হৈ রৈ-রৈ মার্-মার্ কাট্-কাট্—এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন. "পক্ষীরাজ যদি হবে, তাহলে ন্যাজ নেই কেন?" শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, ভালো কথা! ন্যাজ কি হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সব সুড়্‌সুড়্ করে পালাতে লাগল।'

এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যাণ্ডবিল?' আমি বললাম, 'কই না, কিসের বিজ্ঞাপন?' বলতেই কাকটা একটা কাগজের বাণ্ডিল থেকে একখানা ছাপানো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল, আমি পড়ে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে—

শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ

শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে

৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী, খুচরা ও পাইকারী, সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি ১।/০। CHILDREN HALF PRICE অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রং, কান কট্‌কট্‌ করে কিনা, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান ! সাবধান ! ! সাবধান ! ! !

আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়িকুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতিকাক, হেড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

কাক বলল, 'কেমন হয়েছে?' আমি বললাম, 'সবটা তো ভালো করে বোঝা গেল না।' কাক গম্ভীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভারি শক্ত, সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এয়েছিল, তার ছিল টেকো মাথা—'

এই কথা বলতেই বুড়ো মাৎ-মাৎ করে তেড়ে উঠে বলল, 'দেখ্! ফের যদি টেকো মাথা টেকো মাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর শ্লেট ফাটিয়ে দেব।' কাক একটু থতমত খেয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'টেকো নয়, টেপো মাথা, যে মাথা টিপে টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।'

বুড়ো তাতেও ঠাণ্ডা হল না, বসে বসে গজ্‌গজ্ করতে লাগল। তাই দেখে কাক বলল, 'হিসেবটা দেখবে নাকি?' বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, 'হয়ে গেছে? কই দেখি।' কাক অমনি 'এই দেখ' বলে তার শ্লেটখানা ঠকাস্ করে বুড়োর টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোটো ছেলেদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে 'ও মা—ও পিসি—ও শিবুদা'—বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল। কাকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'লাগল নাকি! ষাট্ ষাট।' বুড়ো অমনি কান্না থামিয়ে বলল, একষট্টি, বাষট্টি, চৌষট্টি—' কাক বলল, 'পঁয়ষট্টি।' আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয়, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কই হিসেবটা তো দেখলে না?' বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো! কি হিসেব হল পড় দেখি।'

আমি শ্লেটখানা তুলে দেখলাম খুদে খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে—'ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারৎ খেসারৎ দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখলিকার সত্ত্বে অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত বদস্ত কায়েম মোকররী পত্তনী পাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ৎ। সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপর্দ আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকমল ডিক্রীজারী নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—'

আমার পড়া শেষ না হতেই বুড়ো বলে উঠল, 'এসব কি লিখেছ আবোল-তাবোল?' কাক বলল, 'ওসব লিখতে হয়। তা না হলে হিসেব টিকবে কেন? ঠিক চোকসমতো কাজ করতে হলে গোড়ায় এসব বলে নিতে হয়।' বুড়ো বলল, 'তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কি হল তা তো বললে না?' কাক বলল, 'হ্যাঁ, তাও তো বলা হয়েছে। ওহে! শেষ দিকটা পড় তো?'

আমি দেখলাম শেষের দিকে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা ৴২৷৷ সের, খরচ ৩৭ বৎসর। কাক বলল, 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে অঙ্কটা এল্‌-সি-এম্‌ও নয়, জি-সি-এম্‌ও নয়। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অঙ্ক, না হয় ভগ্নাংশ। পরীক্ষা করে দেখলাম আড়াই সেরটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তাহলে বাকি তিনটে হল ত্রৈরাশিক। এখন আমার জানা দরকার, তোমরা ত্রৈরাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও?'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, তাহলে একবার জিগগেস করে নি।' এই বলে সে নিচু হয়ে গাছের গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, 'ওরে বুধো! বুধো রে!' খানিক পরে মনে হল কে যেন গাছের ভিতর থেকে রেগে বলে উঠল, 'কেন ডাকছিস?' বুড়ো বলল, 'কাক্কেশ্বর কি বলছে শোন্।' আবার সেই রকম আওয়াজ হল, 'কি বলছে?' বুড়ো বলল, 'বলছে, ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ?' তেড়ে উত্তর হল, 'কাকে বলছে ভগ্নাংশ? তোকে না আমাকে?' বুড়ো বলল, 'তা নয়। বলছে, হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস, না ত্রৈরাশিক?'



একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, 'আচ্ছা, ত্রৈরাশিক দিতে বল।'

বুড়ো গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ দাড়ি হাতড়াল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'বুধোটার যেমন বুদ্ধি! ত্রৈরাশিক দিতে বলব কেন? ভগ্নাংশটা খারাপ হল কিসে? না হে কাক্কেশ্বর, তুমি ভগ্নাংশই দাও।' কাক বলল, 'তাহলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ দিলে রইল ভগ্নাংশ আধ সের, তোমার হিসেব হল আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে—খাঁটি হলে দু টাকা চোদ্দ আনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা।' বুড়ো বলল, 'আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন তিন ফোঁটা জল হিসেবের মধ্যে পড়েছিল। এই নাও তোমার শ্লেট, আর এই নাও পয়সা ছটা।'

পয়সা পেয়ে কাকের মহা ফুর্তি! সে 'টাক্-ডুমাডুম, টাক্-ডুমাডুম্' বলে শ্লেট বাজিয়ে নাচতে লাগল। বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, 'ফের টাক্ টাক্ বলছিস? দাঁড়া। ওরে বুধো, বুধো রে! শিগগির আয়। আবার টাক্ বলছে।' বলতে-না-বলতেই গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁট্লা মতন কি যেন হুড়্মুড়্ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নিচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো।

হুঁকোওয়ালা কোথায় তাকে টেনে তুলবে, না সে নিজেই পোঁট্লার উপর চড়ে বসে, 'ওঠ্ বলছি, শিগগির ওঠ্' ব'লে ধাঁই ধাঁই করে তাকে হুঁকো দিয়ে মারতে লাগল। কাক আমার দিকে চোখ মট্কিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।'

এই কথা বলতে বলতেই চেয়ে দেখি, বুধো তার পোঁট্লা শুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সে পোঁট্লা উঁচিয়ে দাঁত কড়মড় করে বলল, 'তবে রে ইস্টুপিড উধো!' উধোও আস্তিন গুটিয়ে হুঁকো বাগিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, 'তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো!' কাক বলল, 'লেগে যা, লেগে যা—নারদ-নারদ!' অমনি ঝটাপট্, খটাপট্, দমাদম্ ধপাধপ্! মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি উধো চিৎপাত শুয়ে হাঁপাচ্ছে, আর বুধো ছট্ফট্ করে টাকে হাত বুলোচ্ছে। বুধো কান্না শুরু করল, 'ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে?' উধো কাঁদতে লাগল, 'ওরে হায় হায়! আমাদের বুধোর কি হল রে!' তারপর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে, দিব্যি খোশমেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।



আমি ভাবছি এই বেলা পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক, এমন সময় শুনি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে কি রকম শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ হাসতে হাসতে আর কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না। উঁকি মেরে দেখি, একটা জন্তু—মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, 'এই গেল গেল—নাড়ি-ভুঁড়ি সব ফেটে গেল!'

হঠাৎ আমায় দেখে সে একটু দম পেয়ে উঠে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে, তা না হলে আর একটু হলেই হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল।' আমি বললাম, 'তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন?' জন্তুটা বলল, 'কেন হাসছি শুনবে? মনে কর, পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচ্‌প্যাচ্‌ কাদা হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ্‌

আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে—হোঃ হোঃ হোঃ হো—' এই বলে সে আবার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল। আমি বললাম, 'কি আশ্চর্য! এর জন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছ?' সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, 'না, না, শুধু এর জন্য নয়। মনে কর, একজন লোক আসছে, তার এক হাতে কুলপি বরফ, আর এক হাতে সাজিমাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ, হোঃ হো, হাঃ হাঃ হাঃ হা—' আবার হাসির পালা।

আমি বললাম, 'তুমি কেন এই সব অসম্ভব কথা ভেবে খামখা হেসে হেসে কষ্ট পাচ্ছ?' সে বলল, 'না, না, সব কি আর অসম্ভব? মনে কর, একজন লোক টিকটিকি পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হো—' জন্তুটার রকম-সকম দেখে আমার ভারি অদ্ভুত লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কে? তোমার নাম কি?' সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'আমার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌। আমার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌, আমার ভায়ের নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌, আমার বাবার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌, আমার পিশের নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌—' আমি বললাম, 'তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টি-শুদ্ধ সবাই হিজিবিজ্‌বিজ্‌।' সে আবার খানিক ভেবে বলল, 'তা তো নয়, আমার মামার নাম তকাই। আমার মামার নাম তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেশোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই—' আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'সত্যি বলছ? না, বানিয়ে?' জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, 'না না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।' আমার ভয়ানক রাগ হল, তেড়ে বললাম, 'একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'

অমনি কথা নেই বার্তা নেই, ঝোপের আড়াল থেকে মস্ত একটা দাড়িওয়ালা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কথা হচ্ছে বুঝি?' আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'না' কিন্তু কিছু না বলতেই সে তড়তড় করে বলে যেতে লাগল, 'তা তোমরা যতই তর্ক কর, এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে—ছাগলে কি না খায়।' এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল—

'হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজিবিজ্‌বিজ্‌ আমার গলায় ঝোলান সার্টি-ফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং, বি, এ, খাদ্য-বিশারদ। আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি, তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরিজিতে লিখবার সময় লিখি B.A. অর্থাৎ ব্যা। কোন্‌-কোন্‌ জিনিস খাওয়া যায় আর কোন্‌টা-কোন্‌টা খাওয়া যায় না, তা আমি সব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি—তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্যবিশারদ। তোমরা যে বল, "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়," এটা অত্যন্ত অন্যায়। এই তো একটু আগে ঐ হতভাগাটা বলছিল যে রামছাগল টিকটিকি খায়। এটা একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি অনেক রকম টিকটিকি চেটে দেখেছি, ওতে খাবার মতো কিচ্ছু নেই। অবশ্যি আমরা মাঝে মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই, যা তোমরা খাও না, যেমন—খাবারের ঠোঙা, কিম্বা নারকেলের ছোবড়া, কিম্বা খবরের কাগজ, কিম্বা সন্দেশের মতো ভালো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোনো বই আমরা কক্ষনো খাই না। আমরা ক্বচিৎ কখনো লেপ কম্বল কিম্বা তোশক বালিশ এসব একটু আধটু খাই বটে, কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিম্বা টেবিল চেয়ার খাই, তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে, তখন শখ করে অনেক রকম জিনিস আমরা চিবিয়ে



কিম্বা চেখে দেখি,—যেমন, পেনসিল রবার কিম্বা বোতলের ছিপি কিম্বা শুকনো জুতো কিম্বা ক্যামবিসের ব্যাগ। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার স্ফূর্তির চোটে এক সাহেবের আধখানা তাঁবু প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিম্বা শিশি বোতল, এ সব আমরা কোনোদিন খাই না। কেউ কেউ সাবান খেতে ভালোবাসে, কিন্তু সে সব নেহাৎ ছোটখাট বাজে সাবান। আমার ছোটভাই একবার একটা আস্ত বার্-সোপ খেয়ে ফেলেছিল—' বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা ব্যা করে ভয়ানক কাঁদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে সাবান খেয়ে ভাইটির অকালমৃত্যু হয়েছে।

হিজিবিজ্‌বিজ্‌টা এতক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ ছাগলটার বিকট কান্না শুনে সে হাঁউ-মাঁউ করে ধড়মড়িয়ে উঠে বিষম-টিষম খেয়ে একেবারে অস্থির! আমি ভাবলাম বোকাটা মরে বুঝি এবার। কিন্তু একটু পরেই দেখি, সে আবার তেমনি হাত-পা ছুঁড়ে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে লেগেছে। আমি বললাম, 'এর মধ্যে আবার হাসবার কি হল?' সে বলল, 'সেই একজন লোক ছিল, সে মাঝে মাঝে এমন ভয়ঙ্কর নাক ডাকাত, যে, সবাই তার উপর চটা ছিল। একদিন তাদের বাড়ি বাজ পড়েছে, আর অমনি সবাই দৌড়ে তাকে দমা দম্ মারতে লেগেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হো'—আমি বললাম, 'যত সব বাজে কথা।' এই বলে যেই ফিরতে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি একটা নেড়ামাথা কে যেন যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পায়জামা পরে হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে আমার গা জ্বলে গেল। আমায় ফিরতে দেখেই সে আব্দার করে আহ্লাদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দুহাত নেড়ে বলতে লাগল, 'না ভাই, না ভাই, এখন আমায় গাইতে বল না। সত্যি বলছি, আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।' আমি বললাম, 'কি আপদ! কে তোমায় গাইতে বলছে?' লোকটা এমন বেহায়া, সে তবুও আমার কানের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করতে লাগল, 'রাগ করলে? হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে? আচ্ছা, না হয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি, রাগ করবার দরকার কি ভাই?' আমি কিছু বলবার আগেই ছাগলটা আর হিজিবিজ্‌বিজ্‌টা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, গান হোক, গান হোক।' অমনি নেড়াটা তার পকেট থেকে মস্ত দুই তাড়া গানের কাগজ বার করে, সেগুলো চোখের কাছে নিয়ে গুন্‌গুন্ করতে করতে হঠাৎ সরু গলায় চীৎকার করে গান ধরল—'লাল গানে নীল সুর, হাসি-হাসি গন্ধ।'

ঐ একটিমাত্র পদ সে একবার গাইল, দুবার গাইল, পাঁচবার, দশবার গাইল। আমি বললাম, 'এতো ভারি উৎপাত দেখছি, গানের কি আর কোনো পদ নেই?' নেড়া বলল, 'হ্যাঁ, আছে, কিন্তু সেটা অন্য একটা গান। সেটা হচ্ছে—''অলিগলি চলি রাম, ফুটপাথে ধুমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম।'' সে গান আজকাল আমি গাই না। আরেকটা

গান আছে—''নাইনিতালের নতুন আলু''—সেটা খুব নরম সুরে গাইতে হয়। সেটাও আজকাল গাইতে পারি না। আজকাল যেটা গাই, সেটা হচ্ছে শিখিপাখার গান।' এই বলেই সে গান ধরল—

মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে
শিশিবোতল ছিপিঢাকা সরু সরু গানে গানে
আলোভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে
সরু মোটা শাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে।

আমি বললাম, 'এ আবার গান হল নাকি? এর তো মাথামুণ্ডু কোনো মানেই হয় না।' হিজিবিজ্‌বিজ্ বলল, 'হ্যাঁ, গানটা ভারি শক্ত।' ছাগল বলল, 'শক্ত আবার কোথায়? ঐ শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তাছাড়া তো শক্ত কিচ্ছু পেলাম না।' নেড়াটা খুব অভিমান করে বলল, 'তা, তোমরা সহজ গান শুনতে চাও তো সে কথা বললেই হয়। অত কথা শোনাবার দরকার কি? আমি কি আর সহজ গান গাইতে পারি না?' এই বলে সে গান ধরল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।

আমি বললাম, 'মজারু বলে কোনো কথা হয় না।' নেড়া বলল, 'কেন হবে না—আলবৎ হয়। সজারু কাঙগারু দেবদারু সব হতে পারে, মজারু কেন হবে না?' ছাগল বলল, 'ততক্ষণ গানটা চলুক না, হয় কি না-হয় পরে দেখা যাবে।' অমনি আবার গান শুরু হল—

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।
আজকে হেথায় চাম্‌চিকে আর পেঁচারা
আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।
কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি,
ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি,
ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,
দেখবে তখন ছিম্বি ছ্যাঙা চপাটি।

আমি আবার আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে গেলাম। গান চলতে লাগল—

সজারু কয়, ঝোপের মাঝে এখনি
গিন্নী আমার ঘুম দিয়েছেন দেখনি?
জেনে রাখুন প্যাঁচা এবং প্যাঁচানী,
ভাঙলে সে ঘুম শুনে তাদের চ্যাঁচানি,
খ্যাংরা-খোঁচা করব তাদের খুঁচিয়ে—
এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে।



বাদুড় বলে, পেঁচার কুটুম কুটুমী
মানবে না কেউ তোমার এসব ঘুঁতুমি।
ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুসো আঁধারে?
গিন্নী তোমার হোঁৎলা এবং হাঁদাড়ে।
তুমিও দাদা হচ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে
চিমনি-চাটা ভোঁপসা-মুখো ভ্যাঁপাটে।

গানটা আরও চলত কিনা জানি না, কিন্তু এই পর্যন্ত হতেই একটা গোলমাল শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, আমার আশেপাশে চারদিকে ভিড় জমে গিয়েছে। একটা সজারু এগিয়ে বসে ফোঁৎফোঁৎ করে কাঁদছে আর একটা শাম্‌লাপরা কুমির মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে আস্তে তার পিঠ থাব্‌ড়াচ্ছে আর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে, 'কেঁদো না, কেঁদো না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।' হঠাৎ একটা তকমা-আঁটা পাগ্‌ড়ি-বাঁধা কোলা ব্যাং রুল উঁচিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল—'মানহানির মোকদ্দমা।'

অমনি কোত্থেকে একটা কালো ঝোল্‌লা-পরা হুতোম প্যাঁচা এসে সকলের সামনে একটা উঁচু পাথরের উপর বসেই চোখ বুজে ঢুলতে লাগল, আর একটা মস্ত ছুঁচো একটা বিশ্রী নোংরা হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল। প্যাঁচা একবার ঘোলা ঘোলা চোখ করে চারদিক তাকিয়েই তক্ষুনি আবার চোখ বুজে বলল, 'নালিশ বাতলাও।' বলতেই কুমিরটা অনেক কষ্টে কাঁদো কাঁদো মুখ করে চোখের মধ্যে নখ দিয়ে খিম্‌চিয়ে পাঁচ ছয় ফোঁটা জল বার করে ফেলল। তারপর সর্দিবসা মোটা গলায় বলতে লাগল, 'ধর্মাবতার হুজুর! এটা মানহানির মোকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেক প্রকার, যথা—মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু, মুখীকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু

ইত্যাদি। কচুগাছের মূলকে কচু বলে সুতরাং বিষয়টার একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।'

এইটুকু বলতেই একটা শেয়াল শাম্‌লা মাথায় তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'হুজুর, কচু অতি অসার জিনিস। কচু খেলে গলা কুট্‌কুট্ করে, কচুপোড়া খাও বললে মানুষে চটে যায়। কচু খায় কারা? কচু খায় শুওর আর সজারু। ওয়াক্ থুঃ।' সজারুটা আবার ফ্যাঁৎফ্যাঁৎ করে কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমির সেই প্রকাণ্ড বই দিয়ে তার মাথায় এক থাব্‌ড়া মেরে জিজ্ঞাসা করল, 'দলিলপত্র সাক্ষী-সাবুদ কিছু আছে?' সজারু ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঐ তো ওর হাতে সব দলিল রয়েছে।' বলতেই কুমিরটা ন্যাড়ার কাছ থেকে একতাড়া গানের কাগজ কেড়ে নিয়ে হঠাৎ এক জায়গা থেকে পড়তে লাগল—

একের পিঠে দুই
চৌকি চেপে শুই
পোঁটলা বেঁধে থুই
গোলাপ চাঁপা জুঁই
ইলিশ মাগুর রুই
হিন্‌চে পালং পুঁই
সান্ বাঁধানো ভুঁই
গোবর জলে ধুই
কাঁদিস কেন তুই?

সজারু বলল, 'আহা ওটা কেন? ওটা তো নয়।' কুমির বলল, তাই নাকি? আচ্ছা, দাঁড়াও।' এই বলে সে আবার একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল—

চাঁদনি রাতের পেত্‌নীপিসি সজনেতলায় খোঁজ্‌না রে—
থ্যাঁৎলা মাথা হ্যাংলা সেথা হাড় কচাকচ্ ভোজ মারে।
চাল্‌তা গাছে আল্‌তা পরা নাক ঝোলানো শাঁখচুনি
মাক্‌ড়ি নেড়ে হাঁকুড়ে বলে, আমায় তো কেউ ডাকছনি!
মুণ্ডু ঝোলা উলটোবুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে,
বলছে দুলে, মিন্‌সেগুলোর মাংস খাব তুলতুলে।

সজারু বলল, 'দূর ছাই! কি যে পড়ছে তার নেই ঠিক।' কুমির বলল, 'তাহলে কোন্‌টা?—এইটা?—দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাঁথা কম্বল করে সম্বল বোকা ভোম্বল—এটাও নয়? আচ্ছা তাহলে—দাঁড়াও দেখছি—নিঝুম নিশুত রাতে একা শুয়ে তেতালাতে, খালিখালি খিদে পায় কেন রে?—কি বললে? ওসব নয়? তোমার গিন্নীর নামে কবিতা?—তা, সে কথা আগে বললেই হত। এই তো—রামভজনের গিন্নীটা, বাপ্‌রে যেন সিংহীটা! বাসন নাড়ে ঝনার্‌ঝন্, কাপড় কাচে দমাদ্দম্।—এটাও মিলছে না? তা হলে নিশ্চয়ই এটা—

খুস্‌খুসে কাশি ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, ফুস্‌ফুসে ছ্যাঁদা বুড়ো তুই মর্‌।
মাজ্‌রাতে ব্যথা পাঁজ্‌রাতে বাত, আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাৎ!

সজারুটা ভয়ানক কাঁদতে লাগল, 'হায়, হায়! আমার পয়সাগুলো সব জলে গেল! কোথাকার এক আহাম্মক উকিল, দলিল দিলে খুঁজে পায় না!' ন্যাড়াটা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল, 'কোন্‌টা শুনতে চাও? সেই যে—বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু—সেইটা?' সজারু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটে, সেইটে।' অমনি শেয়াল আবার তেড়ে উঠল, 'বাদুড় কি বলে? হুজুর, তাহলে বাদুড়গোপালকে সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।' কোলা ব্যাং গাল গলা ফুলিয়ে হেঁকে বলল, 'বাদুড়গোপাল হাজির?' সবাই এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখল, কোথাও বাদুড় নেই। তখন শেয়াল বলল, 'তাহলে হুজুর, ওদের সক্কলের ফাঁসির হুকুম হোক।' কুমির বলল, 'তা কেন? এখন আমরা আপিল করব।' প্যাঁচা চোখ বুজে বলল, 'আপিল চলুক। সাক্ষী আনো।'

কুমির এদিক ওদিক তাকিয়ে হিজিবিজ্‌বিজ্‌কে জিজ্ঞাসা করল, সাক্ষী দিবি? চার আনা পয়সা পাবি।' পয়সার নামে হিজিবিজ্‌বিজ তড়াক্‌ করে সাক্ষী দিতে উঠেই ফ্যাক্‌ ফ্যাক্‌ করে হেসে ফেলল। শেয়াল বলল, 'হাসছ কেন?' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তুই সাক্ষী দিবি যে, বইটার সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া, মাথার উপর লালকালির ছাপ। উকিল যেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি আসামীকে চেন? অমনি সে বলে উঠেছে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া, মাথার উপর লাল কালির ছাপ—হোঃ হোঃ হোঃ হো—' শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সজারুকে চেন?' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'হ্যাঁ, সজারু চিনি, কুমির চিনি, সব চিনি। সজারু গর্তে থাকে, তার গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা, আর কুমিরের গায়ে চাকা চাকা ঢিপির মতো, তারা ছাগল-টাগল ধরে খায়।' বলতেই ব্যাকরণ শিং হঠাৎ ব্যা ব্যা করে ভয়ানক কেঁদে উঠল। আমি বললাম, 'আবার কি হল?' ছাগল বলল, 'আমার সেজোমামার আধখানা কুমিরে খেয়েছিল, তাই বাকি আধখানা মরে গেল।' আমি বললাম, 'গেল তো গেল, আপদ গেল। তুমি এখন চুপ কর।'

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু জান?' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'তা আর জানি নে? একজন নালিশ করে, তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসামী, তারও একজন উকিল থাকে। এক-একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে বসে ঘুমোয়।' প্যাঁচা বলল, 'কক্ষনো আমি ঘুমোচ্ছি না—আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।' বলেই সে ফ্যাক্‌ ফ্যাক্‌ করে ভয়ানক হাসতে লাগল।

শেয়াল বলল, 'আবার কি হল?' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু—কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। হোঃ হোঃ হোঃ হো—' শেয়াল বলল, 'বটে? তোমার নাম কি শুনি?' সে বলল, 'এখন আমার নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌।' শেয়াল বলল, 'নামের আবার এখন-তখন কি? হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'তাও জানো না? সকালে আমার নাম থাকে আলু-নারকোল আবার আর একটু বিকেল হলেই আমার নাম হয়ে যাবে রামতাড়ু।' শেয়াল

বলল, 'নিবাস কোথায়?' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলল, 'কার কথা বলছ? শ্রীনিবাস? শ্রীনিবাস দেশে চলে গিয়েছে।' অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে উদো আর বুধো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে।' উদো বলল, 'দেশে গেলেই লোকেরা সব হুস্‌ হুস্‌ করে মরে যায়।' বুধো বলল, 'হারুলের কাকা যেই দেশে গেল অমনি শুনি সে মরে গিয়েছে।' শেয়াল বলল, 'আঃ, সবাই মিলে কথা বোলো না, ভারি গোলমাল হয়।' শুনে উদো বুধোকে বলল, 'ফের সবাই মিলে কথা বলবি তো তোকে মারতে মারতে সাবাড় করে ফেলব।' বুধো বলল, 'আবার যদি গোলমাল করিস তাহলে তোকে ধরে এক্কেবারে পোঁট্‌লা-পেটা করে দেব।'

শেয়াল বলল, 'হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মক, এদের সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই।' শুনে কুমির রেগে ল্যাজ আছড়িয়ে বলল, 'কে বলল মূল্য নেই? দস্তুরমতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে।' বলেই সে তক্ষুনি ঠক্‌ঠক্‌ করে ষোলটা পয়সা গুণে হিজিবিজ্‌বিজের হাতে দিয়ে দিল। অমনি কে যেন উপর থেকে বলে উঠল '১নং সাক্ষী, নগদ হিসাব, মূল্য চার আনা।' চেয়ে দেখলাম কাক্কেশ্বর বসে বসে হিসাব লিখছে।

শেয়াল আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এ বিষয়ে আর কিছু জানো কি না?' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ খানিক ভেবে বলল, 'শেয়ালের বিষয়ে একটা গান আছে, সেইটা জানি।' শেয়াল বলল, 'কি গান শুনি?' হিজিবিজ্‌বিজ্‌ সুর করে বলতে লাগল, 'আয়, আয়, আয়, শেয়ালে বেগুন খায়, তারা তেল আর নুন কোথায় পায়—' বলতেই শেয়াল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'থাক্‌ থাক্‌, সে অন্য শেয়ালের কথা, তোমার সাক্ষী দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে।' এদিকে হয়েছে কি, সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছে দেখে সাক্ষী দেবার জন্য ভয়ানক হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি কাক্কেশ্বর ঝুপ্‌ করে গাছ থেকে নেমে এসে সাক্ষীর জায়গায় বসে সাক্ষী দিতে আরম্ভ করেছে।

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলতে আরম্ভ করল, 'শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ। শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে, ৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি। আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচরা পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য—'

শেয়াল বলল, 'বাজে কথা বল না, যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। কি নাম তোমার?' কাক বলল, 'কি আপদ! তাই তো বলছিলাম—শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে।' শেয়াল বলল, 'নিবাস কোথায়?' কাক বলল, 'বললাম যে কাগেয়াপটি।' শেয়াল বলল, 'সে এখান থেকে কতদূর?' কাক বলল, 'তা বলা ভারি শক্ত। ঘণ্টা হিসাবে চার আনা, মাইল হিসাবে দশ পয়সা, নগদ দিলে দু পয়সা কম। যোগ করলে দশ আনা, বিয়োগ করলে তিন আনা, ভাগ করলে সাত পয়সা, গুণ করলে একুশ টাকা।' শেয়াল বলল, 'আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাড়ি যাবার পথটা চেন তো?' কাক বলল, 'তা আর চিনিনে? এইতো সামনেই সোজা পথ দেখা যাচ্ছে।' শেয়াল বলল, 'এ-পথ কতদূর গিয়েছে?' কাক বলল, 'পথ আবার যাবে কোথায়? যেখানকার পথ সেখানেই আছে। পথ কি আবার এদিক ওদিক চরে বেড়ায়? না, দার্জিলিঙে হাওয়া খেতে যায়?' শেয়াল বলল, 'তুমি তো ভারি বেয়াদব হে! বলি, সাক্ষী দিতে যে এয়েছ, মোকদ্দমার কথা কি জান?' কাক বলল, 'খুব যা হোক! এতক্ষণ বসে বসে হিসাব করল কে? যা কিছু জানতে চাও আমার কাছে পাবে। এই তো, প্রথমেই, মান কাকে বলে? মান মানে কচুরি। কচুরি চার প্রকার—হিঙে কচুরি, খাস্তা কচুরি, নিমকি

আর জিবেগজা! খেলে কি হয়? খেলে শেয়ালদের গলা কুট্‌কুট্‌ করে, কিন্তু কাগেদের করে না। তারপর একজন সাক্ষী ছিল, নগদ মূল্য চার আনা, সে আসামে থাকত, তার কানের চামড়া নীল হয়ে গেল—তাকে বলে কালাজ্বর। তারপর একজন লোক ছিল, সে সকলের নামকরণ করত—শেয়ালকে বলতো তেলচোরা, কুমিরকে বলতো অষ্টাবক্র, প্যাঁচাকে বলতো বিভীষণ—' বলতেই বিচার সভায় একটা ভয়ানক গোলমাল বেধে গেল। কুমির হঠাৎ খেপে টপ্‌ করে কোলা ব্যাংকে খেয়ে ফেলল, তাই দেখে ছুঁচোটা কিচ্‌কিচ্‌ কিচ্‌কিচ্‌ করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল, শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে হুস্‌ হুস্‌ করে কাক্কেশ্বরকে তাড়াতে লাগল। প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সবাই এখন চুপ কর, আমি মোকদ্দমার রায় দেব।' এই বলেই সে একটা কানে-কলম-দেওয়া খরগোশকে হুকুম করল, 'যা বলছি লিখে নাও, মানহানির মোকদ্দমা, ২৪ নম্বর। ফরিয়াদী—সজারু। আসামী—দাঁড়াও। আসামী কৈ?' তখন সবাই বলল, 'ঐ যা! আসামী তো কেউ নেই।' তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে ন্যাড়াকে আসামী দাঁড় করানো হল। ন্যাড়াটা বোকা, সে ভাবল আসামীরাও বুঝি পয়সা পাবে, তাই সে কোনো আপত্তি করল না।

হুকুম হল—ন্যাড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এ-রকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ 'ব্যা-করণ শিং' বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢুঁ মারল, তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কি রকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামার মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজোমামা আমার কান ধরে বলছেন, 'ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে?'

আমি তো অবাক! প্রথমে ভাবলাম বুঝি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু, তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না, আমার রুমালটা খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও রুমাল নেই, আর একটা বেড়াল বেড়ার উপর বসে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়েই খচ্‌মচ্‌ করে নেমে পালিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে বাগানের পিছন থেকে একটা ছাগল ব্যা করে ডেকে উঠল।

আমি বড়মামার কাছে এসব কথা বলেছিলাম, কিন্তু বড়মামা বললেন, 'যা, যা, কতগুলো বাজে স্বপ্ন দেখে তাই নিয়ে গল্প করতে এসেছে।' মানুষের বয়স হলে এমন হোঁৎকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা এখনও বেশি বয়স হয়নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।

পাগলা দাশু

পাগলা দাশু

আমাদের স্কুলের যত ছাত্র তাহাদের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে পাগলা দাশুকে না চিনে। যে লোক আর কাহাকেও জানে না, সেও সকলের আগে পাগলা দাশুকে চিনিয়া ফেলে। সেবার এক নতুন দারোয়ান আসিল, একেবারে আন্‌কোরা পাড়াগেঁয়ে লোক, কিন্তু প্রথম যখন সে পাগলা দাশুর নাম শুনিল, তখনই আন্দাজে ঠিক ধরিয়া লইল যে, এই ব্যক্তিই পাগলা দাশু। কারণ মুখের চেহারায়, কথাবার্তায়, চাল-চলনে বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু 'ছিট' আছে।

তাহার চোখ দুটি গোল গোল, কান দুটি অনাবশ্যক রকমের বড়, মাথায় এক বস্তা ঝাঁক্‌ড়া চুল। চেহারাটা দেখিলেই মনে হয়—

ক্ষীণদেহ খর্বকায় মুণ্ড তাহে ভারি
যশোরের কই যেন নরমূর্তিধারি।

সে যখন তাড়াতাড়ি চলে অথবা ব্যস্ত হইয়া কথা বলে, তখন তাহার হাত পা ছোঁড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি চিংড়িমাছের কথা মনে পড়ে।

সে যে বোকা ছিল তাহা নয়। অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষত লম্বা লম্বা গুণ-ভাগের বেলায় তাহার আশ্চর্য মাথা খুলিত। আবার এক এক সময় সে আমাদের বোকা বানাইয়া তামাশা দেখিবার জন্য এমন সকল ফন্দি বাহির করিত যে, আমরা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম।

'দাশু' অর্থাৎ দাশরথি, যখন প্রথম আমাদের ইস্কুলে ভরতি হয়, তখন জগবন্ধুকে আমাদের 'ক্লাশের ভালো ছেলে' বলিয়া সকলে জানিত। সে পড়াশুনায় ভালো হইলেও, তাহার মতো অমন একটি হিংসুটে ভিজেবেড়াল আমরা আর দেখি নাই। দাশু একদিন জগবন্ধুর কাছে কি একটা ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। জগবন্ধু তাহাকে খামখা দুকথা শুনাইয়া বলিল, "আমার বুঝি আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই? আজ এঁকে ইংরিজি বোঝাব, কাল ওঁর অঙ্ক কষে দেব, পরশু আর একজন আসবেন আর এক ফরমাইস নিয়ে—ঐ করি আর কি!" দাশু সাংঘাতিক চটিয়া বলিল, "তুমি তো ভারি ছ্যাঁচড়া ছোটলোক!" জগবন্ধু পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে নালিশ করিল, "ঐ নতুন ছেলেটা আমায় গালাগালি দিচ্ছে।" পণ্ডিত মহাশয় দাশুকে এমনি ধমক দিয়া দিলেন যে বেচারা একেবারে দমিয়া গেল।

আমাদের ইংরাজি পড়াইতেন বিষ্টুবাবু। জগবন্ধু তাঁহার প্রিয় ছাত্র। পড়াইতে পড়াইতে যখনই তাঁহার বই দরকার হয়, তিনি জগবন্ধুর কাছেই বই চাহিয়া লন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় 'গ্রামার' চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ের মলাট দেওয়া 'গ্রামার'খানা বাহির করিয়া দিল। মাস্টার মহাশয় বইখানি খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানা কার?" জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, "আমার।" মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "হুঁ—নতুন সংস্করণ বুঝি? বইকে-বই একেবারে বদলে গেছে।" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন—'যশোবন্ত দারোগা—লোমহর্ষক ডিটেকটিভ নাটক।' জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া

বোকার মতো তাকাইয়া রহিল। মাস্টার মহাশয় বিকট রকম চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "এই সব জ্যাঠামি বিদ্যে শিখচ বুঝি?" জগবন্ধু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মাস্টার মহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্, আর ভালমানুষি দেখিয়ে কাজ নেই—ঢের হয়েছে।" লজ্জায় অপমানে জগবন্ধুর দুই কান লাল হইয়া উঠিল—আমরা সকলেই তাহাতে বেশ খুশি হইলাম। পরে জানা গেল যে, এটি দাশু ভায়ার কীর্তি, সে মজা দেখিবার জন্য গ্রামারের জায়গায় ঠিক ঐরূপ মলাট দেওয়া একখানা বই রাখিয়া দিয়াছিল।

দাশুকে লইয়া আমরা সর্বদাই ঠাট্টাতামাশা করিতাম এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অপ্রীতিকর সমালোচনা করিতাম। তাহাতে একদিনও তাহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই। এক এক সময়ে সে নিজেই আমাদের মন্তব্যের উপর রঙ চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলিত। একদিন সে বলিল, "ভাই আমাদের পাড়ায় যখন কেউ আমসত্ত্ব বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে। কেন জানিস?" আমরা বলিলাম, "খুব আমসত্ত্ব খাস বুঝি?" সে বলিল, "তা নয়। যখন আমসত্ত্ব শুকোতে দেয়, আমি সেইখানে ছাদের উপর বার দুয়েক চেহারাখানা দেখিয়ে আসি। তাতেই, ত্রিসীমানার যত কাক সব ত্রাহি ত্রাহি করে ছুটে পালায়। কাজেই আর আমসত্ত্ব পাহারা দিতে হয় না।"

একবার সে হঠাৎ পেন্টেলুন পরিয়া স্কুলে হাজির হইল। ঢল্‌ঢলে পায়জামার মতো পেন্টেলুন আর তাকিয়ার খোলের মতো কোট পরিয়া তাহাকে যে কিরূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল এবং সেটা তাহার কাছে ভারি একটা আমোদের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "পেন্টেলুন পরেছিস্ কেন?" দাশু এক গাল হাসিয়া বলিল, "ভালো করে ইংরিজি শিখব ব'লে।" আর একবার সে খামখা নেড়া মাথায় এক পট্টি বাঁধিয়া ক্লাশে আসিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা সকলে তাহা লইয়া ঠাট্টা তামাশা করায় যারপরনাই খুশি হইয়া উঠিল। দাশু আদপেই গান গাহিতে পারে না, তাহার যে তালজ্ঞান বা সুরজ্ঞান একেবারে নাই, এ কথা সে বেশ জানে। তবু সেবার ইনস্পেক্টার সাহেব যখন ইস্কুল দেখিতে আসেন, তখন আমাদের খুশি করিবার জন্য চিৎকার করিয়া গান শুনাইয়াছিল। আমরা কেহ ওরূপ করিলে সেদিন রীতিমতো শাস্তি পাইতাম কিন্তু দাশু 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না।

একবার ছুটির পরে দাশু অদ্ভুত এক বাক্স বগলে লইয়া ক্লাসে হাজির হইল। মাস্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দাশু, ও বাক্সের মধ্যে কি এনেছ?" দাশু বলিল, "আজ্ঞে, আমার জিনিসপত্র।" জিনিসপত্রটা কিরূপ হইতে পারে, এই লইয়া আমাদের মধ্যে বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। দাশুর সঙ্গে বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি সবই তো আছে, তবে আবার জিনিসপত্র কিরে বাপু? দাশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়া বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বলিল. "খবরদার, আমার বাক্স তোমরা কেউ ঘেঁটো না।" তাহার পর চাবি দিয়া বাক্সটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া, সে তাহার ভিতর কি যেন দেখিয়া লইল, এবং 'ঠিক আছে' বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া হিসাব করিতে লাগিল। আমি একটুখানি দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে গিয়াছিলাম—অমনি পাগলা মহা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরাইয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফেলিল।

ক্রমে আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, "ওটা ওর

টিফিনের বাক্স—ওর মধ্যে খাবার আছে।" কিন্তু একদিনও টিফিনের সময় তাহাকে বাক্স খুলিয়া কিছু খাইতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, "ওটা বোধ হয় ওর মনি-ব্যাগ—ওর মধ্যে টাকা পয়সা আছে, তাই ও সর্বদা কাছে কাছে রাখতে চায়।" আর একজন বলিল, "টাকা পয়সার জন্য অত বড় বাক্স কেন? ও কি ইস্কুলে মহাজনী কারবার খুলবে নাকি?"

একদিন টিফিনের সময় দাশু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া, বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রাখিয়া গেল আর বলিল, "এটা এখন তোমার কাছে রাখো, দেখো হারায় না যেন। আর আমার আসতে যদি একটু দেরি হয়, তবে তোমরা ক্লাশে যাবার আগে ওটা দারোয়ানের কাছে দিও।" এই বলিয়া সে বাক্সটি দারোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন আমাদের উৎসাহ দেখে কে! এতদিনে সুবিধা পাওয়া গিয়াছে, এখন দারোয়ানটা একটু তফাৎ গেলেই হয়। খানিক বাদে দারোয়ান তাহার রুটি পাকাইবার লোহার উনানটি ধরাইয়া, কতকগুলি বাসনপত্র লইয়া কলতলার দিকে গেল। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, দারোয়ান আড়াল হওয়া মাত্র, আমরা পাঁচ-সাতজনে তাহার ঘরের কাছে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তাহার পর আমি চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া দেখি বাক্সের মধ্যে বেশ ভারি একটা কাগজের পোঁটলা ন্যাকড়ার ফালি দিয়া খুব করিয়া জড়ানো। তাড়াতাড়ি পোঁটলার প্যাঁচ খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে একখানা কাগজের বাক্স—তাহার ভিতরে আর একটি ছোট পোঁটলা। সেটি খুলিয়া একখানা কার্ড বাহির হইল, তাহার এক পিঠে লেখা 'কাঁচকলা খাও' আর একটি পিঠে লেখা 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়।' দেখিয়া আমরা এ-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে একজন বলিয়া উঠিল, "ছোকরা আচ্ছা যা হোক, আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।" আর একজন বলিল, "যেমন ভাবে বাঁধা ছিল তেমনি করে রেখে দাও, সে যেন টেরও না পায় যে আমরা খুলেছিলাম। তাহলে সে নিজেই জব্দ হবে।" আমি বলিলাম, "বেশ কথা। ও আস্‌লে পরে তোমরা খুব ভালোমানুষের মতো বাক্সটা দেখাতে বলো আর ওর মধ্যে কি আছে, সেটা বার বার করে জানতে চেয়ো।" তখন আমরা তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলি বাঁধিয়া, আগেকার মতো পোঁটলা পাকাইয়া বাক্সে ভরিয়া ফেলিলাম।

বাক্সে চাবি দিতে যাইতেছি, এমন সময় হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ শোনা গেল—চাহিয়া দেখি পাঁচিলের উপরে বসিয়া পাগলা দাশু হাসিয়া কুটিকুটি। হতভাগা এতক্ষণ চুপি চুপি তামাশা দেখিতেছিল। তখন বুঝিলাম আমার কাছে চাবি দেওয়া, দারোয়ানের কাছে বাক্স রাখা, টিফিনের সময় বাহিরে যাওয়ার ভান করা, এ সমস্ত তাহার শয়তানি। খামখা আমাদের আহাম্মক বানাইবার জন্যই সে মিছামিছি এ কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত একটা বাক্স বহিয়া বেড়াইয়াছে।

সাধে কি বলি 'পাগলা দাশু?'

দাশুর খ্যাপামি

স্কুলের ছুটির দিন। স্কুলের পরেই ছাত্র-সমিতির অধিবেশন হবে, তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছে ছিল সে-ও একটা কিছু অভিনয় করে। একে-ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিশও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, সে কিছুতেই হবে না। সেইতো গতবার যখন আমাদের অভিনয় হয়েছিল তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল ; সেবার সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচূড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বলল, ''সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার!''—দাশুর তখন ''তবে আয় সম্মুখ সমরে'' ব'লে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতে পারলই না, মাঝ থেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার ''খোল তলোয়ার'' ব'লে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি ''দাঁড়া, দেখছিস না বক্‌লস্ আটকিয়ে গেছে'' ব'লে চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ারটা খুলে দিলাম তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তারপর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিবা চাহ পুরস্কার কহ সেনাপতি," তখন দাশুর বলবার কথা ছিল "নিত্য-কাল থাকে যেন রাজপদে মতি," কিন্তু দাশুটা তা না ব'লে, তার পরের আর একটা লাইন আরম্ভ করেই, হঠাৎ জিভ কেটে "ঐ যাঃ! ভুলে গেছিলাম" ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কটমট করে তাকাতে, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে ব'লে উঠলাম, "না, সে কিছুতেই হবে না।" বিশু বলল, "দাশু এক্‌টিং করবে? তাহলেই চিত্তির!" ট্যাঁপা বলল, "তার চাইতে ভজু মালিকে ডেকে আনলেই হয়!" দাশু বেচারা প্রথমে খুব মিনতি করল, তারপর চটে উঠল, তারপর কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কয়দিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোনায় বসে বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাশের ছোট গণশার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণশা ছেলেমানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে—তাই তাকে দেবদূতের 'পার্ট' দেওয়া হয়েছে। দাশু রোজ তাকে নানারকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণশার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম, গণশাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে না বাজতেই দেখা গেল, দাশুভায়া সাজঘরে

ঢুকে পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কিরে? তুই এখানে কি করছিস?" দাশু বলল, "বাঃ, পোশাক পরব না?" আমি বললাম, "পোশাক পরবি কিরে? তুই তো আর এক্‌টিং করবি না।" দাশু বলল, "বা, খুব তো খবর রাখ। আজকে দেবদূত সাজবে কে জানো না?" শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খটকা লাগল, আমি বললাম, "কেন গণ্‌শার কি হল?" দাশু বলল, "কি হয়েছে তা গণ্‌শাকে জিজ্ঞেস করলেই পার?" তখন চেয়ে দেখি সবাই এসেছে, কেবল গণশাই আসেনি। অমনি ধুচুনি, বিশু আর আমি ছুটে বেরোলাম গণশার খোঁজে।

সারাটি ইস্কুল খুঁজে, শেষটায় টিফিনঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমরা তাকে চটপট গ্রেপ্তার করে টেনে নিয়ে চললাম। গণ্‌শা কাঁদতে লাগল, "না আমি কক্ষনো এক্‌টিং করব না, তাহলে দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না।" আমরা তবু তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অঙ্কের মাস্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখেই ভয়ঙ্কর চোখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলেন, "তিন-তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস? তোদের লজ্জাও করে না?" ব'লেই আমাকে আর বিশুকে এক একটি চড় মেরে আর রামপদর কান ম'লে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন।

এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি, দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে। রাখাল বলছে, "তোকে আজ কিছুতেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হবে না।" দাশু বলছে, "বেশ তো, তাহলে আর কেউ দেবদূত সাজুক, আমি রাজা কিম্বা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছটা পার্ট আমার মুখস্ত হয়ে আছে।" এমন সময় আমরা এসে খবর দিলাম যে, গণশাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তখন অনেক তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াঝাঁটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, তাকেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হোক। শুনে দাশু খুব খুশী হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল যে, "আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তাহলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভণ্ডুল করে দেব।"

তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করেনি, খালি স্টেজের সামনে একবার পানের পিক্‌ ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তার খালি বলবার কথা–"দেবতা বিমুখ হলে মানুষে কি পারে?" কিন্তু সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরও চার-পাঁচ লাইন জুড়ে দিল! আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, "তোমরা যে লম্বা বক্তৃতা কর সে বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ!" এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেই আসবার কথা নয়, তা জেনেও সে স্টেজে আসবার জন্য জেদ ধরে বসল। আমরা অনেক কষ্টে অনেক তোয়াজ করে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারে না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে যে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরীতে প্রস্থান করেছেন। দাশু অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে মনে একটুও খুশি হয়নি।

শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী

এসে সভায় হাজির হলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন, "বারবার মহারাজে আশীষ করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।" বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে "আবার সে এসেছে ফিরিয়া" ব'লে এক গাল হাসতে হাসতে দাশু একেবারে সামনে এসে উপস্থিত। হঠাৎ এ রকম বাধা পেয়ে মন্ত্রী তার বক্তৃতার খেই হারিয়ে ফেলল, আমরাও সকলে কি রকম যেন ঘাবড়িয়ে গেলাম—অভিনয় হঠাৎ বন্ধ হবার যোগাড় হয়ে এল। তাই দেখে দাশু খুব সর্দারি করে মন্ত্রীকে বলল, ''বলে যাও কি বলিতেছিলে।'' তাতে মন্ত্রী আরও কেমন ঘাবড়িয়ে গেল। রাখাল প্রতিহারী সেজেছিল, দাশুকে কি যেন বলবার জন্যে যেই একটু এগিয়ে গেছে, অমনি দাশু ''চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমারে এই হতভাগা''—বলে এক চাঁটি মেরে তার মাথার পাগড়ি ফেলে দিল। ফেলে দিয়েই সে রাজার শেষ বক্তৃতাটা—''এ রাজ্যতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্য যাতনা'' ইত্যাদি—নিজেই গড়গড় করে ব'লে গিয়ে, ''যাও সবে নিজ নিজ কাজে'' ব'লে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে সব বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল আর ঝুপ্ করে পর্দাও নেমে গেল।

আমরা সব রেগে-মেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, "হতভাগা, দ্যাখ্ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথাই বলা হল না।" দাশু বলল, "বা, তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না হলে তো আরো সব মাটি হয়ে যেত।" আমি বললাম, "তুই কেন মাঝখানে এসে গোল বাধিয়ে দিলি? তাইতো সব ঘুলিয়ে গেল।" দাশু বলল, ''রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে? তা ছাড়া তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে? আর রামপদ কেন বারবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল?'' রামপদ বলল, ''ওকে ধরে ঘা দুচার লাগিয়ে দে।''

দাশু বলল, ''লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুনি চেঁচিয়ে সকলকে হাজির করি কিনা?''



চীনেপট্‌কা

আমাদের রামপদ তার জন্মদিনে একহাঁড়ি মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল। টিফিনের ছুটি হওয়া মাত্র আমরা সকলেই মহা উৎসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবল পাগলা দাশু।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালোবাসে না, তা নয়। কিন্তু রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না, দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলিত। আমরা রামপদকে বলিলাম, "দাশুকে কিছু দে।" রামপদ বলিল, "কি রে দাশু, খাবি নাকি? দেখিস, খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল্ আর আমার সঙ্গে কোনোদিন লাগতে আসবিনে—তা হলে মিহিদানা পাবি।" এমন করিয়া বলিলে তো রাগ হইবারই কথা, কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তারপর দারোয়ানের ছাগলটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল। তারপর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া, কি যেন ভাবিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল। এদিকে হাঁড়িটাকে শেষ করিয়া আমরা সকলে খেলায় মাতিয়া গেলাম—দাশুর কথা কেউ আর ভাবিবার সময় পাই নাই।

টিফিনের পর ক্লাসে আসিয়া দেখি দাশু অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ভাবে এক কোণে বসিয়া আপন মনে অংক কষিতেছে। তখনই আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম, "কিরে দাশু, কিছু করেছিস নাকি?" দাশু নিতান্ত ভালোমানুষের মতো বলিল, "হ্যাঁ, দুটো জি-সি-এম করে ফেলেছি।" আমি বলিলাম, "দুৎ! সে কথা কে বলছে? কিছু দুষ্টুমির মতলব করিসনি তো?" এ কথায় দাশু ভয়ানক চটিয়া গেল। তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে আসিতেছিলেন, দাশু তাঁহার কাছে নালিশ করে আর কি! আমরা অনেক কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিলাম।

পণ্ডিত মহাশয় মানুষটি মন্দ নহেন। পড়ার জন্য প্রায়ই কোনো তাড়াহুড়ো করেন না। কেবল মাঝে মাঝে একটু বেশি গোল করিলে হঠাৎ সাংঘাতিক রকম চটিয়া যান। সে সময়ে তাঁর মেজাজটি আশ্চর্য রকম ধারাল হইয়া উঠে। পণ্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিয়াই "নদী শব্দের রূপ কর" বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা বই খুলিয়া হড়বড় করিয়া যা-তা খানিকটা বলিয়া গেলাম এবং তাহার উত্তরে, পণ্ডিত মহাশয়ের নাকের ভিতর হইতে অতি সুন্দর ঘড়্ঘড়্ শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, নিদ্রা বেশ গভীর হইয়াছে। কাজেই আমরাও শ্লেট লইয়া 'টুকটাক' আর 'দশপঁচিশ' খেলা শুরু করিলাম। কেবল মাঝে মাঝে যখন ঘড়ঘড়ানি কমিয়া আসিত তখন সবাই মিলিয়া সুর করিয়া 'নদী নদ্যৌ নদ্যঃ' ইত্যাদি আওড়াইতাম। দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের মতো খুব আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

সকলে খেলায় মত্ত, কেবল দাশু এক কোনায় বসিয়া কি যেন করিতেছে সেদিকে আমাদের কোনো খেয়াল নাই। একটু বাদে পণ্ডিত মহাশয়ের চেয়ারের তলায় তক্তার নিচ হইতে ফট্ করিয়া কি একটা আওয়াজ হইল। পণ্ডিত মহাশয় ঘুমের ঘোরে ভ্রূকুটি করিয়া সবেমাত্র 'উঃ' বলিয়া কি যেন একটা ধমক দিতে যাইবেন, এমন সময় ফুট্ফাট্ দুম্দাম্ ধুপ্ধাপ্ শব্দে তাণ্ডব কোলাহল উঠিয়া সমস্ত স্কুলটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। মনে হইল যেন, যত রাজ্যের মিস্ত্রী মজুর সবাই এক জোটে বিকট তালে ছাত পিটাইতে লাগিয়াছে—দুনিয়ার যত কাঁসারি আর লাঠিয়াল সবাই যেন পাল্লা দিয়া হাতুড়ি আর লাঠি ঠুকিতেছে। খানিকক্ষণ পর্যন্ত আমরা, যাকে পড়ার বইয়ে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বলে, তেমনি হইয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় একবার মাত্র বিকট শব্দ করিয়া, তার পর হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া একলাফে টেবিল ডিঙ্গাইয়া, একেবারে ক্লাশের মাঝখানে ধড়্ফড়্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। সরকারী কলেজের নবীন পাল বরাবরই হাই জাম্পে ফার্স্ট প্রাইজ পায়, তাহাকেও আমরা এরকম সাংঘাতিক লাফাইতে দেখি নাই। পাশের ঘরে নিচের ক্লাশের ছেলেরা চিৎকার করিয়া 'কড়াকিয়া' নামতা আওড়াইতেছিল—তারাও হঠাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ইস্কুলময় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল—দারোয়ানের কুকুরটা পর্যন্ত যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া বিকট কেঁউ কেঁউ শব্দে গোলমালের মাত্রা ভীষণ রকম বাড়াইয়া তুলিল।

মিনিট পাঁচেক ভয়ানক আওয়াজের পর যখন সব ঠাণ্ডা হইয়া আসিল তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "কিসের শব্দ হইয়াছিল দেখ।" দারোয়ানজি একটা লম্বা বাঁশ দিয়া অতি সাবধানে আস্তে আস্তে, তক্তার নিচ হইতে একটা হাঁড়ি ঠেলিয়া বাহির করিল—রামপদর সেই হাঁড়িটা, তখনও তাহার মুখের কাছে একটুখানি মিহিদানা লাগিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ানক ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "এ হাঁড়িটা কার?" রামপদ বলিল, "আজ্ঞে আমার।" আর কোথা যায়— অমনি দুই কানে দুই পাক! "হাঁড়িতে কি রেখেছিলি!" রামপদ তখন বুঝিতে পারিল যে, গোলমালের জন্য সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে। সে বেচারা তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেল, "আজ্ঞে ওর মধ্যে ক'রে

মিহিদানা এনেছিলাম, তারপর—" মুখের কথা শেষ না হইতেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তারপর মিহিদানাগুলো চীনে পট্‌কা হয়ে ফুটতে লাগল, না?" বলিয়াই ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়া দুই চড়।

অন্যান্য মাস্টারেরাও ক্লাশে আসিয়া জড় হইয়াছিলেন; তাঁহারাও এক বাক্যে হাঁ-হাঁ করিয়া রুখিয়া আসিলেন। আমরা দেখিলাম বেগতিক। বিনা দোষে রামপদ বেচারা মার খায় বুঝি! এমন সময় দাশু আমার শ্লেটখানা লইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন, আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন ওরা শ্লেট নিয়ে খেলা করছিল— এই দেখুন টুকটাকের ঘর কাটা!" শ্লেটের উপর আমার নাম লেখা, পণ্ডিত মশাই আমার উপর প্রচণ্ড এক চড় তুলিয়াই হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর দাশুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "চোপ্‌ রও, কে বলেছে আমি ঘুমোচ্ছিলাম?" দাশু খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া বলিল, "তবে যে আপনার নাক ডাকছিল?" পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "বটে? ওরা সব খেলা কচ্ছিল? আর তুমি কি কচ্ছিলে?" দাশু অম্লানবদনে বলিল, "আমি পট্‌কায় আগুন দিচ্ছিলাম।" শুনিয়াই সকলের চক্ষুস্থির! ছোকরা বলে কি?

প্রায় আধ মিনিটখানেক কাহারও মুখে আর কথা নাই। তারপর পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ একেবারে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কেন পট্‌কায় আগুন দিচ্ছিলে?" দাশু ভয় পাইবার ছেলেই নয়, সে রামপদকে দেখাইয়া বলিল, "ও কেন আমায় মিহিদানা দিতে চাচ্ছিল না?" এরূপ অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া রামপদ বলিল, "আমার মিহিদানা, আমি যা ইচ্ছা তাই করব।" দাশু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তা হলে আমার পট্‌কা আমিও যা ইচ্ছা তাই করব।" এরূপ পাগলের সঙ্গে আর তর্ক করা চলে না! কাজেই মাস্টারেরা সকলেই কিছু-কিছু ধমক-ধামক করিয়া যে যার ক্লাশে চলিয়া গেলেন। সে 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না।

ছুটির পর আমরা সবাই মিলিয়া কত চেষ্টা করিয়াও তাহার দোষ বুঝাইতে পারিলাম না। সে বলিল, "আমার পট্‌কা, রামপদর হাঁড়ি। যদি আমার দোষ হয়, তা হলে রামপদরও দোষ হয়েছে। বাস্‌! ওর মার খাওয়াই উচিত।"



দাশুর কীর্তি

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুল সুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসল। 'ডাকাতে ধরেছিল? বলিস কিরে!' ডাকাত না তো কি? বিকেল বেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময় ডাকাতরা তাকে ধরে তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচ্‌কিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় ব'লে গেল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক—নইলে দড়াম্‌ করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।" তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় তার বড়মামা এসে তার কান ধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন, "রাস্তায় সঙ্‌ সেজে এয়ার্কি করা হচ্ছিল?" নবীনচাঁদ কাঁদ-কাঁদ গলায় ব'লে উঠল, "আমি কি করব? আমায় ডাকাতে ধরেছিল—" শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, "ফের জ্যাঠামি!" নবীনচাঁদ দেখল মামার সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা—কারণ, সত্যিসত্যিই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, একথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত। সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনেরই মধ্যেই চাপা ছিল।

যাহোক, স্কুলে এসে তার দুঃখ বোধ হয় অনেকটা দূর হতে পেরেছিল, কারণ স্কুলে অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল, এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুস্‌কুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ ব'লে স্বীকার করেছিল। দু একজন যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরনো ব'লে সন্দেহ করেছিল তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বললে, "ওটা তো জুতোর ফোস্কা", তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বললে, "যাও! তোমাদের কাছে আর কিছুই বলব না।"

কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই যে যার ক্লাশে চলে গেলাম, এমন সময় দেখি পাগলা দাশু একগাল হাসি নিয়ে ক্লাশে ঢুকছে। আমরা বললাম, "শুনেছিস্? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল।" যেমন বলা অম্নি দাশরথী হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে বই-টই ফেলে, খ্যাঁঃ-খ্যাঁঃ-খ্যাঁঃ-খ্যাঁঃ করে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিৎ হয়ে, একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরা তো অবাক! পণ্ডিত মশাই ক্লাশে এসেছেন, তখনও পুরোদমে তার হাসি চলছে। সবাই ভাবলে, 'ছোঁড়াটা ক্ষেপে গেল না কি?' যাহোক, খুব খানিকটা হুটোপাটির পর সে ঠাণ্ডা হয়ে, বই-টই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। পণ্ডিতমশাই বললেন, "ওরকম হাসছিলে কেন?" দাশু নবীনচাঁদকে দেখিয়ে বললে, "ঐ ওকে দেখে।" পণ্ডিতমশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাশের কোনার দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই, সে সারাটি ঘণ্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল।

টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল, "কিরে দেশো! বড় যে হাসতে শিখেছিস!" দাশু বললে, "হাসব না? তুমি কাল ধুচুনি মাথায় দিয়ে কি রকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি! দেখলে বুঝতে কেমন মজা!" আমরা সবাই বললাম, "সে কি রকম? ধুচুনি মাথায় নাচছিল মানে?" দাশু বললে, "তাও জান না? ওই কেষ্টা আর জগাই—ঐ যা! বলতে না বারণ করেছিল!" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কি বলছিস ভালো করেই বল্ না।" দাশু বললে, "কালকে শেঠেদের বাগানের পিছন দিয়ে নবু একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময় দুটো ছেলে—তাদের নাম বলতে বারণ—তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুচুনির মতো কি একটা চাপিয়ে, তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচ্‌কিরি দিয়ে পালিয়ে গেল।" নবু ভয়ানক রেগে বললে, "তুই তখন কি করছিলি?" দাশু বললে, "তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বললাম– ফের নড়বি তো দড়াম করে মাথা উড়িয়ে দেব। তাই শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে, তাই আমি তোমার বড়মামাকে ডেকে আনলাম।" নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা তেমনি তার দেমাক—সেইজন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না, তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললে, "তবে যে নবীনদা বলছিল, তাকে ডাকাতে ধরেছে?" দাশু বললে, "দূর বোকা! কেষ্ট কি ডাকাত?" বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাশে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখবামাত্র শিকারী বেড়ালের মতো ফুলে উঠল। কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিকক্ষণ কট্‌মট্ করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল।

কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি, নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্‌হন্ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়, তাকে ওরকম ভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম, এবার একটা কাণ্ড হবে। মোহন এসেই বলল, "কেষ্টা কই?" কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ

বললে "ওই দাশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞাসা কর।" মোহন বললে, "কিহে ছোকরা, তুমি সব জানো নাকি?" দাশু বললে, "না, সব আর জানব কোত্থেকে—এইতো সবে ফোর্থ ক্লাশে পড়ি, একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল বাংলা জিওমেট্রি—" মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বললে, "সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জানো কিনা?" দাশু বললে, "ঠ্যাঙায়নি তো—মেরেছিল, খুব অল্প মেরেছিল।" মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বললে, "খুব অল্প মেরেছে, না? তবু কতখানি শুনি?" দাশু বললে, "সে কিছুই না—ওরকম মারলে একটুও লাগে না।" মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বললে, "তাই নাকি? কি রকম মারলে পরে লাগে?" দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তারপর বললে, "ঐ সেবার হেডমাস্টার মশাই তোমায় যেমন বেত মেরেছিলেন, সেই রকম!" এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান ম'লে দিয়ে চিৎকার করে বলল, "দেখ্ বেয়াদব! ফের জ্যাঠামি করবি তো চাব্‌কিয়ে লাল করে দেব। কাল তুই সেখানে ছিলি কিনা, আর কি কি দেখেছিলি সব খুলে বলবি কিনা?" জানোই তো দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটে গোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল, ঘুঁষি চড়, আঁচড়, কামড় সে এম্নি চটপট চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে ফোর্থ ক্লাশের একটা রোগা ছেলে তাকে অমন ভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে--তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাঁকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎপাত করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল "এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।" এন্ট্রান্স ক্লাশের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেলত, তাহলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "হ্যাঁরে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন?" কেষ্টা বললে, "ঐ দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ওরকম করতে। আর বলেছিল, তা হলে এক সের জিলিপি পাবি।" আমরা বললাম, "কৈ আমাদের তো ভাগ দিলিনে?" কেষ্টা বলল, "সে কথা আর বলিস কেন? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কিনা আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস জিলিপি পাবি।"

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচ্‌কেমি করে?

চালিয়াৎ

শ্যামচাঁদের বাবা কোন একটা সাহেব-অফিসে মস্ত বড় কাজ করিতেন, তাই শ্যামচাঁদের পোশাক পরিচ্ছদে, রকম-সকমে কায়দার আর অন্ত ছিল না। সে যখন দেড় বিঘৎ চওড়া কলার আঁটিয়া, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়া, নতুন জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দে গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচাইয়া স্কুলে আসিত, তাহার সঙ্গে পাগড়িবাঁধা তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি এক রাজ্যের বই ও টিফিনের বাক্স বহিয়া আনিত, তখন তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন পেখমধরা ময়ূরটির মতো! স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে বলিতাম "চালিয়াৎ"।

বয়সের হিসাবে শ্যামচাঁদ একটু বেঁটে ছিল। পাছে কেহ তাকে ছেলেমানুষ ভাবে, এবং যথোপযুক্ত খাতির না করে, এই জন্য সর্বদাই সে অত্যন্ত বেশি রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথাবার্তায় নানা রকম বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মতো ভাব প্রকাশ করিত যে স্কুলের দারোয়ান হইতে নিচের ক্লাশের ছাত্র পর্যন্ত সকলেই ভাবিত, 'নাঃ, লোকটা কিছু জানে!' শ্যামচাঁদ প্রথমে যেবার ঘড়ি-চেইন আঁটিয়া স্কুলে আসিল, তখন তাহার কাণ্ড যদি দেখিতে! পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়িটাকে বাহির করিয়া সে কানে দিয়া শুনিত, ঘড়িটা চলে কিনা! স্কুলের যেখানে যত ঘড়ি আছে, সব কটার ভুল তাহার দেখানো চাই-ই চাই! পাঁড়েজি দারোয়ানকে সে রীতিমতো ধমক লাগাইয়া বসিল, "এইও! স্কুলের ক্লক্‌টাতে যখন চাবি দাও, তখন সেটাকে রেগুলেট কর না কেন? ওটাকে অয়েল করতে হবে—ক্রমাগতই শ্লো চলছে।" পাঁড়েজির চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনও ঘড়ি 'অয়েল' বা 'রেগুলেট' করে নাই। সে যে সপ্তাহে একদিন করিয়া চাবি ঘুরাইতে শিখিয়াছে, ইহাতেই তাহার দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা নাই। কিন্তু দেশভাইদের কাছে মানরক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, আভি হাম্‌ রেগ্‌লিট কর্‌বে।" পাঁড়েজির উপর একচাল চালিয়া শ্যামচাঁদ ক্লাশে ফিরিতেই এক পাল ছোট ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। শ্যামচাঁদ তাহাদের কাছে মহা আড়ম্বর করিয়া শ্লো, ফাস্ট, মেইন স্প্রিং, রেগুলেট প্রভৃতি ঘড়ির সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

একবার আমাদের একটি নতুন মাস্টার ক্লাশে আসিয়াই শ্যামচাঁদকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। লজ্জায় ও অপমানে শ্যামচাঁদের মুখ কান একেবারে লাল হইয়া উঠিল—সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্যামচাঁদ ঘটক।" মাস্টার মহাশয় অত কি বুঝিবেন, বলিলেন, "শ্যামচাঁদ? আচ্ছা বেশ, খোকা বস।" তারপর কয়েকদিন ধরিয়া স্কুল সুদ্ধ ছেলে তাহাকে 'খোকা' 'খোকা' করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু কয়দিন পরেই শ্যামচাঁদ ইহার শোধ লইয়া ফেলিল। সেদিন সে ক্লাশে আসিয়াই পকেট হইতে কালো চোঙার মতো কি একটা বাহির করিল। মাস্টার মহাশয়, শাদাসিধে ভালোমানুষ, তিনি বলিলেন, "কি হে খোকা, থার্‌মোমিটার এনেছ যে! জ্বর-টর হয় নাকি?" শ্যামচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, না—থার্‌মোমিটার নয়—ফাউণ্টেন পেন!" শুনিয়া সকলের তো চক্ষু স্থির। ফাউণ্টেন পেন! মাস্টার এবং

ছেলে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে আসিলেন ব্যাপারখানা কি! শ্যামচাঁদ বলিল, "এই একটা ভাল্‌কেনাইট্‌ টিউব, তার মধ্যে কালি ভরা আছে।" একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, পিচকারির বুঝি?" শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া, খুব মাতব্বরের মতো একটুখানি মুচকি হাসিয়া, কলমটিকে খুলিয়া তাহার সোনালি নিবখানি দেখাইয়া বলিল, "ওতে ইরিডিয়াম আছে—সোনার চেয়েও বেশি দাম।" তারপর যখন সে একখানা খাতা লইয়া, সেই আশ্চর্য কলম দিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল, তখন স্বয়ং মাস্টার মহাশয় পর্যন্ত বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর, শ্যামচাঁদ কলমটিকে তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি ভারি খুশি হইয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দুই ছত্র লিখিয়া বলিলেন, "কি কলই বানিয়েছে, বিলিতি কোম্পানি বুঝি?" শ্যামচাঁদ চট্‌পট্‌ বলিয়া ফেলিল, "আমেরিকান স্টাইলো এণ্ড ফাউণ্টেন পেন কোং। ফিলাডেল্‌ফিয়া।"

ক্রমে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ছুটির দিন স্কুলের উঠোনে প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটানো হইল, কলিকাতা হইতে কে এক বাজিওয়ালা আসিয়াছেন, তিনি 'ম্যাজিক' দেখাইবেন। যথাসময়ে সকলে আসিলেন, মাস্টার ছাত্র লোকজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সকলে মিলিয়া উঠান সিঁড়ি রেলিং পাঁচিল একেবারে ভরিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাজিক চলিতে লাগিল। একখানা শাদা রুমাল চোখের সামনেই লাল নীল সবুজের কারিকুরিতে রঙিন হইয়া উঠিল! একজন লোক একটা সিদ্ধ ডিম গিলিয়া মুখের মধ্য হইতে এগারোটা আস্ত ডিম বাহির করিল! ডেপুটিবাবুর কোচম্যানের দাড়ি নিংড়াইয়া প্রায় পঞ্চাশটি টাকা বাহির করা হইল। তারপর ম্যাজিকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "কারও কাছে ঘড়ি আছে?" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার ঘড়ি আছে।" ম্যাজিকওয়ালা তাহার ঘড়িটি লইয়া খুব গম্ভীরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘড়িটির খুব প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোফা ঘড়ি তো!" তারপর চেনশুদ্ধ ঘড়িটাকে একটা কাগজে মুড়িয়া, একটা হামানদিস্তায় দমাদম্‌ ঠুকিতে লাগিল। তারপর কয়েক টুকরো ভাঙা লোহা আর কাঁচ দেখাইয়া শ্যামচাঁদকে বলিল, "এইটা কি তোমার ঘড়ি?" শ্যামচাঁদের অবস্থা বুঝিতেই পার! সে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, দু-তিন বার কি যেন বলিতে গিয়া আবার থামিয়ে গেল। শেষটায় অনেক কষ্টে একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িল। যাহা হউক, খানিক বাদে যখন একখানা পাঁউরুটির মধ্যে ঘড়িটাকে আস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন 'চালিয়াৎ' খুব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন তামাশাটা সে আগাগোড়াই বুঝিতে পারিয়াছে।

সব শেষে ম্যাজিকওয়ালা নানাজনের কাছে নানারকম জিনিস চাহিয়া লইল—চশমা, আংটি, মনিব্যাগ, রুপার পেনসিল প্রভৃতি আট-দশটি জিনিস সকলের সামনে এক সঙ্গে পোঁটলা বাঁধিয়া, শ্যামচাঁদকে ডাকিয়া তাহার হাতে পোঁটলাটা দেওয়া হইল। শ্যামচাঁদ বুক ফুলাইয়া পোঁটলা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল আর ম্যাজিকওয়ালা লাঠি ঘুরাইয়া, চোখ-টোখ পাকাইয়া বিড়-বিড় করিয়া কি সব বকিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ শ্যামচাঁদের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "জিনিসগুলো ফেললে কোথায়?" শ্যামচাঁদ পোঁটলা দেখাইয়া বলিল, "এই যে।" ম্যাজিকওয়ালা মহা খুশি হইয়া বলিল, "সাবাস ছেলে! দাও, পোঁটলা খুলে যার যার জিনিস ফেরত দাও।" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা খুলিয়া দেখে, তাহার মধ্যে খালি কয়েক টুকরো কয়লা আর ঢিল। তখন ম্যাজিকওয়ালার তম্বি দেখে কে? সে কপালে হাত ঠুকিয়া বলিতে লাগিল, "হায়,

হায়, আমি ভদ্রলোকদের কাছে মুখ দেখাই কি করে? কেনই বা ওর কাছে দিতে গেছিলাম? ওহে, ওসব তামাশা এখন রাখ, আমার জিনিসগুলো এবার ফিরিয়ে দাও দেখি।'' শ্যামচাঁদ হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কানের মধ্য হইতে আংটি, চুলের মধ্যে পেন্সিল, আস্তিনের মধ্যে চশমা—এইরূপে একটি একটি জিনিস উদ্ধার করিতে লাগিল। আমরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম—শ্যামচাঁদও প্রাণপণে হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত জিনিসের হিসাব মিলাইয়া ম্যাজিক-ওয়ালা যখন বলিল, ''আর কি নিয়েছ?'' তখন সে বাস্তবিকই ভয়ানক রাগিয়া বলিল, "ফের মিছে কথা! কখনো আমি কিচ্ছু নিইনি।" তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের পিছন হইতে জ্যান্ত একটা পায়রা বাহির করিয়া বলিল, "এটা বুঝি কিছু নয়?'' এবার শ্যামচাঁদ একেবারে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর পাগলের মতো হাত পা ছুঁড়িয়া সভা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আমরা সবাই আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া চেঁচাইতে লাগিলাম—চালিয়াৎ! চালিয়াৎ!

সবজান্তা

আমাদের 'সবজান্তা' দুলিরামের বাবা কোন একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোনো বিষয়েই হোক, জার্মানির লড়াইয়ের কথাই হোক আর মোহনবাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক, দেশের বড় লোকেদের ঘরোয়া গল্পই হোক, আর নানারকম উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোনো বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করিত। একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল কথা শুনিত। মাস্টার মহাশয়-দের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ে তাহার ভারি পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ার সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সবজান্তা'।

আমার কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে, সবজান্তা যতখানি পাণ্ডিত্য দেখায় আসলে তাহার অনেকখানি উপরচালাকি। দু-চারিটি বড় বড় শোনা কথা আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু-দশটা খবর এইমাত্র তাহার পুঁজি, তারই উপর রঙচঙ দিয়া নানারকম বাজে গল্প জুড়িয়া সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত। একদিন আমাদের ক্লাশে পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে সে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের গল্প করিয়াছিল। তাহাতে সে বলে যে, নায়েগ্রা দশ মাইল উঁচু ও একশত মাইল চওড়া! একজন ছাত্র বলিল, "সে কি করে হবে? এভারেষ্ট সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সে-ই মোটে পাঁচ মাইল—" সবজান্তা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তোমরা তো আজকালকার খবর রাখ না!" যখনই তাহার কোনো কথায় আমরা সন্দেহ বা আপত্তি করিতাম, সে একটা যা তা নাম করিয়া আমাদের ধমক দিয়া বলিত, "তোমরা কি অমুকের চাইতে বেশি জানো?" আমরা বাহিরে সব সহ্য করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এক এক সময় রাগে গা জ্বলিয়া যাইত।

সবজান্তা যে আমাদের মনের ভাবটা বুঝিত না তাহা নয়। সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিত এবং সর্বদাই এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, আমরা তাহার কথাগুলি মানি বা না মানি, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র আসে যায় না। নানারকম খবর ও গল্প জাহির করিবার সময় মাঝে মাঝে আমাদের শুনাইয়া বলিত, "অবিশ্যি কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এসব কথা মানবেন না।" অথবা "যাঁরা না পড়েই খুব বুদ্ধিমান তাঁরা নিশ্চয়ই এ-সব উড়িয়ে দিতে চাইবেন"—ইত্যাদি। ছোকরা বাস্তবিক অনেক রকম খবর রাখিত, তার উপর তার বোলচালগুলিও ছিল বেশ ঝাঁঝালো রকমের; কাজেই আমরা বেশি তর্ক করিতে সাহস পাইতাম না।

তাহার পরে একদিন, কি কুক্ষণে, তাহার এক মামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আমাদেরই স্কুলের কাছে বাসা লইয়া বসিলেন। তখন আর সবজান্তাকে পায় কে! তাহার কথাবার্তার দৌড় এমন আশ্চর্য রকম বাড়িয়া চলিল যে, মনে হইত বুঝি বা তাহার পরামর্শ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পুলিসের পেয়াদা পর্যন্ত কাহারও কাজ চলিতে পারে না। স্কুলের ছাত্র মহলে তাহার খাতির ও প্রতিপত্তি এমন আশ্চর্য রকম জমিয়া গেল যে, আমরা কয়েক বেচারা, যাহারা বরাবর তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ

করিয়া আসিয়াছি—একেবারে কোণঠাসা হইয়া রহিলাম। এমন কি আমাদের মধ্য হইতে দু-একজন তাহার দলে যোগ দিতেও আরম্ভ করিল।

অবস্থাটা শেষটায় এমন দাঁড়াইল যে, ইস্কুলে আমাদের টেকা দায়! দশটার সময় মুখ কাঁচুমাচু করিয়া ক্লাশে ঢুকিতাম আর ছুটি হইলেই, সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ হাসি-তামাশার হাত এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া বাড়ি আসিতাম। টিফিনের সময়টুকু হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের সামনে একখানা বেঞ্চের উপর অত্যন্ত ভালো-মানুষের মতো বসিয়া থাকিতাম।

এইরকম ভাবে কতদিন চলিত জানি না, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় হঠাৎ সবজান্তা মহাশয়ের জারিজুরি সব এমনই ফাঁস হইয়া গেল যে, তাহার অনেকদিনকার খ্যাতি ঐ একদিনেই লোপ পাইল—আর আমরাও সেইদিন হইতে একটু মাথা তুলিতে পারিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই ঘটনারই গল্প বলিতেছি।

একদিন সবজান্তা আসিয়া খবর দিল, লোহারপুরের জমিদার রামলালবাবু আমাদের স্কুলে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন—একটি 'ফুটবল গ্রাউন্ড' ও খেলার সরঞ্জামের জন্য। আরও শুনিলাম রামলালবাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন রীতিমতো ভোজের আয়োজন হয়! প্রথমে কথাটা আমি বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু দু'দিন পরে হেডমাস্টার হরিবাবু যখন নিজে আসিয়া সে কথা ক্লাসে ক্লাসে জানাইলেন, তখন দুলিরামের খাতির দেখে কে! সে বলিল, যেবার সে দার্জিলিং গিয়াছিল, সেবার নাকি রামলালবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা-সাক্ষাৎ এমন কি আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত হইয়াছিল। রামলালবাবু তাহাকে কেমন খাতির করিতেন, তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া কি কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সে স্কুলের আগে এবং পরে, সারাটি টিফিনের সময় এবং সুযোগ পাইলে ক্লাশের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকেও নানা অসম্ভব রকম গল্প চালাইতে লাগিল। 'অসম্ভব' বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেলার দল সেসকল কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে একটুও বাধা বোধ করিত না।

একদিন টিফিনের সময়ে স্কুলের সামনে ওই বড় সিঁড়িটার উপর একদল ছেলের সঙ্গে বসিয়া সবজান্তা গল্প আরম্ভ করিল—"আমি একদিন দার্জিলিঙে লাটসাহেবের বাড়ির কাছেই ঐ রাস্তাটায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি রামলালবাবু হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছেন, তাঁর সঙ্গে আবার এক সাহেব। রামলালবাবু বললেন, 'দুলিরাম! তোমার সেই ইংরাজি কবিতাটা একবার এঁকে শোনাতে হচ্ছে। আমি এঁর কাছে তোমার সুখ্যাতি করছিলাম, তাই ইনি সেটা শুনবার জন্য আগ্রহ করছেন!' উনি নিজে থেকে বলছেন, তখন আমি আর কি করি? আমি সেই 'ক্যাসাবিয়াংকা' থেকে আবৃত্তি করলুম—তারপর দেখতে দেখতে যা ভিড় জমে গেল! সাহেব মেম সবাই শুনতে চায়। সবাই বলে 'আবার কর।' মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম, নেহাত রামলালবাবু বললেন তাই আবার করতে হল।" এমন সময় কে যেন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "রামলালবাবু কে?" সকলে ফিরিয়া দেখি, একটি রোগা নিরীহ গোছের পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সবজান্তা বলিল, "রামলালবাবু কে, তাও জানেন না? লোহারপুরের জমিদার রামলাল রায়।" ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ তার নাম শুনেছি, সে তোমার কেউ হয় নাকি?" "না, কেউ হয় না, এমনি খুব ভাব আছে আমার সঙ্গে। প্রায়ই চিঠিপত্র চলে।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "রামলালবাবু লোকটি কেমন?" সবজান্তা

উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, ''চমৎকার লোক। যেমন চেহারা তেমনি কথাবার্তা, তেমনি কায়দা-দুরস্ত। এই আপনার চেয়ে প্রায় আধ হাত খানেক লম্বা হবেন, আর সেইরকম তাঁর তেজ! আমাকে তিনি কুস্তি শেখাবেন বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলেই ওটা বেশ রীতিমতো শিখে আসতাম।" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "বল কি হে? তোমার বয়স কত?" "আজ্ঞে, এইবার তেরো পূর্ণ হবে।" "বটে! বয়সের পক্ষে খুব চালাক তো! বেশ তো কথাবার্তা বলতে পার! কি নাম হে তোমার?" সবজান্তা বলিল, "দুলিরাম ঘোষ। রণদাবাবু ডেপুটি আমার মামা হন।" শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হইয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ছুটির পর আমরা সকলেই বাহির হইলাম। স্কুলের সম্মুখেই ডেপুটিবাবুর বাড়ি, তার বাহিরের বারান্দায় দেখি, সেই ভদ্রলোকটি বসিয়া দুলিরামের ডেপুটি-মামার সঙ্গে গল্প করিতেছে। দুলিরামকে দেখিয়াই মামা ডাক দিয়া বলিলেন— "দুলি, এদিকে আয়, এঁকে প্রণাম কর।—এটি আমার ভাগনে দুলিরাম।" ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এর পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।" দুলিরাম আমাদের দেখাইয়া খুব আড়ম্বর করিয়া ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন, ''কেমন? আমায় তো তুমি জানোই?'' দুলি বলিল, ''আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ স্কুলে দেখেছিলাম।'' ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, ''আমার পরিচয় জানো না বুঝি?'' সবজান্তা এবার আর 'জানি' বলিতে পারিল না, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু মুচকি মুচকি হাসিয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন, ''আমার নাম রামলাল রায়, লোহারপুরের রামলাল রায়।''

দুলিরাম খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখখানা লাল করিয়া হঠাৎ এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ছেলেরা রাস্তার উপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তার পরের দিন আমরা স্কুলে আসিয়া দেখিলাম— সবজান্তা আসে নাই, তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছে। নানা অজুহাতে সে দু-তিনদিন কামাই করিল, তারপর যেদিন স্কুলে আসিল, তখন তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারই কয়েকজন চেলা "কিহে, রামলালবাবুর চিঠিপত্র পেলে?" বলিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যতদিন সে স্কুলে ছিল, ততদিন তাহাকে খেপাইতে হইলে বেশি কিছু করা দরকার হইত না, একটিবার রামলালবাবুর খবর জিজ্ঞাসা করিলেই বেশ তামাশা দেখা যাইত।

ভোলানাথের সর্দারি

সকল বিষয়েই সর্দারি করিতে যাওয়া ভোলানাথের ভারি একটা বদ অভ্যাস। যেখানে তাহার কিছু বলিবার দরকার নাই, সেখানে সে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিতে যায়, যে কাজের সে কিছুমাত্র বোঝে না সে কাজেও সে চট্‌পট্‌ হাত লাগাইতে ছাড়ে না। সেদিন তাহার তিন ক্লাশ উপরের বড় বড় ছেলেরা যখন নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তখন ভোলানাথ মুরুব্বির মতো গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওয়েবস্টারের ডিক্‌সনারি সব চাইতে ভালো। আমার বড়দা যে দু'ভলুম ওয়েবস্টারের ডিক্‌সনারি কিনেছেন, তার এক-একখানা বই এত্তোখানি বড় আর এম্নি মোটা আর লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো।" উঁচু ক্লাশের একজন ছাত্র আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া বলিল, "কি রকম লাল হে? তোমার এই কানের মতো?" তবু ভোলানাথ এমন বেহায়া, সে তার পরদিনই সেই তাহাদেরই কাছে ফুটবল সম্বন্ধে কি যেন মতামত দিতে গিয়া এক চড় খাইয়া আসিল।

বিশুদের একটা ইঁদুর ধরিবার কল ছিল। ভোলানাথ হঠাৎ একদিন "এটা কিসের কল ভাই?" বলিয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া কলকব্জা এমন বিগড়াইয়া দিল যে, কলটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। বিশু বলিল, "না জেনে শুনে কেন টানাটানি করতে গেলি?" ভোলানাথ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আমার দোষ হল বুঝি? দেখ্‌ তো হাতলটা কিরকম বিচ্ছিরি বানিয়েছে। ওটা আরও অনেক মজবুত করা উচিত ছিল। কলওয়ালা ভয়ানক ঠকিয়েছে।"

ভোলানাথ পড়াশুনায় যে খুব ভালো ছিল তাহা নয়, কিন্তু মাস্টার মহাশয় যখন কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন সে জানুক আর না জানুক সাত তাড়াতাড়ি সকলের আগে জবাব দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। জবাবটা অনেক সময়েই বোকার মতো হইত, শুনিয়া মাস্টার মহাশয় ঠাট্টা করিতেন, ছেলেরা হাসিত; কিন্তু ভোলানাথের উৎসাহ তাহাতে কমিত না।

সেই যেবার ইস্কুলে বই চুরির হাঙ্গামা হয়, সেবারও সে এইরকম সর্দারি করিতে গিয়া খুব জব্দ হয়। হেডমাস্টার মহাশয় ক্রমাগত বই চুরির নালিশে বিরক্ত হইয়া, একদিন প্রত্যেক ক্লাশে গিয়া জিগ্‌গেস করিলেন, "কে চুরি করছে তোমরা কেউ কিছু জানো?" ভোলানাথের ক্লাশে এই প্রশ্ন করিবামাত্র ভোলানাথ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার বোধ হয় হরিদাস চুরি করে।" জবাব শুনিয়া আমরা সবাই অবাক হইয়া গেলাম। হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি করে জানলে যে হরিদাস চুরি করে?" ভোলানাথ অম্লানবদনে বলিল, "তা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়।" মাস্টার মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "জানো না, তবে অমন কথা বললে কেন? ও রকম মনে করবার তোমার কি কারণ আছে?" ভোলানাথ আবার বলিল, "আমার মনে হচ্ছিল, বোধহয় ও নেয়—তাই তো বললাম। আর তো কিছু আমি বলিনি।" মাস্টার মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "যাও, হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাও।" তখনই

তাহার কান ধরিয়া হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ানো হইল। কিন্তু তবু কি তাহার চেতনা হয়?

ভোলানাথ সাঁতার জানে না, কিন্তু তবু সে বাহাদুরি করিয়া হরিশের ভাইকে সাঁতার শিখাইতে গেল। রামবাবু হঠাৎ ঘাটে আসিয়া পড়েন, তাই রক্ষা। তা না হইলে দুজনকেই সেদিন ঘোষপুকুরে ডুবিয়া মরিতে হইত। কলিকাতায় মামার নিষেধ না শুনিয়া চল্‌তি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া ভোলানাথ কাদার উপর যে আছাড় খাইয়াছিল, তিন মাস পর্যন্ত তাহার আঁচড়ের দাগ তাহার নাকের উপর ছিল। আর বেদেরা শেয়াল ধরিবার জন্য যেবার ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেবার সেই ফাঁদ ঘাঁটিতে গিয়া ভোলানাথ কি রকম আটকা পড়িয়াছিল, সেকথা ভাবলে আজও আমাদের হাসি পায়। কিন্তু সব চাইতে যেবার সে জব্দ হইয়াছিল সেবারের কথা বলি শোনো।

আমাদের ইস্কুলে আসিতে হইলে কলেজবাড়ির পাশ দিয়া আসিতে হয়। সেখানে একটা ঘর আছে, তাহাকে বলে ল্যাবরেটরি। সেই ঘরে নানারকম অদ্ভুত কলকারখানা থাকিত। ভোলানাথের সবটাতেই বাড়াবাড়ি, সে একদিন একেবারে কলেজের ভিতর গিয়া দেখিল, একটা কলের চাকা ঘুরানো হইতেছে, আর কলের একদিকে চড়াক্ চড়াক্ করিয়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্ জ্বলিতেছে। দেখিয়া ভোলানাথের ভারি শখ হইল সেও একবার কল ঘুরাইয়া দেখে! কিন্তু কলের কাছে যাওয়া মাত্র, কে একজন তাহাকে এমন ধমক দিয়া উঠিল যে, ভয়ে এক দৌড়ে সে ইস্কুলে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু কলটা একবার নাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার কিছুতেই গেল না। একদিন বিকালে যখন সকলে বাড়ি যাইতেছি তখন ভোলানাথ যে কোন সময়ে কলেজবাড়িতে ঢুকিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সে চুপিচুপি কলেজ-বাড়ির ল্যাবরেটরি বা যন্ত্রখানায় ঢুকিয়া, অনেকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখে, ঘরে কেউ নাই। তখনই ভরসা করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে কলকব্জা দেখিতে লাগিল। সেই দিনের সেই কলটা আলমারির আড়ালে উঁচু তাকের উপর তোলা রহিয়াছে, সেখানে তাহার হাত যায় না। অনেক কষ্টে সে টেবিলের পিছন হইতে একখানা বড় চৌকি লইয়া আসিল। এদিকে কখন যে কলেজের কর্মচারী চাবি দিয়া ঘরের তালা আঁটিয়া চলিয়া গেল, সেও ভোলানাথকে দেখে নাই, ভোলানাথেরও সেদিকে চোখ নাই। চৌকির উপর দাঁড়াইয়া ভোলানাথ দেখিল কলটার কাছে একটা অদ্ভুত বোতল। সেটা যে বিদ্যুতের বোতল, ভোলানাথ তাহা জানে না। সে বোতলটাকে ধরিয়া সরাইয়া রাখিতে গেল। অমনি বোতলের বিদ্যুৎ হঠাৎ তাহার শরীরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গেল, মনে হইল যেন তাহার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কিসের একটা ধাক্কা লাগিল, সে মাথা ঘুরিয়া চৌকি হইতে পড়িয়া গেল।

বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া ভোলানাথ খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তারপর ব্যস্ত হইয়া পলাইতে গিয়া দেখে দরজা বন্ধ! অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়া, কিল ঘুঁষি লাথি মারিয়াও দরজা খুলিল না। জানালাগুলি অনেক উঁচুতে আর বাহির হইতে বন্ধ করা—চৌকিতে উঠিয়াও নাগাল পাওয়া গেল না। তাহার কপালে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল প্রাণপণে চীৎকার করা যাক, যদি কেউ শুনিতে পায়। কিন্তু তাহার গলার স্বর এমন বিকৃত শোনাইল, আর মস্ত ঘরটাতে এমন অদ্ভুত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল যে, নিজের আওয়াজে নিজেই সে ভয় পাইয়া গেল। ওদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলেজের বটগাছটির উপর হইতে একটা পেঁচা

হঠাৎ 'ভূত-ভূতুম-ভুত' বলিয়া বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে দাঁতে দাঁত লাগিয়া ভোলানাথ এক চীৎকারেই অজ্ঞান!

কলেজের দারোয়ান তখন আমাদের ইস্কুলের পাঁড়েজি আর দু-চারটি দেশ-ভাইয়ের সঙ্গে জুটিয়া মহা উৎসাহে 'হাঁ হাঁ রে কাঁহা গয়ো রাম' বলিয়া ঢোল কর্তাল পিটাইতেছিল, তাহারা কোনোরূপ চীৎকার শুনিতে পায় নাই। রাতদুপুর পর্যন্ত তাহাদের কীর্তনের হল্লা চলিল; সুতরাং জ্ঞান হইবার পর ভোলানাথ যখন দরজায় দুম্‌দুম্‌ লাথি মারিয়া চেঁচাইতেছিল, তখন সে শব্দ গানের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের কানে একটু-আধটু আসিলেও তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। পাঁড়েজি একবার খালি বলিয়াছিল, কিসের শব্দ একবার খোঁজ লওয়া যাক, তখন অন্যেরা বাধা দিয়া বলিয়াছিল, "আরে চিল্লানে দেও।" এমনি করিয়া রাত বারোটার সময় যখন তাহাদের উৎসাহ ঝিমাইয়া আসিল, তখন ভোলানাথের বাড়ির লোকেরা লণ্ঠন হাতে হাজির হইল। তাহারা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কোথাও তাহাকে আর খুঁজিতে বাকি রাখে নাই। দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একবাক্যে বলিল, 'ইস্কুল বাবুদের' কাহাকেও তাহারা দেখে নাই। এমন সময় সেই দুম্‌দুম্‌ শব্দ আর চীৎকার আবার শোনা গেল।

তারপর ভোলানাথের সন্ধান পাইতে আর বেশি দেরি হইল না। কিন্তু তখনও উদ্ধার নাই—দরজা বন্ধ, চাবি গোপালবাবুর কাছে, গোপালবাবু বাসায় নাই, ভাইজির বিবাহে গিয়াছেন, সোমবার আসিবেন। তখন অগত্যা মই আনাইয়া, জানালা খুলিয়া, সার্সির কাঁচ ভাঙিয়া, অনেক হাঙ্গামার পর ভয়ে মৃতপ্রায় ভোলানাথকে বাহির করা হইল। সে ওখানে কি করিতেছিল, কেন আসিয়াছিল, কেমন করিয়া আটকা পড়িল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার বাবা প্রকাণ্ড এক চড় তুলিতেছিলেন, কিন্তু ভোলানাথের ফ্যাকাশে মুখখানা দেখিবার পর সে চড় আর তাহার গালে নামে নাই।

নানাজনে জেরা করিয়া তাহার কাছে যে সমস্ত কথা আদায় করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াই আমরা তাহার আটকা পড়িবার বর্ণনাটা দিলাম। কিন্তু আমাদের কাছে এত কথা কবুল করে নাই। আমাদের সে আরও উল্টা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা করিয়াই বাহাদুরির জন্যে কলেজবাড়িতে রাত কাটাইবার চেষ্টায় ছিল। যখন সে দেখিল যে, তাহার সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না, বরং আসল কথাটা ক্রমেই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে, তখন সে এমন মুষড়াইয়া গেল যে, অন্তত মাস তিনেকের জন্য তাহার সর্দারির অভ্যাসটা বেশ একটু দমিয়া পড়িয়াছিল।

আশ্চর্য কবিতা

আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। সে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, "আমি পোইট্রি লিখতে পারি!" একথা শুনিয়া ক্লাশের অনেকেই অবাক হইয়া গেল; কেবল দুই-একজন হিংসা করিয়া বলিল, "আমরাও ছেলেবেলায় ঢের ঢের কবিতা লিখেছি।" নূতন ছাত্রটি বোধহয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে শুনিয়া ক্লাশে খুব হুলুস্থুল পড়িয়া যাইবে এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপভাবে, যাত্রার মতো সুর করিয়া একটা কবিতা আওড়াইতে লাগিল—

ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?
নীল নভোমণ্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
যদ্যপি থাকিত মম পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে নাহি শুনে মানা—

কবিতা শেষ হইতে না হইতে, ভবেশ তাহার মতো সুর করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

আহা, যদি থাক্‌ত তোমার
ল্যাজের উপর ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—
করত না কেউ মানা!

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, "দেখ বাপু, নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প শোনোনি বুঝি?" একজন ছেলে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, "শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফল! সে আবার কি গল্প?" অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল—

বৃক্ষ হতে দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশিল এক দ্রাক্ষা ক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে,
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য
'দ্রাক্ষা টক' বলিয়া পালাল ছেড়ে রাজ্য।

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে, একখানা আস্ত খাতা প্রায় ভরতি হইয়াছে আর আট-দশটি কবিতা হইলেই তাহার একশোটা পুরো হয়; তখন সে নাকি বই ছাপাইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হইল। গোপাল বলিয়া একটি ছেলে স্কুল ছাড়িয়া যাইবে এই উপলক্ষে শ্যামলাল এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে

'বিদায় বিদায়' বলিয়া অনেক 'অশ্রুজল' 'দুঃখশোক' ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "ফের যদি আমার নামে পোইট্রি লিখবি তো মারব এক থাপ্পড়।" হরেরাম বলিল, "আহা, বুঝলে না? তুমি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে।" গোপাল বলিল, "ছেড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, তোর তাতে কি রে? ফের জ্যাঠামি করবি তো তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেব।"

দেখিতে দেখিতে শ্যামলালের কথা ইস্কুলময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি আরও অনেকেই কবিতা লিখিতে শুরু করিল। ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে হইয়া নিচের ক্লাশের প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোট ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল। বড়দের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামলালের চেয়েও ভালো কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। ইস্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যেদিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া ইস্কুলের উঠানে দাপাদাপি করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া খানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিন ভারতবর্ষের বড় ম্যাপের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা বাহির হইল—

পাঁড়েজির ছাগলের একহাত দাড়ি,
অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি!
উঠানে দাপটি করি নেচেছিল কাল
তারপর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রঙটি কালো কিন্তু কবিতা পড়িয়া সে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনি তাহার নিচে একটা কড়া জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে—'রে অধম কাপুরুষ পাষণ্ড বর্বর—' এমন সময় গুরু গম্ভীর গলা শোনা গেল—"ম্যাপের উপর কি লেখা হচ্ছে?" ফিরিয়া দেখে হেডমাস্টার মহাশয়! শ্যামলাল একেবারে থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে স্যার, আগে ওরা লিখেছিল।" "ওরা কারা?" শ্যামলাল বোকার মতো একবার আমাদের দিকে, একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না। মাস্টার মহাশয় আবার বলিলেন, "ওরা যদি পরের বাড়ি সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে?" যাহা হউক সেদিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক-ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

ইহার মধ্যে একদিন আমাদের পণ্ডিতমহাশয় গল্প করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে যাহারা এক ক্লাশে পড়িত, তাহাদের মধ্যে একজন নাকি অতি সুন্দর কবিতা লিখিত। একবার ইন্‌স্পেকটার ইস্কুল দেখিতে আসিয়া, তাহার কবিতা শুনিয়া এমন খুশি হইয়াছিলেন যে, তাহাকে একটা সুন্দর ছবিওয়ালা বই উপহার দিয়াছিলেন।

ইহার মাসখানেক পরেই ইন্‌স্পেকটার ইস্কুল দেখিতে আসিলেন। প্রায় বিশ-পঁচিশটি ছেলে সাবধানে পকেটের মধ্যে লুকাইয়া কবিতার কাগজ আনিয়াছে। বড় হলের মধ্যে সমস্ত ইস্কুলের ছেলেদের দাঁড় করানো হইয়াছে, হেডমাস্টার মহাশয় ইন্‌স্পেকটারকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন—এমন সময় শ্যামলাল আস্তে আস্তে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিল। আর যায় কোথা! পাছে শ্যামলাল আগেই তাহার কবিতা পড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে ছোট বড় একদল কবিতাওয়ালা একসঙ্গে নানাসুরে চীৎকার করিয়া যে যার কবিতা হাঁকিয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত বাড়িটা কর্তালের মতো ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, ইন্‌স্পেকটার মহাশয় মাথা ঘুরিয়া মাঝ পথেই মেঝের

উপর বসিয়া পড়িলেন। ছাদের উপরে একটা বিড়াল ঘুমাইতেছিল, সেটা হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া তিনতলা হইতে পড়িয়া গেল, ইস্কুলের দারোয়ান হইতে আফিসের কেশিয়ার বাবু পর্যন্ত হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে সুস্থ হইলে পর মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "এত চেঁচালে কেন?" সকলে চুপ করিয়া রহিল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, "কে কে চেঁচিয়েছিল?" পাঁচ-সাতটি ছেলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"শ্যামলাল।" শ্যামলাল যে একা অত মারাত্মক রকম চেঁচাইতে পারে, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। যতগুলি ছেলের পকেটে কবিতার খাতা পাওয়া গেল, স্কুলের পর তাহাদের দেড়ঘণ্টা আটকাইয়া রাখা হইল।

অনেক তম্বিতম্বার পর একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তখন হেড-মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কবিতা লেখার রোগ হয়েছে? ও রোগের ওষুধ কি?" বৃদ্ধ পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "বিষস্য বিষমৌষধম্, বিষের ওষুধ বিষ। বসন্তের ওষুধ যেমন বসন্তের টিকা, কবিতার ওষুধ তস্য টিকা। তোমরা যে যে কবিতা লিখেছ তার টিকা করে দিচ্ছি। তোমরা এক মাস প্রতিদিন পঞ্চাশ বার করে এটা লিখে এনে স্কুলে আমায় দেখাবে।" এই বলিয়া তিনি টিকা দিলেন—

পদে পদে মিল খুঁজে, গুণে দেখি চোদ্দ
এই দেখ লিখে দিনু কি ভীষণ পদ্য!
এক চোটে এইবারে উড়ে গেল সবি তা,
কবিতার গুঁতো মেরে গিলে ফেলি কবিতা।

একমাস তিনি কবিদের কাছে এই লেখা প্রতিদিন পঞ্চাশবার আদায় না করিয়া ছাড়িলেন না। এ কবিতার কি আশ্চর্য গুণ—তারপর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।

নন্দলালের মন্দ কপাল

নন্দলালের ভারি রাগ, অঙ্কের পরীক্ষায় মাস্টার তাহাকে গোল্লা দিয়াছেন। সে যে খুব ভালো লিখিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তা বলিয়া একেবারে গোল্লা দেওয়া কি উচিত ছিল? হাজার হোক সে একখানা পুরা খাতা লিখিয়াছিল তো! তার পরিশ্রমের কি কোনো মূল্য নাই? ঐ যে ত্রৈরাশিকের অংকটা, সেটা তো তার প্রায় ঠিকই হইয়াছিল, কেবল একটুখানি হিসেবের ভুল হওয়াতে উত্তরটা ঠিক মেলে নাই। আর ঐ যে একটা ডেসিমাল্-এর অঙ্ক ছিল, সেটাতে গুণ করিতে গিয়া সে ভাগ করিয়া বসিয়াছিল, তাই বলিয়া কি একটা নম্বরও দিতে নাই? আরও অন্যায় এই যে, এই কথাটা মাস্টার মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের কাছে ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন। কেন? আর একবার হরিদাস যখন গোল্লা পাইয়াছিল, তখন তো সে কথাটা রাষ্ট্র হয় নাই!

সে যে ইতিহাসে একশোর মধ্যে পঁচাশি পাইয়াছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? খালি অংক ভালো পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে? সব বিষয়ে যে সকলকে ভালো পারিতে হইবে, তাহারই বা অর্থ কি? স্বয়ং নেপোলিয়ান যে ছেলেবেলায় ব্যাকরণে একেবারে আনাড়ী ছিলেন, সে বেলা কি? তাহার এই যুক্তিতে ছেলেরা দমিল না, এবং মাস্টারদের কাছে এই তর্কটা তোলাতে তাঁহারাও যে যুক্তিটাকে খুব চমৎকার ভাবিলেন, এমন তো বোধ হইল না। তখন নন্দলাল বলিল, তাহার কপালই মন্দ—সে নাকি বরাবর তাহা দেখিয়া আসিতেছে।

সেই তো যেবার ছুটির আগে তাহাদের পাড়ায় হাম দেখা দিয়াছিল, তখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই হামে ভুগিয়া দিব্যি মজা করিয়া স্কুল কামাই করিল, কেবল বেচারা নন্দলালকেই নিয়মমতো প্রতিদিন স্কুলে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। তারপর যেমন ছুটি আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকে জ্বরে আর হামে ধরিল—ছুটির অর্ধেকটাই মাটি! সেই যেবার সে মামার বাড়ি গিয়াছিল, সেবার তাহার মামাতো ভাইয়েরা কেহ বাড়ি ছিল না—ছিলেন কোথাকার এক বদমেজাজি মেশো, তিনি উঠিতে বসিতে কেবল ধমক আর শাসন ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তাহার উপর সেবার এমন বৃষ্টি হইয়াছিল, একদিনও ভালো করিয়া খেলা জমিল না, কোথাও বেড়ানো গেল না। সেই জন্য পরের বছর যখন আর সকলে মামার বাড়ি গেল তখন সে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। পরে শুনিল সেবার নাকি সেখানে চমৎকার মেলা বসিয়াছিল, কোন রাজার দলের সঙ্গে পঁচিশটা হাতি আসিয়াছিল, আর বাজি যা পোড়ানো হইয়াছিল সে একেবারে আশ্চর্য রকম! নন্দলালের ছোট ভাই যখন বার বার উৎসাহ করিয়া তাহার কাছে এই সকলের বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন নন্দ তাহাকে এক চড় মারিয়া বলিল, "যা যা! মেলা বক্‌বক্ করিসনে!" তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, সেবার সে মামার বাড়ি গিয়াও ঠকিল, এবার না গিয়াও ঠকিল! তাহার মতো কপাল-মন্দ আর কেহ নাই।

স্কুলেও ঠিক তাই। সে অঙ্ক পারে না—অথচ অঙ্কের জন্য দুই-দুইটা প্রাইজ আছে—এদিকে ভূগোল ইতিহাস তাহার কণ্ঠস্থ কিন্তু ঐ দুইটার একটাতেও প্রাইজ নাই। অবশ্য সংস্কৃতেও সে নেহাত কাঁচা নয়, ধাতু প্রত্যয় বিভক্তি সব চট্‌পট্ মুখস্থ

করিয়া ফেলে—চেষ্টা করিলে কি পড়ার বই আর অর্থ-পুস্তকটাকে সড়গড় করিতে পারে না? ক্লাশের মধ্যে খুদিরাম একটু-আধটু সংস্কৃত জানে—কিন্তু তাহা তো বেশি নয়। নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে হারাইতে পারে না? নন্দ জেদ করিয়া স্থির করিল, 'একবার খুদিরামকে দেখে নেব। ছোকরা এ বছর সংস্কৃতের প্রাইজ পেয়ে ভারি দেমাক করছে—আবার অঙ্কের গোল্লার জন্য আমাকে খোঁটা দিতে এসেছিল। আচ্ছা, এবার দেখা যাবে।'

নন্দলাল কাহাকেও না জানাইয়া সেইদিন হইতেই বাড়িতে ভয়ানক ভাবে পড়িতে শুরু করিল। ভোরে উঠিয়াই সে 'হসতি হসত হসন্তি' শুরু করে, রাত্রেও 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু' বলিয়া চুলিতে থাকে। কিন্তু ক্লাশের ছেলেরা এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানে না। পণ্ডিত মহাশয় যখন ক্লাশে প্রশ্ন করেন, তখন মাঝে মাঝে উত্তর জানিয়াও সে চুপ করিয়া মাথা চুলকাইতে থাকে, এমন কি কখনো ইচ্ছা করিয়া দু-একটা ভুল বলে, পাছে খুদিরাম তার পড়ার খবর টের পাইয়া আরও বেশি করিয়া পড়ায় মন দিতে থাকে। তাহার ভুল উত্তর শুনিয়া খুদিরাম মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, নন্দলাল তাহার কোনো জবাব দেয় না, কেবল খুদিরাম নিজে যখন এক-একটা ভুল করে, তখন সে মুচকি মুচকি হাসে, আর ভাবে, 'পরীক্ষার সময় অমনি ভুল করলেই এবার আর ওঁকে সংস্কৃতের প্রাইজ পেতে হবে না।'

ওদিকে ইতিহাসের ক্লাশে নন্দলালের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। কারণ, ইতিহাস আর ভূগোল নাকি এক রকম করিয়া শিখিলেই পাশ করা যায়—তাহার জন্য নন্দর কোনো ভাবনা নাই। তাহার সমস্ত মনটা রহিয়াছে ঐ সংস্কৃত পড়ার উপরে—অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রাইজটার উপরে! একদিন মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি হে নন্দলাল, আজকাল বুঝি বাড়িতে কিছু পড়াশুনা কর না? সব বিষয়েই যে তোমার এমন দুর্দশা হচ্ছে তার অর্থ কি?" নন্দ আর একটু হইলেই বলিয়া ফেলিত 'আজ্ঞে সংস্কৃত পড়ি', কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ সামলাইয়া "আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়" বলিয়াই সে থতমত খাইয়া গেল। খুদিরাম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কৈ! সংস্কৃতও তো কিছু পারে না।" শুনিয়া ক্লাশসুদ্ধ ছেলে হাসিতে লাগিল। নন্দ একটু অপ্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাগ্যিস্ তাহার সংস্কৃত পড়ার কথাটা ফাঁস হইয়া যায় নাই।

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া আসিল, পরীক্ষার সময় প্রায় উপস্থিত। সকলে পড়ার কথা, পরীক্ষার কথা আর প্রাইজের কথা বলাবলি করিতেছে, এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে! নন্দ এবার কোন প্রাইজটা নিচ্ছ?" খুদিরাম নন্দর মতো গলা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে সংস্কৃত, না সংস্কৃত নয়।" সকলে হাসিল, নন্দও খুব উৎসাহ করিয়া সেই হাসিতে যোগ দিল। মনে ভাবিল, 'বাছাধন, এ হাসি আর তোমার মুখে বেশি দিন থাকছে না।'

যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং যথাসময়ে শেষ হইল। পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সকলে আগ্রহ করিয়া আছে, নন্দও রোজ নোটিশবোর্ডে গিয়া দেখে, তাহার নামে সংস্কৃত প্রাইজ পাওয়ার কোনো বিজ্ঞাপন আছে কিনা। তারপর একদিন হেডমাস্টার মহাশয় এক তাড়া কাগজ লইয়া ক্লাশে আসিলেন, আসিয়াই তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এবার দু-একটা নতুন প্রাইজ হয়েছে আর অন্য অন্য বিষয়েও কোনো কোনো পরিবর্তন হয়েছে।" এই বলিয়া তিনি পরীক্ষার ফলাফল পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে দেখা গেল, ইতিহাসের জন্য কে যেন একটা রুপার মেডেল দিয়াছেন। খুদিরাম

ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে, সে-ই ঐ মেডেলটা লইবে। সংস্কৃতে নন্দ প্রথম, খুদিরাম দ্বিতীয়—কিন্তু এবার সংস্কৃতে কোনো প্রাইজ নাই!

হায় হায়! নন্দর অবস্থা তখন শোচনীয়। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া খুদিরামকে কয়েকটা ঘুঁষি লাগাইয়া দেয়। কে জানিত এবার ইতিহাসের জন্য প্রাইজ থাকিবে, আর সংস্কৃতের জন্য থাকিবে না। ইতিহাসের মেডেলটা তো সে অনায়াসেই পাইতে পারিত। কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কেহ বুঝিল না—সবাই বলিল, "বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে—কেমন করে ফাঁকি দিয়ে নম্বর পেয়েছে।'' নন্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, ''কপাল মন্দ!''

নতুন পণ্ডিত

আগে যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি লোক বড় ভালো। মাঝে মাঝে আমাদের যে ধমক-ধামক না করিতেন তাহা নয়, কিন্তু কখনও কাহাকেও অন্যায় শাস্তি দেন নাই। এমন কি ক্লাশে আমরা কত সময় গোল করিতাম, তিনি মাঝে মাঝে 'আঃ' বলিয়া ধমক দিতেন। তাঁর হাতে একটা ছড়ি থাকিত, খুব বেশি রাগ করিলেই সেই ছড়িটাকে টেবিলের উপর আছড়াইতেন—সেটাকে কোনো দিন কাহারও পিঠে পড়িতে দেখি নাই। তাই আমরা কেউ তাঁহাকে মানিতাম না।

আমাদের হেডমাস্টার মশাইটি দেখিতে তাঁর চাইতেও নিরীহ ভালোমানুষ। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, গোঁফ দাড়ি কামানো, গোলগাল মুখ, তাহাতে সর্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। কিন্তু চেহারায় কি হয়? তিনি যদি 'শ্যামাচরণ কার নাম?' বলিয়া ক্লাশে আসিয়াই আমায় ডাক দিতেন, তবে তাঁর গলার আওয়াজেই আমার হাত পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত। তাঁর হাতে কোনো দিন বেত দেখি নাই, কারণ বেতের কোনো দরকার হইত না—তাঁর হুংকারটি যার উপর পড়িত সেই চক্ষে অন্ধকার দেখিত।

একদিন পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "সোমবার থেকে আমি আর পড়াতে আসব না—কিছু দিনের ছুটি নিয়েছি। আমার জায়গায় আর একজন আসবেন। দেখিস তাঁর ক্লাশে তোরা যেন গোল করিস্‌নে।" শুনিয়া আমাদের ভারি উৎসাহ লাগিল; তারপর যে কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় স্কুলে ছিলেন, আমরা ক্লাশে এক মিনিটও পড়ি নাই। একদিন বেহারীলাল পড়ার সময় পড়িয়াছিল, সেজন্য আমরা পরে চাঁদা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, পণ্ডিতমহাশয় সোমবার আর আসিলেন না—তাঁর বদলে যিনি আসিলেন তাঁর গোল কালো চশমা, মুখভরা গোঁফের জঙ্গল আর বাঘের মতো আওয়াজ শুনিয়া আমাদের উৎসাহ দমিয়া গেল। তিনি ক্লাশে আসিয়াই বলিলেন, "পড়ার সময় কথা বলবে না, হাসবে না, যা বলব তাই করবে। রোজকার পড়া রোজ করবে। আর যদি তা না কর, তা হলে তুলে আছাড় দেব।" শুনিয়া আমাদের তো চক্ষু স্থির!

ফকিরচাঁদের তখন অসুখ ছিল, সে বেচারা কদিন পরে ক্লাশে আসিতেই নূতন পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। ফকির থতমত খাইয়া ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে—আমি ইস্কুলে আসিনি—" পণ্ডিতমহাশয় রাগিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে আসনি তো কোথায় এসেছ? তোমার মামার বাড়ি?" বেচারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "সাতদিন ইস্কুলে আসিনি, কি করে পড়া বলব?" পণ্ডিতমহাশয় "চোপরাও বেয়াদব—মুখের উপর মুখ" বলিয়া এমন ভয়ানক গর্জন করিয়া উঠিলেন যে ভয়ে ক্লাশ সুদ্ধ ছেলের মুখের তালু শুকাইয়া গেল।

আমাদের হরিপ্রসন্ন অতি ভালো ছেলে। সে একদিন ইস্কুলের অফিসে গিয়া খবর পাইল—সে নাকি এবার কি একটা প্রাইজ পাইবে। খবরটা শুনিয়া বেচারা ভারি খুশি হইয়া ক্লাশে আসিতেছিল, এমন সময় নূতন পণ্ডিতমহাশয় "হাসছ কেন" বলিয়া হঠাৎ

এমন ধমক দিয়া উঠিলেন যে মুখের হাসি এক মুহূর্তে আকাশে উড়িয়া গেল। তাহার পরদিন আমাদের ক্লাশের বাহিরে রাস্তার ধারে কে যেন হো হো করিয়া হাসিতেছিল, শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া আর কথাবার্তা নাই—"কেবল হাসি?" বলিয়া হরিপ্রসন্নর গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক চড় লাগাইয়া, আবার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি হরিপ্রসন্নর উপর তিনি বিনা কারণে যখন তখন খাপ্পা হইয়া উঠিতেন।

দেখিতে দেখিতে ইস্কুল সুদ্ধ ছেলে নূতন পণ্ডিতের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। একদিন আমাদের অঙ্কের মাস্টার আসেন নাই, হেডমাস্টার রামবাবু বলিয়া গেলেন—তোমরা ক্লাশে বসিয়া পুরাতন পড়া পড়িতে থাক। আমরা পড়িতে লাগিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই পণ্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে "পড়ছ না কেন?" বলিয়া টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুঁষি মারিলেন। আমরা বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ছি তো।" তিনি আবার বলিলেন, "তবে শুনতে পাচ্ছি না কেন, চেঁচিয়ে পড়।" যেই বলা অমনি বোকা ফকিরচাঁদ

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—'

বলিয়া এমন চেঁচাইয়া উঠিল যে, পণ্ডিতমহাশয়ের চোখ হইতে চশমাটা পড়িয়া গেল। মাস্টার মহাশয় গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন, তারপর কেন জানি না হরিপ্রসন্নর কানে ধরিয়া তাহাকে সমস্ত স্কুল ঘুরাইয়া আনিলেন, তাহাকে তিনদিন ক্লাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হুকুম দিলেন, একটানা জরিমানা করিলেন, তাহার কালো কোটের পিঠে খড়ি দিয়া 'বাঁদর' লিখিয়া দিলেন, আর ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিলেন।

পরদিন রামবাবু হরিপ্রসন্নকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তার কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের ক্লাশে খোঁজ করিতে আসিলেন। তখন ফকিরচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে হরে চেঁচায়নি, আমি চেঁচিয়েছি।" রামবাবু বলিলেন, "পণ্ডিতমশাইকে পাতকী বলিয়া কি গালাগালি করিয়াছিলে?" ফকির বলিল, "পণ্ডিতমশাইকে কিছুই বলিনি, আমি পড়ছিলাম—

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—

এই সময় নূতন পণ্ডিতমহাশয় ক্লাশের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বোধ হয় শেষ কথাটুকু শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া কিছু একটা ঠাট্টা করা হইয়াছে। তিনি রাগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া হাঁ হাঁ করিয়া ক্লাশের মধ্যে আসিয়া রামবাবুর কালো কোট দেখিয়াই "তবে রে হরিপ্রসন্ন" বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয়কে পিটাইতে লাগিলেন। আমরা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিলাম। হেডমাস্টার মহাশয় অনেক কষ্টে পণ্ডিতের হাত ছাড়াইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন যদি পণ্ডিতের মুখ দেখিতে! বেচারা ভয়ে একেবারে জুজু! তিন-চারবার হাঁ করিয়া আবার মুখ বুজিলেন, তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া এক দৌড়ে সেই যে ইস্কুল হইতে পালাইয়া গেলেন, আর কোনো দিন তাঁকে ইস্কুলে আসিতে দেখি নাই।

দুইদিন পরে পুরাতন পণ্ডিতমহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁর মুখ দেখিয়া আমাদের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল, আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর তাঁর ক্লাশে গোলমাল করিব না, যতই পড়া দিন না কেন, খুব ভালো করিয়া পড়িব।

সবজান্তা দাদা

"এই দ্যাখ্ টেঁপি, দ্যাখ্ কি রকম করে হাউই ছাড়তে হয়। বড় যে রাজুমামাকে ডাকতে চাচ্ছিলি? কেন, রাজুমামা না হলে বুঝি হাউই ছোটানো যায় না? এই দ্যাখ্।"

দাদার বয়স প্রায় বছর দশেক হবে, টেঁপির বয়স মোটে আট, অন্য অন্য ভাইবোনেরা আরও ছোট। সুতরাং দাদার দাদাগিরির আর অন্ত নেই! দাদাকে হাউই ছাড়তে দেখে টেঁপির বেশ একটু ভয় হয়েছিল, পাছে দাদা হাউইয়ের তেজে উড়ে যায়, কি পুড়ে যায়, কিম্বা সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যায়। কিন্তু দাদার ভরসা দেখে তারও একটু ভরসা হল।

দাদা হাউইটিকে হাতে নিয়ে, একটুখানি বাঁকিয়ে ধরে বিজ্ঞের মতো বলতে লাগল, "এই সল্তের মতো দেখছিস, এইখানে আগুন ধরাতে হয়। সল্তেটা জ্বলতে জ্বলতে যেই হাউই ভস্ ভস্ করে ওঠে অমনি ঠিক সময়টি বুঝে—এই এম্নি করে হাউইটিকে ছেড়ে দিতে হয়। এইখানেই হচ্ছে আসল বাহাদুরি। কাল দেখলি তো, প্রকাশটা কি রকম আনাড়ীর মতো করছিল। হাউই জ্বলতে না জ্বলতে ফস করে ছেড়ে দিচ্ছিল। সেইজন্যই হাউইগুলো আকাশের দিকে না উঠে নিচু হয়ে এদিক সেদিক বেঁকে যাচ্ছিল।"

এই বলে সবজান্তা দাদা একটি দেশলাইয়ের কাঠি ধরালেন। ভাইবোনেরা সব অবাক হয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল। দেশলাইয়ের আগুনটি সল্তের কাছে নিয়ে দাদা ঘাড় বাঁকিয়ে, মুচকি হেসে আর একবার টেঁপিদের দিকে তাকালেন। ভাবখানা এই যে, আমি থাকতে রাজুমামা-ফাজুমামার দরকার কি?

—ফ্যাঁস্—ফোঁস্—ছর্র্র্—! এত শিগ্গির যে হাউইয়ে আগুন ধরে যায় সেটা দাদার খেয়ালেই ছিল না, দাদা তখনো ঘাড় বাঁকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে নিজের বাহাদুরির কথা ভাবছেন। কিন্তু হাসিটি না ফুরাতেই হাউই যখন ফ্যাঁস্ করে উঠল তখন সেই সঙ্গে দাদার মুখ থেকেও হাঁউ-মাউ গোছের একটা বিকট শব্দ আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। আর তার পরেই দাদা যে একটি লম্ফ দিলেন, তার ফলে দেখা গেল যে ছাতের মাঝখানে চিৎপাত হয়ে অত্যন্ত আনাড়ীর মতো তিনি হাত পা ছুঁড়ছেন। কিন্তু তা দেখবার অবসর টেঁপিদের হয়নি। কারণ দাদার চীৎকার আর লম্ফঝম্পের সঙ্গে সঙ্গে তারাও কান্নার সুর চড়িয়ে বাড়ির ভিতরদিকে রওনা হয়েছিল।

কান্না-টান্না থামলে পর রাজুমামা যখন দাদার কান ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে এলেন, তখন দেখা গেল যে, দাদার হাতের কাছে ফোস্কা পড়ে গেছে আর গায়ের দু-তিন জায়গায় পোড়ার দাগ লেগেছে। কিন্তু তার জন্য দাদার তত দুঃখ নেই, তার আসল দুঃখ এই যে, টেঁপির কাছে তার বিদ্যেটা এমন অন্যায়ভাবে ফাঁস হয়ে গেল। রাজুমামা চলে যেতেই সে হাতে মলম মাখতে মাখতে বলতে লাগল, কোথাকার কোন বাজে দোকান থেকে হাউই কিনে এনেছে—ভালো করে মশলা মেশাতেও জানে না। বিষ্টু পাঠকের দোকান থেকে হাউই আনলেই হত। বার বার বলছি—রাজুমামা হাউই চেনে না, তবু তাকেই দেবে হাউই কিনতে! তারপর সে টেঁপিকে আর ভোলা, ময়না আর খুক্নুকে বেশ করে বুঝিয়ে দিল যে, সে যে চেঁচিয়েছিল আর লাফ দিয়েছিল, সেটা ভয়ে নয়, হঠাৎ ফুর্তির চোটে!

যতীনের জুতো

যতীনের নতুন জুতো কিনে এনে তার বাবা বললেন, ''এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট কর তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।''

যতীনের চটি লাগে প্রতিমাসে একজোড়া। ধুতি তার দুদিন যেতে না যেতেই ছিঁড়ে যায়। কোনো জিনিসে তার যত্ন নেই। বইগুলো সব মলাট ছেঁড়া, কোণ দুমড়ান, শ্লেটটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ফাটা। শ্লেটের পেন্সিলগুলি সর্বদাই তার হাত থেকে পড়ে যায়, কাজেই ছোট ছোট টুক্‌রো টুক্‌রো। আরেকটা তার মন্দ অভ্যাস ছিল, লেড্‌পেন্‌সিলের গোড়া চিবানো। চিবিয়ে চিবিয়ে তার পেন্‌সিলের কাঠটা বাদামের খোলার মতো খেয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে ক্লাশের মাস্টার মশাই বলতেন, ''তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাও না?''

নতুন চটি পায়ে দিয়ে প্রথম দিন যতীন খুব সাবধানে রইল, পাছে ছিঁড়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামে, চৌকাঠ ডিঙোবার সময় সাবধানে থাকে, যাতে না ঠোক্কর খায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দুদিন পরে আবার যেই সেই। চটির মায়া ছেড়ে দুড়্ দুড়্ করে সিঁড়ি নামা, যেতে যেতে দশবার হোঁচট খাওয়া, সব আরম্ভ হল। কাজেই এক মাস যেতে না যেতে চটির একটা পাশ একটু হাঁ করল। মা বললেন, ''ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা, না হলে একেবারে যাবে।'' কিন্তু মুচি আর ডাকা হয় না। চটির হাঁ-ও বেড়ে চলে।

একটি জিনিসের যতীন খুব যত্ন করত। সেটি হচ্ছে তার ঘুড়ি। যে ঘুড়িটি তার মনে লাগত সেটিকে সে সযত্নে জোড়াতাড়া দিয়ে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখত। খেলার সময়টা সে প্রায় ঘুড়ি উড়িয়েই কাটিয়ে দিত। এই ঘুড়ির জন্য কত সময়ে তাকে তাড়া খেতে হত। ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে সে রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাত করত তার আঠা চাই বলে। ঘুড়ির লেজ লাগাতে কিংবা সুতো কাটতে কাঁচি দরকার হলে সে মায়ের সেলাইয়ের বাক্স ঘেঁটে ঘণ্ট করে রেখে দিত। ঘুড়ি উড়াতে আরম্ভ করলে তার খাওয়া-দাওয়া মনে থাকত না। সেদিন যতীন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে ভয়ে ভয়ে। গাছে চড়তে গিয়ে তার নতুন কাপড়-খানা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। বই রেখে চটি পায়ে দিতে গিয়ে দেখে, চটিটা এত ছিঁড়ে গেছে যে আর পরাই মুশকিল। কিন্তু সিঁড়ি নামবার সময় তার সে কথা মনে রইল না, সে দু-তিন সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নামতে লাগল। শেষে তাতে চটির হাঁ বেড়ে বেড়ে, সমস্ত দাঁত বের করে ভেংচাতে লাগল। যেমনি সে শেষ তিনটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়েছে, অমনি মাটিটা তার পায়ের নিচ থেকে সুড়ুৎ করে সরে গেল, আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে সাঁই সাঁই করে শূন্যের উপর দিয়ে কোথায় যে ছুটে চলল তার ঠিকঠিকানা নেই।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চটি যখন থামল, তখন যতীন দেখল সে কোন অচেনা দেশে এসে পড়েছে। সেখানে চারদিকে অনেক মুচি বসে আছে। তারা যতীনকে দেখে কাছে এল, তারপর তার পা থেকে ছেঁড়া চটিজোড়া খুলে নিয়ে সেগুলোকে

যত্ন করে ঝাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একজন মাতব্বর গোছের, সে যতীনকে বলল, ''তুমি দেখছি ভারি দুষ্টু। জুতোজোড়ার এমন দশা করেছ? দেখ দেখি, আর একটু হলে বেচারিদের প্রাণ বেরিয়ে যেত!'' যতীনের ততক্ষণে একটু সাহস হয়েছে। সে বলল, "জুতোর আবার প্রাণ থাকে নাকি?" মুচিরা বলল, "তা না তো কি? তোমরা বুঝি মনে কর, তোমরা যখন জুতো পায়ে দিয়ে জোরে জোরে হাঁটো তখন ওদের লাগে না? খুব লাগে। লাগে বলেই তো ওরা মচ্‌মচ্‌ করে। যখন তুমি চটি পায়ে দিয়ে দুড়্‌দুড়্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছিলে আর তোমার পায়ের চাপে ওর পাশ কেটে গিয়েছিল, তখন কি ওর লাগেনি? খুব লেগেছিল। সেইজন্যই ও তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। যত রাজ্যের ছেলেদের জিনিসপত্রের ভার আমাদের উপর। তারা সে সবের অযত্ন করলে আমরা তাদের শিক্ষা দিই।" মুচি যতীনের হাতে ছেঁড়া চটি দিয়ে বলল, "নাও, সেলাই কর।" যতীন রেগে বলল, "আমি জুতো সেলাই করি না, মুচিরা করে।" মুচি একটু হেসে বলল, "একি তোমাদের দেশ পেয়েছ যে করব না বললেই হল? এই ছুঁচ সুতো নাও, সেলাই কর।" যতীনের রাগ তখন কমে এসেছে, তার মনে ভয় হয়েছে। সে বলল, "আমি জুতো সেলাই করতে জানি না।" মুচি বলল, "আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেলাই তোমাকে করতেই হবে।" যতীন ভয়ে ভয়ে জুতো সেলাই করতে বসল। তার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল, ঘাড় নিচু করে থেকে থেকে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, অনেক কষ্টে সারাদিনে একপাটি চটি সেলাই হল। তখন সে মুচিকে বলল, "কাল অন্যটা করব। এখন খিদে পেয়েছে।" মুচি বলল, "সে কি! সব কাজ শেষ না করে তুমি খেতেও পাবে না, ঘুমোতেও পাবে না। একপাটি চটি এখনও বাকি আছে। তারপর তোমাকে আস্তে আস্তে চলতে শিখতে হবে, যেন আর কোনো জুতোর উপর অত্যাচার না কর। তারপর দরজীর কাছে গিয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে হবে। তারপর আরো কি কি জিনিস নষ্ট করেছ দেখা যাবে।"

যতীনের তখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। সে কাঁদতে কাঁদতে কোনো রকমে অন্য চটিটা সেলাই করল। ভাগ্যে এ পাটি বেশি ছেঁড়া ছিল না। তখন মুচিরা তাকে একটা পাঁচতলা উঁচু বাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সে বাড়িতে একটা সিঁড়ি বরাবর একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তারা যতীনকে সেই সিঁড়ির নিচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, ''যাও, একেবারে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে যাও, আবার নেমে এস। দেখো, আস্তে আস্তে একটি একটি সিঁড়ি করে উঠবে নামবে।'' যতীন পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়ে নেমে এল। সে নিচে আসলে মুচিরা বলল, "হয়নি। তুমি তিনবার দুটো সিঁড়ি এক সঙ্গে উঠেছ, পাঁচবার লাফিয়েছ, দুবার তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়েছ। আবার ওঠ। মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙোবে না।'' এতটা সিঁড়ি উঠে নেমে যতীন বেচারীর পা টনটন করছিল। সে এবার আস্তে আস্তে উপরে উঠল, আস্তে আস্তে নেমে এল। তারা বলল, ''আচ্ছা, এবার মন্দ হয়নি। তাহলে চল দরজীর কাছে।''

এই বলে তারা তাকে আর একটা মাঠে নিয়ে গেল, সেখানে খালি দরজীরা বসে সেলাই করছে। যতীনকে দেখেই তারা কাছে এসে জিগ্‌গেস করল, ''কি? কি ছিঁড়েছ?'' মুচিরা উত্তর দিল, ''নতুন ধুতিটা, দেখ কতটা ছিঁড়ে ফেলেছে।'' দরজীরা মাথা নেড়ে বলল, "বড় অন্যায়, বড় অন্যায়! শিগ্‌গির সেলাই কর।" যতীনের আর 'না' বলবার সাহস হল না। সে ছুঁচ-সুতো নিয়ে ছেঁড়া কাপড় জুড়তে বসে

গেল। সবে মাত্র দু-এক ফোঁড় দিয়েছে অমনি দরজীরা চেঁচিয়ে উঠল, "ওকে কি সেলাই বলে? খোল, খোল।" অমনি করে, বেচারি যতবার সেলাই করে, ততবার তারা বলে, "খোল, খোল।" শেষে সে একেবারে কেঁদে ফেলল, বলল "আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, আমি আর কখখনো কাপড় ছিঁড়ব না, ছাতা ছিঁড়ব না।" তাতে দরজীরা হাসতে হাসতে বলল, "খিদে পেয়েছে? তা তোমার খাবার জিনিস তো আমাদের কাছে ঢের আছে।" এই বলে তারা তাদের কাপড়ে দাগ দেবার পেন্‌সিল কতগুলো এনে দিল। "তুমি তো পেন্‌সিল চিবোতে ভালোবাস, এইগুলো চিবিয়ে খাও, আর কিছু আমাদের কাছে নেই।"

এই বলে তারা যার যার কাজে চলে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যতীন কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এমন সময় আকাশে বোঁ বোঁ করে কিসের শব্দ হল, আর যতীনের তালি-দেওয়া সাধের ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে এসে তার কোলের উপর পড়ল। ঘুড়িটা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। শিগ্‌গির আমার লেজটা ধর।" যতীন তাড়াতাড়ি ঘুড়ির লেজ ধরল। ঘুড়িটা অমনি তাকে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠে গেল। সেই শব্দ শুনে দরজীরা বড় বড় কাঁচি নিয়ে ছুটে এল ঘুড়ির সুতোটা কেটে দিতে। হঠাৎ ঘুড়ি আর যতীন জড়াজড়ি করে নিচের দিকে পড়তে লাগল।

পড়তে পড়তে যেই মাটিটা ধাঁই করে যতীনের মাথায় লাগল, অমনি সে চমকে উঠল। ঘুড়িটা কি হল কে জানে। যতীন দেখল সে সিঁড়ির নিচে শুয়ে আছে, আর তার মাথায় ভয়ানক বেদনা হয়েছে।

কিছুদিন ভুগে যতীন সেরে উঠল। তার মা বলতেন, "আহা, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, এই ভোগানিতে বাছা আমার বড় দুর্বল হয়ে গেছে। সে স্ফূর্তি নেই, সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলা নেই, কিছুই নেই। তা নইলে এক জোড়া জুতো চার মাস যায়?"

আসল কথা—যতীন এখনও সেই মুচিদের আর দরজীদের কথা ভুলতে পারেনি।

ডিটেক্‌টিভ

জলধরের মামা পুলিশের চাকরি করেন, আর তার পিসেমশাই লেখেন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। সেইজন্য জলধরের বিশ্বাস যে, চোর-ডাকাত জাল-জুয়াচোর জব্দ করবার সব রকম সঙ্কেত সে যেমন জানে এমনটি তার মামা আর পিসেমশাই ছাড়া কেউ জানে না। কারও বাড়িতে চুরি-টুরি হলে জলধর সকলের আগে সেখানে হাজির হয়। আর, কে চুরি করল, কি করে চুরি হল, সে থাকলে এমন অবস্থায় কি করত, এ-সব বিষয়ে খুব বিজ্ঞের মতো কথা বলতে থাকে। যোগেশবাবুর বাড়িতে যখন বাসন চুরি হল, তখন জলধর তাদের বললে, "আপনারা এইটুকু সাবধান হতে জানেন না, চুরি তো হবেই। দেখুন তো ভাঁড়ার ঘরের পাশেই অন্ধকার গলি। তার উপর জানলার গরাদ নেই। একটু সেয়ানা লোক হলে এখান দিয়ে বাসন নিয়ে পালাতে কতক্ষণ? আমাদের বাড়িতে ও-সব হবার জো নেই। আমি রামদিনকে ব'লে রেখেছি, জানলার গায়ে এমনভাবে বাসনগুলো ঠেকিয়ে রাখবে যে জানলা খুলতে গেলেই বাসনপত্র সব ঝন্‌ঝন্‌ করে মাটিতে পড়বে। চোর জব্দ করতে হলে এ-সব কায়দা জানতে হয়।" সে সময়ে আমরা সকলেই জলধরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু পরের দিন যখন শুনলাম সেই রাত্রে জলধরের বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে, তখন মনে হল, আগের দিন অতটা প্রশংসা করা উচিত হয়নি। জলধর কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমেনি। সে বলল, "ঐ আহাম্মক রামদিনটার বোকামিতে সব মাটি হয়ে গেল। যাক্‌, আমার জিনিস চুরি করে তাকে আর হজম করতে হবে না। দিন দুচার যেতে দাও না।" কিন্তু দু মাস গেল, চার মাস গেল, চোর কিন্তু আর ধরাই পড়ল না। চোরের উপদ্রবের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের স্কুলে আবার চুরির হাঙ্গামা শুরু হল। ছেলেরা অনেকে টিফিন নিয়ে আসে, তা থেকে খাবার চুরি যেতে লাগল। প্রথম দিন রামপদর খাবার চুরি যায়। সে বেঞ্চির উপর খানিকটা রাবড়ি আর লুচি রেখে হাত ধুয়ে আসতে গেছে—এর মধ্যে কে এসে লুচিটুচি বেমালুম খেয়ে গিয়েছে। তারপর ক্রমে আরো দু-চারটি ছেলের খাবার চুরি হল। তখন আমরা জলধরকে বললাম, "কি হে ডিটেক্‌টিভ! এই বেলা যে তোমার চোর-ধরা বুদ্ধি খোলে না, তার মানেটা কি বল দেখি?" জলধর বলল, "আমি কি আর বুদ্ধি খাটাচ্ছি না? সবুর কর না।" তখন সে খুব সাবধানে আমাদের কানে কানে এ কথা জানিয়ে দিল যে, স্কুলের যে নতুন ছোকরা বেয়ারা এসেছে তাকেই সে চোর বলে সন্দেহ করে। কারণ, সে আসবার পর থেকে চুরি আরম্ভ হয়েছে। আমরা সবাই সেদিন থেকে তার উপর চোখ রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার চুরি। পাগলা দাশু বেচারা বাড়ি থেকে মাংসের চপ এনে টিফিন ঘরের বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাকিটুকু ধুলোয় ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চীৎকার করে গাল দিয়ে ইস্কুল-বাড়ি মাথায় করে তুলল। আমরা সবাই বললাম, "আরে চুপ্‌ চুপ্‌, অত চেঁচাসনে। তা হলে চোর ধরা পড়বে কি করে?" কিন্তু পাগলা কি সে-কথা শোনে? তখন

জলধর তাকে বুঝিয়ে বলল, "আর দুদিন সবুর কর, ঐ নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি—এ সমস্ত ওরই কারসাজি।" শুনে দাশু বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! ওরা হল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি? দারোয়ানজীকে জিগ্‌গেস কর তো?" সত্যিই আমাদের তো সে-খেয়াল হয়নি! ও ছোকরা তো কতদিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই একদিনও তো ওকে মাছ-মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগলা হোক আর যাই হোক, তার কথাটা সবাইকে মানতে হল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে এক গাল হেসে বলল, "আমি ইচ্ছে করে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোরকে না ধরা পর্যন্ত কি কিছু বলতে আছে, কোনো পাকা ডিটেক্‌টিভ ও-রকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।"

তারপর কদিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম; আট-দশদিন আর চুরি হয়নি। তখন জলধর বললে, "তোমরা গোলমাল করেই তো সব মাটি করলে। চোরটা টের পেয়ে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায়? তবু ভাগ্যিস তোমাদের কাছে আসল নামটা ফাঁস করিনি।" কিন্তু সেই দিনই আবার শোনা গেল, স্বয়ং হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে তার টিফিনের খাবার চুরি হয়ে গেছে। আমরা বললাম, "কই হে? চোর না তোমার ভয়ে চুরি করতে পারছিল না? তার ভয় যে ঘুচে গেল দেখছি।"

তারপর দুদিন ধরে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা সব এম্নি ঘুলিয়ে গেল যে পণ্ডিত মহাশয়ের কাশে সে আরেকটু হলেই মার খেত আর কি! দুদিন পরে সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র করল, আর বলল,তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়েছে। টিফিনের সময় সে একটা ঠোঙায় করে সরভাজা, লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আসবে। তারপর কেউ যেন সেদিকে না যায়। স্কুলের বাইরে যে জিমন্যাস্টিকের ঘর আছে সেখান থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায়। আমরা কয়েকজন বাড়ি যাবার ভান করে সেখানে থাকব। আর কয়েকজন থাকবে উঠোনের পশ্চিম কোণের ছোট ঘরটাতে। সুতরাং, চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

সেদিন টিফিনের ছুটি পর্যন্ত কারও আর পড়ায় মন বসে না। সবাই ভাবছে কতক্ষণে ছুটি হবে, আর চোর কতক্ষণে ধরা পড়বে। চোর ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কি করা যাবে, সে বিষয়েও কথাবার্তা হতে লাগল। মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে ধমকাতে লাগলেন, পরেশ আর বিশ্বনাথকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হল—কিন্তু সময়টা যেন কাটতেই চায় না। টিফিনের ছুটি হতেই জলধর তার খাবারের ঠোঙাটা টিফিন-ঘরে রেখে এলো। জলধর, আমি আর দশ-বারোজন উঠোনের কোণের ঘরে রইলাম, আর একদল ছেলে বাইরে জিমনাস্টিকের ঘরে লুকিয়ে থাকল। জলধর বলল, "দেখ, চোরটা যে রকম সেয়ানা দেখছি, আর তার যে রকম সাহস, তাকে মারধর করা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয় খুব ষণ্ডা হবে। আমি বলি, সে যদি এদিকে আসে তাহলে সবাই মিলে তার গায়ে কালি ছিটিয়ে দেব আর চেঁচিয়ে উঠব। তাহলে দারোয়ান-টারোয়ান সব ছুটে আসবে। আর, লোকটা পালাতে গেলেও ঐ কালির চিহ্ন দেখে ঠিক ধরা যাবে।" আমাদের রামপদ ব'লে উঠল, "কেন? সে যে খুব ষণ্ডা হবে তার মানে কি? সে কিছু রাক্ষসের মতো খায় বলে তো মনে হয় না। যা চুরি করে নিচ্ছে সে তো কোনো দিনই খুব বেশি নয়।" জলধর বলল, "তুমিও যেমন পণ্ডিত। রাক্ষসের মতো খানিকটা

খেলেই বুঝি ষণ্ডা হয়? তাহলে তো আমাদের শ্যামাদাসকেই সকলের চেয়ে ষণ্ডা বলতে হয়। সেদিন ঘোষেদের নেমতন্নে ওর খাওয়া দেখেছিলে তো! বাপু হে, আমি যা বলেছি তার উপর ফোড়ন দিতে যেও না। আর তোমার যদি নেহাৎ বেশি সাহস থাকে, তুমি গিয়ে চোরের সঙ্গে লড়াই ক'রো। আমরা কেউ তাতে আপত্তি করব না। আমি জানি, এ-সমস্ত নেহাৎ যেমন-তেমন চোরের সাধ্য নয়। আমার খুব বিশ্বাস, যে-লোকটা আমাদের বাড়িতে চুরি করেছিল—এ-সব তারই কাণ্ড!"

এমন সময় হঠাৎ টিফিন-ঘরের বাঁ দিকের জানলাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল, যেন কেউ ভিতর থেকে ঠেলছে। তার পরেই শাদা মতন কি একটা ঝুপ করে উঠোনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমরা চেয়ে দেখলাম, একটা মোটা হুলো বেড়াল—তার মুখে জলধরের সরভাজা! তখন যদি জলধরের মুখখানা দেখতে, সে এক বিঘৎ উঁচু হাঁ করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা জিগ্গেস করলাম, "কেমন হে ডিটেক্-টিভ! ঐ ষণ্ডা চোরটাই তো তোমার বাড়িতে চুরি করেছিল? তাহলে এখন ওকেই পুলিশে দিই?"

ব্যোমকেশের মাঞ্জা

'টোকিয়ো—কিয়োটো—নাগাসাকি—য়োকোহামা'—বোর্ডের উপর প্রকাণ্ড ম্যাপ ঝুলিয়ে হারাণচন্দ্র জাপানের প্রধান নগরগুলি দেখিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই ব্যোমকেশের পালা কিন্তু ব্যোমকেশের সে খেয়ালই নেই। কাল বিকেলে ডাক্তারবাবুর ছোট্ট ছেলেটার সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে তার দুটো-দুটো ঘুড়ি কাটা গিয়েছিল, সে-কথাটা ব্যোমকেশ কিছুতেই আর ভুলতে পারছে না। তাই সে বসে বসে সুতোর জন্যে কড়া রকমের একটা মাঞ্জা তৈরির উপায় চিন্তা করছে। চীনে শিরিস গালিয়ে, তার মধ্যে বোতলচুর আর কড়্‌কড়ে এমেরি পাউডার মিশিয়ে সুতোয় মাখালে পর কি রকম চমৎকার মাঞ্জা হবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে উৎসাহে তার দুই চোখ কড়িকাঠের দিকে গোল হয়ে উঠছে। মনে মনে মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সুতোটা সবে তালগাছের আগা পর্যন্ত উঠে, আশ্চর্য কায়দায় ডাক্তারের ছেলের ঘুড়িটাকে কাটতে যাচ্ছে এমন সময়ে গম্ভীর গলায় ডাক পড়ল—"তারপর, ব্যোমকেশ এস দেখি।"

ঐ রকম ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে, সুতো-মাঞ্জা, ঘুড়ির প্যাঁচ সব ফেলে আকাশের উপর থেকে ব্যোমকেশকে হঠাৎ নেমে আসতে হল একেবারে চীন দেশের মধ্যিখানে। একে তো ও দেশটার সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি ছিল না, তার উপর যা-ও দু-একটা চীনদেশী নাম সে জানত, ওরকম হঠাৎ নেমে আসবার দরুন, সেগুলোও তার মাথার মধ্যে কেমন বিচ্ছিরি রকম ঘণ্ট পাকিয়ে গেল। পাহাড়, নদী, দেশ, উপদেশের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে বেচারা বেমালুম পথ হারিয়ে ফেলল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে চীনদেশের চীনে শিরীষ, তাই দিয়ে হয় মাঞ্জা। মাস্টারমশাই দু-দুবার তাড়া দিয়ে যখন তৃতীয়বার চড়া গলায় বললেন, "চীন দেশের নদী দেখাও" তখন বেচারা একেবারে দিশেহারা আর মরিয়া মতন হয়ে বললে—"সাংহাই।" সাংহাই বলবার আর কোনো কারণ ছিল না, বোধ হয় তার সেজমামার যে স্ট্যাম্প সংগ্রহের খাতা আছে তার মধ্যে ঐ নামটাকে সে পেয়ে থাকবে—বিপদের ধাক্কায় হঠাৎ কেমন করে ঐটেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

গোটা দুই চড়-চাপড়ের পর ব্যোমকেশবাবু তাঁর কানের উপর মাস্টারমশায়ের প্রবল আকর্ষণ অনুভব ক'রে, বিনা আপত্তিতে বেঞ্চের উপর আরোহণ করলেন। কিন্তু কানদুটো জুড়োতে না জুড়োতেই মনটা তার খেই-হারানো ঘুড়ির পিছনে উধাও হয়ে আবার সুতোর মাঞ্জা তৈরি করতে বসল। সারাটা দিন বকুনি খেয়েই তার সময় কাটল, কিন্তু এর মধ্যে কত উঁচুদরের মাঞ্জা-দেওয়া সুতো তৈরি হল আর কত যে ঘুড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় কাটা পড়ল সে কেবল ব্যোমকেশই জানে।

বিকেলবেলায় সবাই যখন বাড়ি ফিরছে, তখন ব্যোমকেশ দেখল, ডাক্তারের ছেলেটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা লাল রঙের ঘুড়ি কিনছে। দেখে ব্যোমকেশ তার বন্ধু পাঁচকড়িকে বলল, "দেখেছিস, পাঁচু, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আবার ঘুড়ি কেনা হচ্ছে! এ-সব কিন্তু নেহাত বাড়াবাড়ি। না হয় দুটো ঘুড়িই কেটেছিস বাপু, তার জন্যে এত কি গিরিম্বাড়ি!" এই ব'লে সে পাঁচুর কাছে তার মাঞ্জা তৈরির মতলবটা

খুলে বলল।

শুনে পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা যদি বলিস, তুই কি আর মাঞ্জা তৈরি করে ওদের সঙ্গে পারবি ভেবেছিস? ওরা হল ডাক্তারের ছেলে, নানা রকম ওষুধ-মশলা জানে। এই তো সেদিন ওর দাদাকে দেখলুম, শানের উপর কি একটা আরক ঢেলে দিলে, আর ভস্‌ভস্‌ করে গ্যাঁজালের মতো তেজ বেরুতে লাগল। ওরা যদি মাঞ্জা বানায়, তা'হলে কারু মাঞ্জার বাপের সাধ্যি নেই যে তার সঙ্গে পেরে ওঠে।"

শুনে ব্যোমকেশের মনটা কেমন দমে গেল। তার ধ্রুব রকম বিশ্বাস হল যে, ডাক্তারের ছেলেটা নিশ্চয় কোনো আশ্চর্য রকম মাঞ্জার খবর জানে। তা নইলে ব্যোমকেশের চাইতেও চার বছরের ছোট হয়ে, সে কেমন করে তার ঘুড়ি কাটল? ব্যোমকেশ স্থির করল, যেমন করে হোক ওদের বাড়ির মাঞ্জা খানিকটা যোগাড় করতেই হবে। সেটা একবার আদায় করতে পারলে, তারপর সে ডাক্তারের ছেলেকে দেখে নেবে।

বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি জলখাবার সেরে নিয়ে ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল ডাক্তারবাবুর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করতে। সেখানে গিয়ে সে দেখে কি, কোণের বারান্দায় বসে সেই ছোট্ট ছেলেটা একটা ডাক্তারি খলের মধ্যে কি যেন মশলা ঘুঁটছে। ব্যোমকেশকে দেখেই সে একটা চৌকির তলায় সব লুকিয়ে ফেলে সেখান থেকে সরে পড়ল। ব্যোমকেশ মনে মনে বললে, 'বাপু হে! এখন আর লুকিয়ে করবে কি? তোমার আসল খবর আমি টের পেয়েছি'—এই ব'লে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে, কোথাও কেউ নেই। একবার সে ভাবল, কেউ আস্‌লে পর একটুখানি চেয়ে নেব। আবার মনে হল, কি জানি চাইলে যদি না দেয়? তারপর ভাবলে, দূর! ভারি তো জিনিস তা আবার চাইবার দরকার কি? এই একটুকুন মাঞ্জা হলেই প্রায় দুশো গজ সুতোয় শান দেওয়া হবে। এই ভেবে সে চৌকির তলা থেকে এক খাবল মশলা তুলে নিয়েই এক দৌড়ে বাড়ি এসে হাজির!

আর কি তখন দেরি সয়? দেখতে দেখতে দক্ষিণের বারান্দা জুড়ে সুতো খাটিয়ে, মহা উৎসাহে তার মাঞ্জা দেওয়া শুরু হল। যাই বল, মাঞ্জাটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত—কই, তেমন কড়্‌কড়্‌ করছে না তো! বোধ হয়, খুব মিহি গুঁড়োর তৈরি—আর কালো কাচের গুঁড়ো। দুঃখের বিষয়, বেচারার কাজটা শেষ না হতেই সন্ধ্যা হয়ে এল, আর তার বড়দা এসে বললে, "যা, যা! আর সুতো পাকাতে হবে না, এখন পড়গে যা।"

সে রাত্তিরে ব্যোমকেশের ভালো করে ঘুমই হল না। সে স্বপ্ন দেখলে যে, ডাক্তারের ছেলেটা হিংসে করে তার চমৎকার সুতোয় জল ফেলে সব নষ্ট করে দিয়েছে। সকাল হতে না হতেই ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল তার সুতোর খবর নিতে। কিন্তু গিয়েই দেখে, কে এক বুড়ো ভদ্রলোক ঠিক বারান্দার দরজার সামনে বসে তার দাদার সঙ্গে গল্প করছেন, তামাক খাচ্ছেন। ব্যোমকেশ ভাবলে, দেখ তো কি অন্যায়! এর মধ্যে থেকে এখন সুতোটা আনি কেমন করে? যাহোক, খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে খুব সাহসের সঙ্গে গিয়ে, চট করে তার সুতো খুলে নিয়ে চলে আসছে—এমন সময়, হঠাৎ কাশতে গিয়ে বুড়ো লোকটির কল্‌কে থেকে খানিকটা টিকে গেল মাটিতে পড়ে। বৃদ্ধ তখন ব্যস্ত হয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে, ব্যোমকেশের সেই মাঞ্জা-মাখানো কাগজটা দিয়ে টিকেটাকে তুলতে গেলেন।

সর্বনাশ! যেমন টিকের উপর কাগজ ছোঁয়ানো, অমনি কিনা ভস্‌ভস্‌ করে কাগজ জ্বলে উঠে ভদ্রলোকের আঙুল-টাঙুল পুড়ে, বারান্দার বেড়ায় আগুন-টাগুন লেগে এক হুলস্থূল কাণ্ড! অনেক চেঁচামেচি ছুটোছুটি আর জল ঢালাঢালির পর যখন

আগুনটুকু নিভে এল, আর ভদ্রলোকের আঙুলের ফোস্কায় মলম দেওয়া হলে, তার দাদা এসে তার কান ধরে বললেন, "হতভাগা! কি রেখেছিলি কাগজের মধ্যে বল্ তো?" ব্যোমকেশ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, "কিচ্ছু তো রাখিনি, খালি সুতোর মাঞ্জা রেখেছিলাম।" দাদা তার কৈফিয়ৎটাকে নিতান্তই আজগুবি মনে করে, "আবার এয়ার্কি হচ্ছে?" ব'লে বেশ দু-চার ঘা কষিয়ে দিলেন।

বেচারা ব্যোমকেশ এই ব'লে তার মনকে খুব খানিক সান্ত্বনা দিল যে, আর যাই হোক, তার সুতোটুকু রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্যিস সে সময়মতো খুলে এনেছিল, নইলে তার সুতোও যেত, পরিশ্রমও নষ্ট হত। বিকেল বেলায় সে বাড়ি এসেই চটপট ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাতের উপর উঠল। মনে মনে বলল 'ডাক্তারের পো আজ একবার আসুক না, দেখিয়ে দেব প্যাঁচ খেলাটা কাকে বলে।' এমন সময়ে পাঁচকড়ি এসে বড় বড় চোখ করে বললে, "শুনেছিস?" ব্যোমকেশ বললে, "না—কি হয়েছে?" পাঁচু বললে, "ওদের সেই ছেলেটাকে দেখে এলুম, সে নিজে নিজে দেশলাইয়ের মশলা বানিয়েছে, আর চমৎকার লাল নীল দেশলাই তৈরি করেছে।" ব্যোমকেশ হঠাৎ লাটাই-টাটাই রেখে, এত বড় হাঁ করে জিগ্‌গেস করলে, "দেশলাই কিরে! মাঞ্জা বল?" শুনে পাঁচু বেজায় চটে গেল, "বলছি লাল নীল আলো জ্বলছে, তবু বলবে মাঞ্জা, আচ্ছা গাধা যা হোক!"

ব্যোমকেশ কোনো জবাব না দিয়ে, দেশলাইয়ের মশলা-মাখানো সুতোটার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। সেই সময় ডাক্তারদের বাড়ি থেকে লাল রঙের ঘুড়ি উড়ে এসে, ঠিক ব্যোমকেশের মাথার উপরে ফর্‌ফর্ করে তাকে যেন ঠাট্টা করতে লাগল। তখন সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, "আমার অসুখ করেছে।"

জগ্যিদাসের মামা

তার আসল নামটি যজ্ঞদাস। সে প্রথম যেদিন আমাদের ক্লাশে এল পণ্ডিতমশাই তার নাম শুনেই ভ্রূকুটি করে বললেন, "যজ্ঞের আবার দাস কি? যজ্ঞেশ্বর বললে তবু না হয় বুঝি।" ছেলেটি বলল, "আজ্ঞে, আমি তো নাম রাখিনি, নাম রেখেছেন খুড়োমশাই।"

এই শুনে আমি একটু ফিক করে হেসে ফেলেছিলাম তাই পণ্ডিতমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বানান কর যজ্ঞদাস।" আমি থতমত খেয়ে বললাম, "বর্গীয় জ"—পণ্ডিতমশাই বললেন, "দাঁড়িয়ে থাক।" তারপর একটি ছেলে ঠিক বানান বললে পর তিনি আরেকজনকে বললেন, "সমাস কর।" সে তার সংস্কৃত বিদ্যা জাহির করে বললে, "যোগ্য শ্চেতি দাসশ্চাসৌ।" পণ্ডিতমশাই তার কান ধরে বললেন, "বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাক।"

দুদিন না যেতেই বোঝা গেল যে, জগ্যিদাসের আর কোনো বিদ্যে থাকুক আর নাই থাকুক আজগুবি গল্প বলবার ক্ষমতাটি তার অসাধারণ। একদিন সে ইস্কুলে দেরি করে এসেছিল, কারণ জিগ্‌গেস করাতে সে বলল, "রাস্তায় আসতে পঁচিশটা কুকুর হাঁ হাঁ করে আমায় তেড়ে এসেছিল। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই কুণ্ডুদের বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছিলাম।" পঁচিশটা দূরের কথা, দশটা কুকুরও আমরা এক সঙ্গে চোখে দেখিনি, কাজেই কথাটা মাস্টারমশাইও বিশ্বাস করেননি। তিনি জিগ্‌গেস করলেন, "এত মিছে কথা বলতে শিখলে কার কাছে?" জগ্যিদাস বলল, "আজ্ঞে, মামার কাছে।" সেদিন হেডমাস্টারের ঘরে জগ্যিদাসের ডাক পড়েছিল, সেখানে কি হয়েছিল আমরা জানি না, কিন্তু জগ্যিদাস যে খুশি হয়নি সেটা বেশ বোঝা গেল।

কিন্তু সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, তার গল্প বলার বাহাদুরি ছিল। সে যখন বড় বড় চোখ করে গম্ভীর গলায় তার মামাবাড়ির ডাকাত ধরার গল্প বলত, তখন বিশ্বাস করি আর না করি শুনতে শুনতে আমাদের মুখ আপনা হতেই হাঁ হয়ে আসত। জগ্যিদাসের মামার কথা আমাদের ভারি আশ্চর্য ঠেকত! তাঁর গায়ে নাকি যেমন জোর তেমনি অসাধারণ বুদ্ধি। তিনি যখন 'রামভজন' ব'লে চাকরকে ডাক দিতেন, তখন ঘর বাড়ি সব থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠত। কুস্তি বল, লাঠি বল, ক্রিকেট বল, সবটাতেই তাঁর সমান দখল। প্রথমটা আমরা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু একদিন সে তার মামার ফটো এনে দেখাল। দেখলাম পালোয়ানের মতো চেহারা বটে! এক-একবার ছুটি হত আর জগ্যিদাস তার মামার বাড়ি যেত, আর এসে যে সব গল্প বলত তা কাগজে ছাপবার মতো। একদিন স্টেশনে আমার সঙ্গে জগ্যিদাসের দেখা, একটা গাড়ির মধ্যে মাথায় পাগড়ি বাঁধা চমৎকার জাঁদরেল চেহারার একটি কোন দেশী ভদ্রলোক বসে। আমি ইস্কুলে ফিরতে ফিরতে জগ্যিদাসকে জিগ্‌গেস করলাম, "ঐ পাগড়ি বাঁধা জাঁদরেল লোকটাকে দেখেছিলি?" জগ্যিদাস বলল, "ঐ তো আমার মামা।" আমি বললাম, "ফটোতে তো কালো দেখেছিলাম।" জগ্যিদাস বলল, "এবার

সিম্‌লে গিয়ে ফরসা হয়ে এসেছেন।" আমি ইস্কুলে গিয়ে গল্প করলাম, "আজ জগ্যিদাসের মামাকে দেখে এলুম।" জগ্যিদাসও খুব বুক ফুলিয়ে মুখখানা গম্ভীর করে বলল, "তোমরা তো ভাই আমার কথা বিশ্বাস কর না। আচ্ছা, না হয় মাঝে মাঝে দুটো একটা গল্প ব'লে থাকি। তা ব'লে কি সবই আমার গল্প। আমার জলজ্যান্ত মামাকে সুদ্ধ তোমরা উড়িয়ে দিতে চাও?" এ-কথায় অনেকেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে, ব্যস্ত হয়ে বারবার বলতে লাগল, "আমরা কিন্তু গোড়া থেকেই বিশ্বাস করেছিলাম।'

তারপর থেকে মামার প্রতিপত্তি ভয়ানক বেড়ে গেল। রোজই সব ব্যস্ত হয়ে থাকতাম মামার খবর শুনবার জন্য। কোনোদিন শুনতাম মামা গেছেন হাতি গন্ডার বাঘ মারতে। কোনোদিন শুনতাম, একাই তিনি পাঁচটা কাবুলীকে ঠেঙিয়ে ঠিক করেছেন, এরকম প্রায়ই হত। তার পর একদিন সবাই আমরা টিফিনের সময় গল্প করছি, এমন সময় হেডমাস্টার মশাই ক্লাশে এসে বললেন, "যজ্ঞদাস, তোমার মামা এসেছেন।" হঠাৎ যজ্ঞদাসের মুখখানা আমসির মতো শুকিয়ে গেল—সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারল না। তারপর লক্ষ্মী ছেলেটির মতো চুপচাপ মাস্টার মশায়ের সঙ্গে চলল। আমরা বললাম, "ভয় হবে না? জানো তো কি রকম মামা!" সবাই মিলে উৎসাহ আর আগ্রহে মামা দেখবার জন্য একেবারে ঝুঁকে পড়লাম। গিয়ে দেখি, একটি রোগা কালো ছোকরা গোছের ভদ্রলোক, চশমা চোখে গোবেচারার মতো বসে আছেন। জগ্যিদাস তাঁকেই গিয়ে প্রণাম করল।

সেদিন সত্যিসত্যিই আমাদের রাগ হয়েছিল। এম্নি করে ফাঁকি দেওয়া! মিথ্যে করে মামা তৈরি! সেদিন আমাদের ধমকের চোটে জগ্যিদাস কেঁদেই ফেলল। সে তখন স্বীকার করল যে, ফটোটা কোনো এক পশ্চিমা পালোয়ানের। আর সেই ট্রেনের লোকটাকে সে চেনেই না। তারপরে কোনো আজগুবি জিনিসের কথা বলতে হলেই আমরা বলতাম, 'জগ্যিদাসের মামার মতো।'

আজব সাজা

"পণ্ডিতমশাই, ভোলা আমায় ভ্যাংচাচ্ছে।" "না পণ্ডিতমশাই, আমি কান চুলকোচ্ছিলাম তাই মুখ বাঁকা মতো দেখাচ্ছিল!" পণ্ডিতমশাই চোখ না খুলিয়াই অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন, "আঃ! কেবল বাঁদরামি! দাঁড়িয়ে থাক।"

আধমিনিট পর্যন্ত সব চুপচাপ। তারপর আবার শোনা গেল, "দাঁড়াচ্ছিস না যে?" "আমি দাঁড়াব কেন?" "তোকেই তো দাঁড়াতে বলল।" "যাঃ আমায় বলেছে না আর কিছু! গণশাকে জিগ্‌গেস কর? কিরে গণশা, ওকে দাঁড়াতে বলেছে না?"

গণেশের বুদ্ধি কিছু মোটা, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া পণ্ডিতমশাইকে ডাকিতে লাগিল, "পণ্ডিতমশাই! ও পণ্ডিতমশাই!" পণ্ডিতমশাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি বলছিস বল্ না।" গণেশচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে দাঁড়াতে বলেছেন, পণ্ডিতমশাই?" পণ্ডিতমশাই কট্‌মটে চোখ মেলিয়াই সাংঘাতিক ধমক দিয়া বলিলেন, "তোকে বলছি, দাঁড়া।" বলিয়াই আবার চোখ বুজিলেন।

গণেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল। আবার মিনিট খানেক সব চুপচাপ। হঠাৎ ভোলা বলিল, "ওকে এক পায়ে দাঁড়াতে বলেছিল না ভাই?" গণেশ বলিল, "কক্ষনো না, খালি দাঁড়া বলেছে।" বিশু বলিল, "এক আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, তার মানেই এক পায়ে দাঁড়া।" পণ্ডিতমশাই যে ধমক দিবার সময় তর্জনী তুলিয়াছিলেন, এ কথা গণেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। বিশু আর ভোলা জেদ করিতে লাগিল, "শিগগির এক পায়ে দাঁড়া বলছি, তা না হলে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।"

গণেশ বেচারা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি এক পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমনি ভোলা আর বিশুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাঁধিয়া গেল। এ বলে ডান পায়ে দাঁড়ানো উচিত; ও বলে, না, আগে বাঁ পা। গণেশ বেচারার মহা মুশকিল! সে আবার পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল, "পণ্ডিতমশাই, কোন্ পা?"

পণ্ডিতমশাই তখন কি যেন একটা স্বপ্ন দেখিয়া অবাক হইয়া নাক ডাকাইতেছিলেন। গণেশের ডাকে হঠাৎ তন্দ্রা ছুটিয়া যাওয়ায় তিনি সাংঘাতিক রকম বিষম খাইয়া ফেলিলেন। গণেশ বেচারা তার প্রশ্নের এ রকম জবাব একেবারেই কল্পনা করে নাই, সে ভয় পাইয়া বলিল, "ঐ যা! কি হবে?" ভোলা বলিল, "দৌড়ে জল নিয়ে আয়।" বিশু বলিল, "শিগ্‌গির মাথায় জল দে।" গণেশ এক দৌড়ে কোথা হইতে একটা কুঁজা আনিয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া পণ্ডিতমশায়ের টাকের উপর জল ঢালিতে লাগিল। পণ্ডিত-মশায়ের বিষম খাওয়া খুব চট্‌পট্ থামিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া গণেশের হাতে জলের কুঁজা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ভয়ে সকলেই খুব গম্ভীর হইয়া রহিল, খালি শ্যামলাল বেচারার মুখটাই কেমন যেন আহ্লাদি গোছের হাসি হাসি মতো, সে কিছুতেই গম্ভীর হইতে পারিল না। পণ্ডিত-মশায়ের রাগ হঠাৎ তার উপরেই ঠিকরাইয়া পড়িল। তিনি বাঘের মতো গুম্‌গুমে গলায় বলিলেন, "উঠে আয়!" শ্যামলাল ভয়ে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি কি

করলাম? গণশা জল ঢাল্‌ল, তা আমার দোষ কি?" পণ্ডিতমশাই মানুষ ভালো, তিনি শ্যামলালকে ছাড়িয়া গণশার দিকে তাকাইয়া দেখেন তাহার হাতে তখনও জলের কুঁজা। গণেশ কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া ফেলিল, "ভোলা আমাকে বলেছিল।" ভোলা বলিল, "আমি তো খালি জল আনতে বলেছিলাম। বিশু বলেছিল, মাথায় ঢেলে দে।" বিশু বলিল, "আমি কি পণ্ডিতমশায়ের মাথায় দিতে বলেছি? ওর নিজের মাথায় দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে বুদ্ধিটা ঠাণ্ডা হত।"

পণ্ডিতমশাই খানিকক্ষণ কটমট করিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া তারপর বলিলেন, "যা! তোরা ছেলেমানুষ তাই কিছু বললাম না। খবরদার আর অমন করিসনে।" সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, কিন্তু পণ্ডিতমশাই কেন যে হঠাৎ নরম হইয়া গেলেন কেহই তাহা বুঝিল না। পণ্ডিতমশায়ের মনে হঠাৎ যে তাঁর নিজের ছেলেবেলার কোন দুষ্টুমির কথা মনে পড়িয়া গেল, তাহা কেবল তিনিই জানেন।

কালাচাঁদের ছবি

কালাচাঁদ নিধিরামকে মারিয়াছে—তাই নিধিরাম হেডমাস্টার মশায়ের কাছে নালিশ করিয়াছে। হেডমাস্টার আসিয়া বলিলেন, "কি হে কালাচাঁদ, তুমি নিধিরামকে মেরেছ?" কালাচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে না, মারব কেন? কান মলে দিয়েছিলাম, গালে খামচিয়ে দিয়েছিলাম, আর একটুখানি চুল ধরে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।" হেড-মাস্টার বলিলেন, ''কেন ওরকম করেছিলে?'' কালাচাঁদ খানিকটা আমতা আমতা করিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, ও খালি খালি আমায় চটাচ্ছিল।" হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তোমায় মেরেছিল?'' ''না।'' ''তোমায় গাল দিয়েছিল?'' ''না। বারবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে বোকার মতো কথা বলছিল, তাই, আমার রাগ হয়ে গেল।'' মাস্টার মহাশয় তাহার কান ধরিয়া বেশ ভালোরকম নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন, ''মেজাজটা এখন হইতে একটু সংশোধন করিতে চেষ্টা কর।''

ছুটির পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁরে কালাচাঁদ, তুই খামকা ঐ নিধেটাকে মারতে গেলি কেন?" কালাচাঁদ বলিল, "খামকা মারব কেন? কেন মেরেছিলাম ওকেই জিজ্ঞেস কর না!'' নিধেকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "খামকা নয় তো কি? তুই বাপু ছবি এঁকেছিস—তার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে গেলি কেন? আর যদি জিগ্‌গেস করলি, তাহলে তাই নিয়ে আবার মারামারি করতে এলি কেন?" আমরা বলিলাম, "আরে কি হয়েছে খুলেই বল্ না কেন।"

নিধিরাম বলিল, ''কালাচাঁদ একটা ছবি এঁকেছে—ছবির নাম 'খাণ্ডব দাহন'। সেই ছবিটা আমায় দেখিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হয়েছে?' আমি বললাম, 'এটা কি এঁকেছ? মন্দিরের সামনে শেয়াল ছুটছে?' কালাচাঁদ বলল, 'না, না, মন্দির কোথায়? ওটা হল রথ। আর এগুলো তো শেয়াল নয়—রথের ঘোড়া।' আমি বললাম, 'সূর্যটাকে কালো করে এঁকেছ কেন? আর তালগাছের উপর পদ্মফুল ফুটেছে কেন? আর ঐ চামচিকেটা লাঠি নিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে কেন?' কালাচাঁদ বলল. 'আহা তা কেন? ওটা তো সূর্য নয়, সুদর্শন চক্র। দেখছ না কৃষ্ণের হাতে রয়েছে? আর তালগাছ কোথায় দেখলে? ওটা তো অর্জুনের পতাকা! আর ঐগুলোকে বুঝি পদ্মফুল বলছ? ওগুলো দেবতা—খুব দূরে আছেন কিনা তাই ওরকম ছোট ছোট দেখাচ্ছে। আর এইটা বুঝি চামচিকে হল, এটা তো গরুড়পাখি! একটা সাপকে তাড়া করছে।' আমি বললাম, 'তা হবে। আমি ও সব বুঝিটুঝি না। আচ্ছা, ঐ ঝাপসা কাপড় পড়া মেয়েমানুষটি যে ওদের মারতে আসছে, ওটি কে?' কালাচাঁদ বলল, 'তুমি তো আচ্ছা মুখ্যু হে! ওটা বনে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে বুঝতে পাচ্ছ না? অবাক করলে যে!'

"তখন আমি বললাম, 'আচ্ছা এক কাজ কর না কেন ভাই, ওটাকে খাণ্ডব দাহন না করে সীতার অগ্নিপরীক্ষা কর না কেন? ঐ গাছটাকে শাড়ি পরিয়ে সীতা করে দাও। ঐ রথটার মাথায় জটা-টটা দিয়ে ওকে অগ্নিদেব বানাও। কৃষ্ণ অর্জুন আছেন তাঁরা হবেন রাম লক্ষ্মণ। আর ঐ সুদর্শন চক্রে নাক হাত পা জুড়ে দিলেই ঠিক বিভীষণ হয়ে যাবে। তারপর চামচিকের পিছনে একটা লম্বা ল্যাজ দিয়ে তার ডানা দুটো

মুছে দাও—ওটা হনুমান হবে এখন।' কালাচাঁদ বলল, 'হনুমানও হতে পারে, নিধিরামও হতে পারে।'

"আমি বললাম, 'তাহলে ভাই, আর এক কাজ কর। ওটাকে শিশুপাল-বধ করে দাও। তাহলে কৃষ্ণকে বদলাতে হবে না। চক্র তুলে শিশুপালকে মারতে যাচ্ছে। অর্জুনের মুখে পাকা গোঁফ দাড়ি দিয়ে খুব সহজেই ভীষ্ম করে দেওয়া যাবে। আর রথটা হবে সিংহাসন, তার উপর যুধিষ্ঠিরকে বসিয়ে দিও। আর ঐ যে গরুড় আর সাপ, ঐটে একটু বদলিয়ে দিলেই গদা হাতে ভীম হয়ে যাবে। আর শিশুপাল তো আছেই—ঐ গাছটাতে একটু নাক-মুখ ফুটিয়ে দিলেই হবে। তারপর রাজসূয় যজ্ঞের কয়েকটা রাজাকে দেখালেই বাস্!' কথাটা কালাচাঁদের পছন্দ হল না, তাই আমি অনেক ভেবে-চিন্তে আবার বললাম, 'তাহলে জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ কর না কেন? ঐ রথটা হবে জন্মেজয় আর কৃষ্ণকে জটা-দাড়ি দিয়ে পুরুতঠাকুর বানিয়ে দাও। সুদর্শন চক্রটা হবে ঘিয়ের ভাঁড়। যজ্ঞের আগুনের মধ্যে তিনি ঘি ঢালছেন। ঐ ধোঁয়াগুলো মনে কর যজ্ঞেরই ধোঁয়া! একটা সাপ আছে, আরও কয়েকটা এঁকে দিও। আর অর্জুনকে কর আস্তীক, সে হাত তুলে তক্ষককে বলছে—তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। আর ঐ চামচিকেটা—মানে গরুড়টা, ওটাকে মুনি-টুনি কিছু একটা বানিয়ে দিও।' পতাকাটাকে কি রকম করতে হবে সেইটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় কালাচাঁদ আমায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'থাক, থাক, আর তোমার বিদ্যে জাহির করে কাজ নেই। সর দেখি।'

"আমি বললাম, 'তা অত রাগ কর কেন ভাই? আমি তো আর বলছি না যে আমার পরামর্শ মতো তোমাকে চলতেই হবে। পছন্দ হয় কর, না হয়তো কোরো না, বাস্। এর মধ্যে আবার রাগারাগি কর কেন? আমার কথামতো না করে অন্য একটা কিছু কর না। মনে কর, ওটাকে সমুদ্র-মন্থন করে দিলেও তো হয়। ঐ ধোঁয়াওয়ালা বড় গাছটা মন্দার পর্বত, রথটা ধন্বন্তরী কিম্বা লক্ষ্মী—মন্থন থেকে উঠে এসেছেন। ওদিকে সুদর্শন চক্রটা চাঁদ হতে পারবে। অর্জুনের পিছনে কতগুলো দেবতা এঁকে দাও আর এদিকে কৃষ্ণ আর চামচিকের দিকে কতগুলো অসুর'—কথাটা ভালো করে বলতে না বলতেই কালাচাঁদ আমার কান ধরে টানতে লাগল। আচ্ছা, দেখ দেখি কি অন্যায়! আমি বন্ধুভাবে দুটো পরামর্শ দিতে গেলাম—তা তোমার পছন্দ হয়নি বলেই আমায় মারবে? যা বলেছি সব শুনলে তো, এর মধ্যে এত রাগ করবার কি হল বাপু?"

বাস্তবিক, কালাচাঁদের এ বড় অন্যায়! সে রাগ করিল কিসের জন্য? নিধিরাম তাহাকে মারে নাই, ধরে নাই, বকে নাই, গাল দেয় নাই, চোখ রাঙায় নাই, মুখ ভ্যাংচায় নাই—তবে রাগ করিবার কারণটা কি?

গোপালের পড়া

দুপুরের খাওয়া শেষ হইতেই গোপাল অত্যন্ত ভালোমানুষের মতন মুখ করিয়া দু-একখানা পড়ার বই হাতে লইয়া তিনতলায় চলিল। মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কিরে গোপলা, এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস?'' গোপাল বলিল ''তিনতলায় পড়তে যাচ্ছি।''

মামা—''পড়বি তো তিনতলায় কেন? এখানে বসে পড় না।''

গোপাল—"এখানে লোকজন যাওয়া-আসা করে, ভোলা গোলমাল করে, পড়বার সুবিধা হয় না।"

মামা—"আচ্ছা, যা মন দিয়ে পড়গে।"

গোপাল চলিয়া গেল, মামাও মনে মনে একটু খুশি হইয়া বলিলেন, ''যাক, ছেলেটার পড়াশুনায় মন আছে।'

এমন সময় ভোলাবাবুর প্রবেশ—বয়স তিন কি চার, সকলের খুব আদুরে। সে আসিয়াই বলিল, "দাদা কই গেল?" মামা বলিলেন, "দাদা এখন তিনতলায় পড়াশুনা করছে, তুমি এইখানে বসে খেলা কর।"

ভোলা তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর বসিয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল, 'দাদা কেন পড়াশুনা করছে, পড়াশুনা করলে কি হয়? কি করে পড়াশুনা করে?' ইত্যাদি। মামার তখন কাগজ পড়িবার ইচ্ছা, তিনি প্রশ্নের চোটে অস্থির হইয়া শেষটায় বলিলেন, "আচ্ছা ভোলাবাবু, তুমি ভোজিয়ার সঙ্গে খেলা কর গিয়ে, বিকেলে তোমায় লজেঞ্চুস এনে দেব।" ভোলা চলিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে ভোলাবাবুর পুনঃপ্রবেশ। সে আসিয়াই বলিল, "মামা, আমিও পড়াশুনা করব।"

মামা বলিলেন, "বেশ তো আর একটু বড় হও, তোমার রঙচঙে সব পড়ার বই কিনে এনে দেব।"

ভোলা—"না, সে রকম পড়াশুনা নয়, দাদা যে রকম পড়াশুনা করে সেইরকম।"

মামা—"সে আবার কি রে?"

ভোলা—"হ্যাঁ, সেই যে পাতলা-পাতলা রঙিন কাগজ থাকে আর কাঠি থাকে, আর কাগজে আঠা মাখায় আর তার মধ্যে কাঠি লাগায়, সেই রকম।"

দাদার পড়াশুনার বর্ণনা শুনিয়া মামার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! তিনি আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া তিনতলায় উঠিলেন, চুপি চুপি ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তাঁর ধনুর্ধর ভাগ্নেটি জানালার সামনে বসিয়া একমনে ঘুড়ি বানাইতেছে। বই দুটি ঠিক দরজার কাছে তক্তাপোশের উপরে পড়িয়া আছে। মামা অতি সাবধানে বই দুখানা দখল করিয়া নিচে নামিয়া আসিলেন।

খানিক পরেই গোপালচন্দ্রের ডাক পড়িল। গোপাল আসিতেই মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ছুটির আর কদিন বাকি আছে?"

গোপাল বলিল, "আঠারো দিন।"

মামা—"বেশ পড়াশুনা করছিস তো? না, কেবল ফাঁকি দিচ্ছিস?"

গোপাল—"না, এইতো এতক্ষণ পড়ছিলাম।"

মামা—"কি বই পড়ছিলি?"

গোপাল—"সংস্কৃত।"

মামা—"সংস্কৃত পড়তে বুঝি বই লাগে না? আর অনেকগুলো পাতলা কাগজ, আঠা আর কাঠি নিয়ে নানারকম কারিকুরি করার দরকার হয়?"

গোপালের চক্ষু তো স্থির! মামা বলে কি? সে একেবারে হতভম্ব হইয়া হাঁ করিয়া মামার দিকে তাকাইয়া রহিল। মামা বলিলেন, "বই কোথায়?"

গোপাল বলিল, "তিনতলায়।"

মামা বই বাহির করিয়া বলিলেন, "এগুলো কি?" তারপর তাহার কানে ধরিয়া ঘরের এক কোণে বসাইয়া দিলেন। গোপালের ঘুড়ি লাটাই সুতো ইত্যাদি সরঞ্জাম আঠারো দিনের জন্য মামার জিম্মায় বন্ধ রহিল।

পেটুক

'হরিপদ! ও হরিপদ!'

হরিপদর আর সাড়া নেই! সবাই মিলে এত চেঁচাচ্ছে, হরিপদ আর সাড়াই দেয় না। কেন, হরিপদ কালা নাকি? কানে কম শোনে বুঝি? না, কম শুনবে কেন—বেশ দিব্যি পরিষ্কার শুনতে পায়। তবে হরিপদ কি বাড়ি নেই? তা কেন? হরিপদর মুখ ভরা ক্ষীরের লাড়ু, ফেলতেও পারে না, গিলতেও পারে না। কথা বলবে কি করে? আবার ডাক শুনে ছুটে আসতেও পারে না—তাহলে যে ধরা পড়ে যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি লাড়ু গিলছে আর জল খাচ্ছে, আর যতই গিলতে চাচ্ছে ততই গলার মধ্যে লাড়ুগুলো আঠার মতো আটকে যাচ্ছে। বিষম খাবার যোগাড় আর কি!

এটা কিন্তু হরিপদর ভারি বদভ্যাস! এর জন্য কত ধমক, কত শাসন, কত শাস্তি, কত সাজাই যে সে পেয়েছে, তবু তার আক্কেল হল না। তবু সে লুকিয়ে চুরিয়ে পেটুকের মতো খাবেই। যেমন হরিপদ তেমনি তার ছোট ভাইটি। এদিকে পেট-রোগা, দুদিন অন্তর অসুখ লেগেই আছে, তবু হ্যাংলামি তার আর যায় না। যেদিন শাস্তিটা একটু শক্ত রকমের হয় তারপর কয়েক দিন ধরে প্রতিজ্ঞা থাকে, 'এমন কাজ আর করব না।' যখন অসময়ে অখাদ্য খেয়ে, রাত্রে তার পেট কামড়ায়, তখন কাঁদে আর বলে, 'আর না, এইবারেই শেষ!' কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার যেই সেই। এই তো কিছুদিন আগে পিসিমার ঘরে দই খেতে গিয়ে তারা জব্দ হয়েছিল, কিন্তু তবু তো লজ্জা নেই!

হরিপদর ছোট ভাই শ্যামাপদ এসে বলল, "দাদা, শিগ্‌গির এস। পিসিমা এই মাত্র এক হাঁড়ি দই নিয়ে তাঁর খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন।" দাদাকে এত ব্যস্ত হয়ে এ-খবরটা দেবার অর্থ এই যে, পিসিমার ঘরে যে শিকল দেওয়া থাকে, শ্যামাপদ সেটা হাতে নাগাল পায় না—তাই দাদার সাহায্য দরকার হয়। দাদা এসে আস্তে আস্তে শিকলটা খুলে, আগেই তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটের তলায় দইয়ের হাঁড়ি থেকে এক খাবল তুলে নিয়ে খপ করে মুখে দিয়েছে। মুখে দিয়েই চীৎকার! কথায় বলে 'ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে,' কিন্তু হরিপদর চেঁচানো তার চাইতেও সাংঘাতিক! চীৎকার শুনে মা-মাসি-দিদি-পিসি যে যেখানে ছিলেন সব 'কি হল' 'কি হল' বলে দৌড়ে এলেন। শ্যামাপদ বুদ্ধিমান ছেলে, সে দাদার চীৎকারের নমুনা শুনেই দৌড়ে ঘোষেদের পাড়ায় গিয়ে হাজির! সেখানে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো তার বন্ধু শান্তি ঘোষের কাছে পড়া বুঝে নিচ্ছে। এদিকে হরিপদর অবস্থা দেখে পিসিমা বুঝেছেন যে, হরিপদ দই ভেবে তাঁর চুনের হাঁড়ি চেখে বসেছে! তারপর হরিপদর যা সাজা! এক সপ্তাহ ধরে সে না পারে চিবোতে, না পারে গিলতে! তার খাওয়া নিয়েই এক মহা হাঙ্গামা! কিন্তু তবু তো তার লজ্জা নেই—আজ আবার লুকিয়ে কোথায় লাড়ু খেতে গিয়েছে। ওদিকে মামা তো ডেকে ডেকে সারা!

খানিক বাদে মুখ ধুয়ে মুছে হরিপদ ভালোমানুষের মতো এসে হাজির। হরিপদর বড়মামা বললেন, "কিরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?" হরিপদ বলল, "এইতো, উপরে ছিলাম।" "তবে, আমরা এত চেঁচাচ্ছিলাম, তুই জবাব দিচ্ছিলি না যে?" হরিপদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আজ্ঞে, জল খাচ্ছিলাম কিনা।" "শুধু জল? না, কিছু

স্থলও ছিল?" হরিপদ শুনে হাসতে লাগল যেন তার সঙ্গে ভারি একটা রসিকতা করা হয়েছে। এর মধ্যে তার মেজমামা মুখখানা গম্ভীর করে এসে হাজির। তিনি ভিতর থেকে খবর এনেছেন যে, হরিপদ একটু আগেই ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল, আর তারপর থেকেই প্রায় দশ-বারোখানা ক্ষীরের লাড়ু কম পড়ছে। তিনি এসেই হরিপদর বড়মামার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরাজিতে ফিস্‌ফাস্‌ কি যেন বলাবলি করলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "বাড়িতে ইঁদুরের যে রকম উৎপাত, ইঁদুর মারবার একটা কিছু বন্দোবস্ত না করলে আর চলছে না। চারদিকে যে রকম প্লেগ আর ব্যারাম—এই পাড়া সুদ্ধ ইঁদুর না মারলে আর রক্ষা নেই।" বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিদিকে বলেছি, সেঁকো বিষ দিয়ে লাড়ু পাকাতে—সেইগুলো একবার ছড়িয়ে দিলেই ইঁদুর বংশ নির্বংশ হবে!" হরিপদ জিজ্ঞেস করল, "লাড়ু কবে পাকানো হবে?" বড়মামা বললেন, "সে এতক্ষণে হয়ে গেছে, সকালেই টেঁপিকে দেখছিলাম একতাল ক্ষীর নিয়ে দিদির সঙ্গে লাড়ু পাকাতে বসেছে।" হরিপদর মুখখানা আমসির মতো শুকিয়ে এল, সে খানিকটা ঢোক গিলে বলল, "সেঁকো বিষ খেলে কি হয় বড়মামা?" "হবে আবার কি? ইঁদুরগুলো মারা পড়ে, এই হয়।" "আর যদি মানুষে এই লাড়ু খেয়ে ফেলে?" "তা একটু আধটু যদি খেয়ে ফেলে তো নাও মরতে পারে—গলা জ্বলবে, মাথা ঘুরবে, বমি হবে, হয়তো হাত-পা খিঁচবে।" "আর যদি একেবারে এগারোটা লাড়ু খেয়ে ফেলে?" বলে হরিপদ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। তখন বড়মামা হাসি চেপে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "বলিস কিরে! তুই খেয়েছিস নাকি?" হরিপদ কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হ্যাঁ বড়মামা, তার মধ্যে পাঁচটা খুব বড় ছিল। তুমি শিগ্‌গির ডাক্তার ডাক বড়মামা, আমার কি রকম গা ঝিম্‌ঝিম্‌ আর বমি বমি করছে।"

মেজমামা দৌড়ে গিয়ে তার বন্ধু রমেশ ডাক্তারকে পাশের বাড়ি থেকে ডেকে আনলেন। তিনি প্রথমেই খুব একটা কড়া রকমের তেতো ওষুধ হরিপদকে খাইয়ে দিলেন। তারপর তাকে কি একটা শুঁকতে দিলেন, তার এমন ঝাঁঝ যে, বেচারার দুই চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ করে জল পড়তে লাগল। তারপর তাঁরা সবাই মিলে লেপ কম্বল চাপা দিয়ে তাকে ঘামিয়ে অস্থির করে তুললেন। তারপর একটা ভয়ানক উৎকট ওষুধ খাওয়ানো হল। সে এমন বিস্বাদ আর এমন দুর্গন্ধ যে, খেয়েই হরিপদ ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে লাগল।

তারপর ডাক্তার তার পথ্যের ব্যবস্থা করে গেলেন। তিনদিন সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না, চিরেতার জল আর সাগু খেয়ে থাকবে। হরিপদ বলল, "আমি উপরে মা-র কাছে যাব।" ডাক্তার বললেন, "না। যতক্ষণ বাঁচবার আশা আছে ততক্ষণ নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। ও আপনাদের এখানেই থাকবে।" বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ, মা-র কাছে যাবে না আরো কিছু! মাকে এখন ভাবিয়ে তুলে তোমার লাভ কি? তাঁকে এখন খবর দেবার কিছু দরকার নেই।"

তিনদিন পরে যখন সে ছাড়া পেল তখন হরিপদ আর সেই হরিপদ নেই, সে একেবারে বদলে গেছে। তার বাড়ির লোকে সবাই জানে হরিপদর ভারি ব্যারাম হয়েছিল। তার মা জানেন যে বেশি পিঠে খেয়েছিল বলে হরিপদর পেটের অসুখ হয়েছিল। হরিপদ জানে সেঁকো বিষ খেয়ে সে আরেকটু হলেই মারা যাচ্ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি, তা জানেন কেবল হরিপদর বড়মামা আর মেজমামা, আর জানেন রমেশ ডাক্তার—আর এখন জানলে তোমরা, যারা এই গল্প পড়েছ।

ভুল গল্প

[এই গল্পের মধ্যে ইচ্ছা করিয়া কতগুলি ভুল বর্ণনা করা হইয়াছে। কোথাও হয়ত এমন কথাও লেখা হইয়াছে যাহা একেবারেই অসম্ভব ; অথবা এক জায়গায় যাহা লেখা হইয়াছে অন্য জায়গায় তাহারই উল্টা কথা বলা হইয়াছে—একটা ঠিক হইলে আর একটা ঠিক হইতেই পারে না। দেখ তো এই রকম ভুল কতগুলি বাহির করিতে পার।]

রামবাবু লোকটি যেমন কৃপণ, তাঁর প্রতিবেশী বৃন্দাবনচন্দ্রের আবার তেমনি হাত খোলা। দুজনের বহুকালের বন্ধুতা, অথচ কি চেহারায়, কি স্বভাব-প্রকৃতিতে কোথাও দুজনের মিল নেই। বৃন্দাবন বেঁটেখাটো গোলগাল গোছের মানুষ, তাঁর মাথা ভরা টাক, গোঁফ-দাড়ি সব কামানো। ছাপ্পান্ন বছর অতি প্রশংসার সঙ্গে রেজেস্ট্রি অফিসে চাকরি করে শেষদিকে তাঁর খুব পদোন্নতি হয়েছিল ; এখন ষাট বছর বয়সে তিনি সবে মাত্র পেন্‌সন নিয়ে বিশ্রাম করছেন। তিনি, তাঁর গিন্নি, আর এক বুড়ো জ্যেঠামশাই, এ-ছাড়া ত্রিসংসারে তাঁর আর কেউ নেই। জ্যেঠামশাই বিয়েটিয়ে করেননি, বৃন্দাবনের সঙ্গেই থাকেন। রামপ্রসাদ সান্যাল লোকটি ছিপছিপে লম্বা ; পোস্টমাস্টার প্রাণশঙ্কর ঘোষ ছাড়া তেমন ঢ্যাঙা লোক সে পাড়াতে আর খুঁজে পাবে না। এক অক্ষর ইংরাজি জানেন না, কিন্তু মার্বেল পাথর আর পাটের তেলের ব্যবসা করে তিনি প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি করেছেন, দেশে জমিদারী কিনেছেন আর নানারকম কারখানার অংশীদার হয়ে বসেছেন। তাঁর আটটি ছেলে, কিন্তু মেয়ে একটিও হল না বলে তাঁর ভারি দুঃখ। প্রকাণ্ড কপাল, তার উপর একরাশ চুল, মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি আর চোখে হাল-ফ্যাশানের ফ্রেম-ছাড়া চশমা, কানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, কেবল নাকের উপর স্প্রিং দিয়ে এঁটে বসানো। মোট কথা, দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটি কম কেউকেটা নন।

প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই পাড়ার মাতব্বর বাবুরা সবাই রামবাবুর বৈঠকখানা ঘরে এসে জোটেন, আর পান-তামাক-চা-বিস্কুট-সন্দেশ ইত্যাদির সঙ্গে খুব হাসি-তামাশা গল্প-গুজব চলতে থাকে। বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড়, মেঝের উপর প্রকাণ্ড ফরাশ পাতা, তার উপর কতকগুলো মোটাসোটা তাকিয়া আর রঙচঙে হাত-পাখা এদিক ওদিক ছড়ানো। তাছাড়া ঘরের মধ্যে কোথাও চেয়ার-টেবিল বা কোনোরকম আসবাবপত্র একেবারেই নেই। পোস্টমাস্টার বাবু, হরিহর ডাক্তার, যতীশ রায় হেডমাস্টার, ইনস্পেকটার বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি অনেকেই সেখানে প্রায় প্রতিদিন আসেন। বৃন্দাবন বসু বড়ো লাজুক লোক প্রথম প্রথম সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতেন না। সে-পাড়ায় তিনি সবে নতুন এসেছেন কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, খালি পোস্টমাস্টারবাবুর সঙ্গে একটু জানাশোনা। যা হোক, পোস্টমাস্টারবাবু নাছোড়বান্দা লোক, তিনি বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার একরকম জোর করেই তাঁকে রামবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। প্রথমদিনের পরিচয়েই দুজনের আলাপ এমন জমে উঠল যে তারপর থেকে রামবাবুর

বৈঠকে যাবার জন্য বৃন্দাবনচন্দ্রকে আর কোনো তাগিদ দেওয়ার দরকার হত না।

এই ঘটনার সাতদিন পরে একদিন রামবাবুর বৈঠক খুব জমেছে। মানুষকে চিনতে না পারার দরুন কত সময়ে কত অদ্ভুত ভুল হয়, তাই নিয়ে বেশ কথাবার্তা চলছে। হরিহরবাবু বললেন, "আমি একবার যা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম, সে বোধহয় আপনাদের বলিনি। সে প্রায় বিশ বছরের কথা। একদিন সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির ঘুমব ভাবছি, এমন সময়ে আমার ডিসপেনসারির চাকরটা এসে খবর দিল, প্রমথবাবু এসেছেন। প্রমথ মিত্তির তখন তার মাথার ব্যারামের জন্য আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাত। সেদিন কথা ছিল, আমি তার জন্য একটা মিকস্‌চার তৈরি করিয়ে রাখব, সে সন্ধ্যার সময় সেটা নিয়ে যাবে। তাই চাকর এসে খবর দিতেই আমি ওষুধের শিশিটা তার হাতে দিয়ে সেই সঙ্গে একটা কাগজে লিখে দিলাম, 'ওষুধটা এখুনি এক দাগ খাবেন। দুর্বল মস্তিষ্কের পক্ষে কোনোরকম মানসিক পরিশ্রম বা উত্তেজনা ভালো নয়, এ-কথা সর্বদা মনে রাখবেন। তাহলেই আপনার মাথার ব্যারাম শিগ্‌গির সারবে।' মিনিট খানেক যেতে না যেতেই চাকরটা ঘুরে এসে খবর দিল যে বাবুটি চিঠি পড়ে বেজায় খাপ্পা হয়েছেন এবং দাওয়াইয়ের শিশিটি ভেঙে আমায় গাল দিতে দিতে প্রস্থান করেছেন। শুনে তো আমার চক্ষুস্থির! যা হোক, ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে বেশি দেরি হল না। একটু সন্ধান করতেই বোঝা গেল যে, লোকটি মোটেই প্রমথ মিত্তির নন, আমারই মামাশ্বশুর, বাঁশবেড়ের প্রমথ নন্দী। যেরকম বদমেজাজী লোক, সেই রাত্রেই আমায় ছুটতে হল বুড়োর তোয়াজ করবার জন্য। বুড়ো কি সহজে ঠাণ্ডা হয়! তাঁকে অপমান করা, বা তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি করা যে আমার মোটেই অভিপ্রায় ছিল না এবং ওষুধটা কিম্বা চিঠিটা যে তাঁর জন্য দেওয়া হয়নি, এই সহজ কথাটি তাঁর মাথায় ঢোকাতে প্রায় দুটি ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এদিকে বাসায় ফিরে শুনি প্রমথ মিত্তির এসে তার ওষুধ তৈরি না পেয়ে খুব বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। পরদিন সকালে আবার তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি।"

এই গল্প শুনে ইনস্পেকটারবাবু বললেন, "আপনার তো, মশাই, অল্পের উপর দিয়ে গেল, আমার ঐ রকম একটা ভুলের দরুন চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়েছিল। সেও বহু দিনের কথা, তখন আমি সবেমাত্র পুলিসের চাকরি নিয়েছি। ঘোষপুরের বাজার নিয়ে সে সময়ে সুদাস মণ্ডলের সঙ্গে রায়বাবুদের খুব ঝগড়া চলছে। একদিন বিকেলে খবর পাওয়া গেল, আজ সন্ধ্যার পর সুদাস লাঠিয়াল নিয়ে বাজার দখল করতে আসবে। ইনস্পেকটার যোগীনবাবুর হুকুমে আমি ছয়জন কনস্টেবল নিয়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি ঘোষপুরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না; সন্ধ্যার একটু পরেই দেখলাম নদীর দিক থেকে কিসের আলো আসছে। মনে হচ্ছে কারা যেন কাঁঠালতলায় বসে বিশ্রাম করছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্য আমি খুব সাবধানে একটা ঝোপের আড়াল পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মশালের ঝাপসা আলোয় লাঠি হাতে কয়েকটা লোক বসে আছে, আর এক পালকির আড়ালে দুজন লোক কথাবার্তা বলছে। কান পেতে শুনলাম একজন বলল, 'সুদাসদা, কতদূর এলাম?' উত্তর হল, 'এই তো ঘোষপুরের বাজার দেখা যাচ্ছে।' অম্নি আর কথা নেই! আমি জোরে শিস্‌ দিতেই সঙ্গের পুলিশগুলো মার-মার করে তেড়ে এসেছে। পুলিশের সাড়া পাবামাত্র সুদাসের লোকগুলো 'বাপরে মারে' করে কে যে কোথায় সরে পড়ল তা আর ধরতেই পারা গেল না। কিন্তু পালকির কাছে যে দুটো লোক ছিল, তারা খুব সহজেই ধরা পড়ে গেল। তাদের একজনের বয়েস অল্প,

চেহারাটা গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের—বুঝলাম এই সুদাস মণ্ডল। সে আমায় তেড়ে কি যেন বলতে উঠেছিল, আমি এক ধমক লাগিয়ে বললাম, 'হাতে হাতে ধরা পড়েছ বাপু, এখন রোখ করে কোনো লাভ নেই, কিছু বলবার থাকে তো থানায় গিয়ে ব'লো।' শুনে তার সঙ্গের বুড়ো লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে খানিকক্ষণ অনর্গল কি যে বকে গেল আমি তার কিছুই বুঝলাম না, খালি বুঝলাম যে সে আমাকে তার 'সুদাসদা'র পরিচয় বোঝাচ্ছে। আমি বললাম, 'অত পরিচয় শুনবার আমার দরকার নেই, আসল পরিচয়টা আজ ভালোরকমই পেয়েছি।' তারপর তাদের হাতকড়া পরিয়ে মহা ফুর্তিতে তো থানায় এনে হাজির করা গেল। তারপর মশাই যা কাণ্ড! হেড ইনস্পেকটার যতীনবাবু রাগে আগুনের মতো লাল হয়ে, টেবিল থাবড়িয়ে, দোয়াত উলটিয়ে, কাগজ কলম ছুঁড়ে আমায় খুব সহজেই বুঝিয়ে দিলেন যে আমি একটি আস্ত রকমের হস্তীমূর্খ ও অর্বাচীন পাঁঠা। যে লোকটিকে ধরে এনেছি সে মোটেই সুদাস মণ্ডল নয়, তার নাম সুবাসচন্দ্র বোস; সে যতীনবাবুরই জামাই, সঙ্গের লোকটি তার ঠাকুরদার আমলের চাকর; যতীনবাবুর কাছেই তারা আসছিল। আমার বুদ্ধিটা হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতো না হলে, আমি সুবাস শুনতে কখনই সুদাস শুনতাম না—ইত্যাদি। অনেক কষ্টে অনেক খোশামুদি করে, অনেক হাতে পায়ে ধরে, সে যাত্রায় চাকরিটা বজায় রাখতে হয়েছিল।"

ইনস্পেকটারের গল্প শেষ হতেই বৃন্দাবনচন্দ্র টিকি দুলিয়ে বললেন, "আপনাদের গল্প শুনে আমারও একটা গল্প মনে পড়ে গেল। সেও ঐরকম 'উদোর-বোঝা-বুদোর-ঘাড়ে' গোছের গল্প। তবে ভুলটা আমি নিজে করিনি, করেছিল আমার ভাইপো—সেই যে ছোকরাটি এখন মেডিকেল কলেজে পড়ে। একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে বসে আছি। ঘরেও বাতি জ্বালা হয়নি, বাইরেও বেশ অন্ধকার, খালি সরু নখের মতো একটুখানি চাঁদ সবেমাত্র পূর্বদিকে উঁকি দিয়েছে; এমন সময় মনে হল যেন একটা মানুষ দেয়াল বেয়ে বেয়ে বাড়ির ছাদের উপর উঠছে—"

বৃন্দাবনবাবু সবে এইটুকু বলেছেন, এমন সময় বারান্দায় কে ডাক দিল, "বাবু, টেলিগ্রাম।" রামবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে টেলিগ্রামখানা নিয়ে আসলেন, তারপর চোখের চশমাটি কপালে তুলে টেলিগ্রামখানা খুলে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ ক্রমেই গোল হয়ে উঠছে দেখে ডাক্তারবাবু জিগগেস করলেন, "কি ব্যাপার-খানা কি?" রামবাবু ধপাস্ করে সোফার উপর বসে পড়ে বললেন, "এই দেখুন না, দেশ থেকে পরেশ টেলিগ্রাম করছে—সিরিয়াস্ এক্সিডেন্ট কাম্ হোম ইমেডিয়েটলি।" (অর্থাৎ গুরুতর দুর্ঘটনা, শীঘ্র বাড়ি আসুন)। রামবাবুর তিন ছেলে কয়দিন হল পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়েছে, আর একটি মামাবাড়িতে আছে, আর বাকি তিনটে মায়ের কাছে বাড়িতেই রয়েছে। রামবাবু বললেন, "এত লোক থাকতে পরেশ ছোকরাটাকে দিয়েই বা টেলিগ্রাম করাতে গেল কেন? দুটো পয়সা খরচ করে বড়রা কেউ একটু ভালো করে গুছিয়ে টেলিগ্রাম করলেই পারত। এখন কি যে করি? আজ বিষ্যুৎবার, এ-সময়ে রওয়ানাই বা হই কেমন করে কিছুই তো বুঝতে পারছি না।" তিনি চাকরকে ডেকে তিনতলার বড় ঘর থেকে তাঁর কলমটা আনতে বললেন, আর বললেন, "একটা টেলিগ্রাম করে দেখা যাক কি জবাব আসে।" এই ব'লে তিনি আবার টেলি-গ্রামখানা পড়তে লাগলেন।

গল্পগুজব তো চুলোয় গেল, সবাই মিলে ভাবতে বসল এখন কি করা যায়। এমন সময় রামবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "ও কি! এ কার টেলিগ্রাম? এ তো দেখছি 'রমাপদ

সেন' লেখা। আমার কি যে চোখ হয়েছে, আমি পড়ছি রমাপ্রসাদ সান্যাল।" বলতেই পোস্টমাস্টার প্রিয়শঙ্করবাবু বলে উঠলেন, "ও! রমাপদ যে ও-পাড়ার গুপীবাবুর ভাই, আমি জানি তার শ্বশুরের নাম পরেশনাথ কি যেন।" তখন খুব একটা হাসির ধুম পড়ে গেল।

রামবাবু বললেন, "দেখলেন মশাই, পিয়ন ব্যাটার কাণ্ড! এক ভুল টেলিগ্রাম দিয়ে আমায় মেরেছিল আর কি! একে বুড়ো বয়েস, তাতে আবার জানেন তো আমার হার্টের ব্যারাম আছে।" হেডমাস্টার যতীশবাবু শুনে হেসে বললেন, "আপনি আবার এর মধ্যেই বুড়ো হলেন কি করে?" রামবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! এ পাড়ায় আমার মতন বুড়ো আর ক'টি খুঁজে পান দেখুন তো! এই আষাঢ় মাসে আমি ষাটের কোঠায় পা দিয়েছি।" বৃন্দাবনবাবু বললেন, "তাহলে আমার জ্যেঠামশায়ের কাছে আপনার হার মানতে হল। তাঁর বয়েস ঊনসত্তর।" ডাক্তারবাবু বললেন, "আমারও বড় কম হয়নি, চৌষট্টি পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ-পাড়ায় বয়েসের জন্য যদি প্রাইজ দিতে হয়, তাহলে ভোলানাথের বাপকেই দেওয়া উচিত; তার নাকি এখন আটাত্তর বছর চলেছে।" এই রকম বাজে কথা চলছে, এমন সময়ে বড় বড় বারকোশের উপর থালা সাজিয়ে রামবাবুর তিনটে চাকর খাবার নিয়ে হাজির। কচুরি, নিমকি, সন্দেশ থেকে পিঠে পায়েস পর্যন্ত প্রায় বারো-চোদ্দ রকমের খাবার। ডাক্তার বললেন, "বাপরে! এ যে বিরাট আয়োজন। ব্যাপারখানা কি?" রামবাবু বললেন, "ঐ যা! আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। আজ আমার জামাই এসেছেন, তাই বাড়িতে একটু মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়েছে।" ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "এত বড় গুরুতর কথাটাই বলতে ভুলে গেলেন? আপনার বয়েসটা নিতান্তই বেড়ে গেছে দেখছি।" বৃন্দাবনবাবু বললেন, "তা হোক, আজকের বৈঠকে অনেক রকমই ভুলের কাণ্ড শুনলাম আর দেখলাম, কিন্তু এ ভুলটি বেশিদূর গড়ায়নি। আসুন, এখন ভুলটা সংশোধন করে নেওয়া যাক।"

ভুলের তালিকা

(১) গোড়াতেই রামবাবুকে কৃপণ বলা হইয়াছে, কিন্তু গল্পে তাঁহার স্বভাবের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটেই কৃপণের মতো নয়।

(২) বলা হইয়াছে রামবাবু ও বৃন্দাবনবাবুর মধ্যে বহুকালের বন্ধুতা অথচ পরেই বলা হইয়াছে কারো সঙ্গেই বৃন্দাবনবাবুর আলাপ পরিচয় নাই।

(৩) প্রথমেই বৃন্দাবনবাবুর মাথা-ভরা টাক বলা হইয়াছে, অথচ তিনি টিকি দুলাইতেছেন।

(৪) প্রথমে বলা হইয়াছে তাঁহার বয়স ৬০, কিন্তু তিনি চাকরি করিয়াছেন ৫৬ বৎসর।

(৫) বলা হইয়াছে যে গিন্নী আর জ্যেঠামহাশয় ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই, কিন্তু পরে তাঁহার এক ভাইপোকে হাজির করা হইয়াছে।

(৬) প্রথমে পোস্টমাস্টারের নাম বলা হইয়াছে প্রাণশঙ্কর, পরে লেখা হইয়াছে প্রিয়শঙ্কর।

(৭) রামবাবু ইংরাজী জানেন না, অথচ তিনি চটপট ইংরাজী টেলিগ্রাম পড়িতেছেন।

(৮) রামবাবু পাটের তেলের ব্যবসা করেন কিন্তু এরকম কোনো তেল বা ব্যবসার

কথা শোনা যায় না।

(৯) তাঁহার বাড়ি দোতলা বলা হইয়াছে কিন্তু চাকরকে তিনতলায় পাঠানো হয়েছে।

(১০) রামবাবুর আটটি ছেলে কিন্তু মাত্র সাতটির হিসাব পাওয়া যাইতেছে।

(১১) রামবাবুর মেয়ে নাই কিন্তু তাঁহার এক জামাই আসিয়া হাজির।

(১২) তাঁহার চশমার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেরূপ চশমা কপালে তোলা যায় না।

(১৩) প্রথমে বলা হইয়াছে ঘরে কোনোরকম আসবাবপত্র নাই কিন্তু পরে সোফার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১৪) বলা হইয়াছে, 'বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার' বৃন্দাবন রামবাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন; গল্পের ঘটনা তাহার 'সাত দিনের পরে' সুতরাং সেদিন বৃহস্পতিবার হইতেই পারে না।

(১৫) বড়দিনের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পুজোর ছুটি অসম্ভব।

(১৬) বৃন্দাবনবাবুর বয়েস গোড়াতেই ৬০ বলা হইয়াছে। তাহা হইলে তাঁর জ্যেঠা-মহাশয়ের বয়েস মোটে ৬৯ হইতেই পারে না।

(১৭) চাঁদকে যখন আমরা সূর্যের কাছাকাছি দেখি তখনই তাহার চেহারা থাকে 'সরু নখের মতো।' সন্ধ্যার সময় পূর্বদিকে, অর্থাৎ সূর্যের উল্টা দিকে তাহার ওরকম চেহারা অসম্ভব।

বহুরূপী

গল্প

"বড়মামা, একটা গল্প বল না।"

"গল্প? এক ছিল গ, এক ছিল ল আর এক ছিল প—"

"না—ও গল্পটা না। ওটা বিচ্ছিরি গল্প—একটা বাঘের গল্প বল।"

"আচ্ছা। যেখানে মস্ত নদী থাকে আর তার ধারে প্রকাণ্ড জঙ্গল থাকে—সেইখানে একটা মস্ত বাঘ ছিল আর ছিল একটা শেয়াল।"

"না, শেয়াল তো বলতে বলিনি—বাঘের গল্প।"

"আচ্ছা, বাঘ ছিল, শেয়াল-টেয়াল কিছু ছিল না। একদিন সেই বাঘ করেছে কি একটা ছোট্ট সুন্দর হরিণের ছানার ঘাড়ে হাল্লুম ক'রে কাম্‌ড়ে ধরেছে—"

"না—সে রকম গল্প আমার শুনতে ভালো লাগে না। একটা ভালো গল্প বল।"

"ভালো গল্প কোথায় পাব? আচ্ছা শোন—এক ছিল মোটা বাবু আর এক ছিল রোগা বাবু। মোটা বাবু কিনা মোটা, তাই তার নাম বিশ্বম্ভর, আর রোগা বাবু কিনা রোগা, তাই তার নাম কানাই।"

"বিস্‌-কম্বল মানে কি মোটা, আর কানাই মানে রোগা?"

"না; মোটা কিনা, তাই তার মস্ত মোটা নাম—বিশ্‌-শম্‌-ভর্‌। আর রোগা লোকের নাম কানাই।"

"রোগা কানাই বলল, 'মোটা বিশ্বম্ভর, তোমার এমন বিচ্ছিরি ঢাকাই জালার মতন চেহারা কেন?' মোটা বিশ্বম্ভর বলল, 'রোগা কানাই, তোর হাত পা কেন কাঠির মতন, হাড়গিল্লের ঠ্যাঙের মতন, রোদে-শুকনো দড়ির মতন?' তখন তারা ভয়ানক চটে গেল। রোগা বলল, 'মোট্‌কা লোকের বুদ্ধি মোটা।' মোটা বলল, 'রোগা লোকের কিপটে মন।'"

"মোটা বুদ্ধি মানে কি বোকা বুদ্ধি?"

"হ্যাঁ। তারপর শোন—মোটা আর রোগা তখন খুব ঝগড়া করতে লাগল। এ বলল, 'রোগা মানুষ ভালো নয়'—ও বলল, 'মোটা হলেই দুষ্টু হয়।' তখন তারা বলল, 'আচ্ছা চল তো পণ্ডিতের কাছে—বইয়েতে কী লেখা আছে—জিজ্ঞাসা কর তো।'

"বইয়েতে কি সব কথা লেখা থাকে?"

"হ্যাঁ, থাকে। তারা তখন দুজনেই পণ্ডিতের কাছে গিয়ে নালিশ করল। পণ্ডিতমশাই নাকের আগায় চশমা এঁটে, কানের ফাঁকে কলম গুঁজে, মুণ্ডু নেড়ে, টিকি ঝেড়ে তেড়ে বললেন, 'রোসো! দাঁড়াও, একটু বসো—রোগা এবং মোটা এদের কে কি রকম পাজী, বিচার করব আজই।' এই বলে পণ্ডিতমশাই তাকিয়ার উপর পাশ ফিরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন। রোগা কানাই আর মোটা বিশ্বম্ভর বসেই আছে বসেই আছে—এক ঘণ্টা যায়, দু ঘণ্টা যায়! তখন পণ্ডিতমশাই চোখ রগড়িয়ে বললেন, 'ব্যাপারখানা কি?' বাবুরা বলল, 'আজ্ঞে, সেই রোগা আর মোটার কথা।' পণ্ডিত বললেন, 'ঠিক ঠিক'—এই বলে প্রকাণ্ড একখানা বই নিয়ে মুখ বাঁকিয়ে হেলেদুলে, ষাঁড়ের মতন সুরটি ক'রে তিনি বলতে লাগলেন—'বইয়ে আছে—

মোটকা মানুষ হোৎকা মুখ,
বুদ্ধি ভোঁতা আহাম্মুক—'

অমনি রোগা কানাই হো হো ক'রে হেসে উঠল। তখন পণ্ডিত বললেন—

'শুক্‌নো লোকের শয়তানি
দেমাক দেখে হার মানি।'

তাই শুনে মোটাবাবু হেসে লুটোপুটি। তখন পণ্ডিত বললেন, 'বইয়ে লিখেছে—

মস্ত মোটা মানুষ যত
আস্ত কোলা ব্যাঙের মতো
নিষ্কর্মা সব হদ্দ কুঁড়ে
কুমড়ো গড়ায় রাস্তা জুড়ে!
—আর—
চিম্‌সে রোগা যত ব্যাটা
বিষম ফাজিল-বেদম জ্যাঠা
শুঁট্‌কো লোকের কারসাজী
হিংসুটে আর হাড় পাজী॥'

তাই শুনে রোগা মোটা দুয়ে মিলে ভয়ানক রকম চটে গেল।

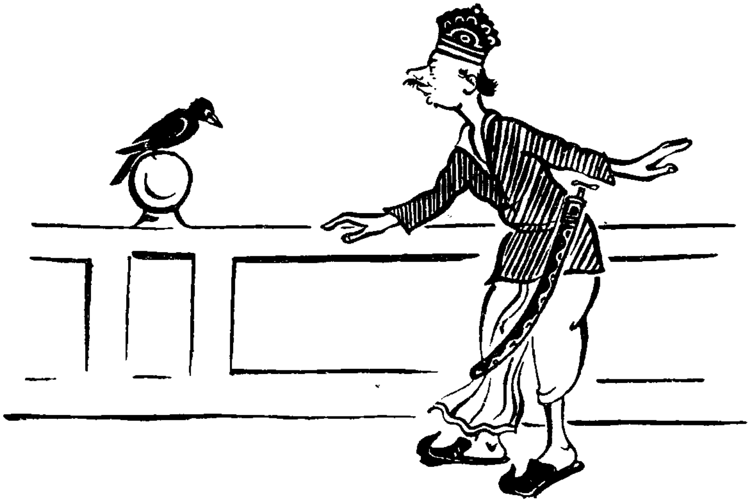
পণ্ডিত বললেন—

'দুটোই বাঁদর দুটোই গাধা
রোগা মোটা সমান হাঁদা।
ভণ্ড বেড়াল পালের ধাড়ী
লাগাও মুখে ঝাঁটার বাড়ি।
মাথায় মাথায় ঠুকে ঠুকে
চুন কালি দাও দুটো মুখে॥'

"এই বলে পণ্ডিতমশাই এক টিপ নস্যি নিয়ে, নাকে মুখে গুঁজে, আবার নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন।"

"তারপর সেই বাবুরা কী বললে?"

"বাবুরা হাঁ ক'রে বোকার মতো মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বাড়ি চলে গেল, আর ভাবল পণ্ডিতটা কী বোকা!"



ড্রিঘাংচু

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওম্‌রা সিপাই শান্ত্রী গিজ্‌ গিজ্‌ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর ব'সে ঘাড় নিচু ক'রে চারদিক তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কঃ"।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ—সভাসুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে একসঙ্গে হাঁ ক'রে রইল। মন্ত্রী এক তাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই ক'রে রাজার মাথার উপর পড়ে গেল। রাজা মশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাক।"

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজা মশাই বললেন, "মাথা কেটে ফেল।" সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে? সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। রাজা মশায় খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোড় ক'রে বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?" রাজা বললেন, "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে! যে ঐ রকম বিট্‌কেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় ক'রে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন যে, ঐ কাকটাই ওরকম আওয়াজ

করেছিল। তখন রাজা মশাই বললেন, "ডাকো, পণ্ডিত সভার যত পণ্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজা মশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ ক'রে গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বলতে পার?"

কাক আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি! পণ্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা মতো পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল,— "আজ্ঞে, বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল।"

রাজা মশাই বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রি হয়! মন্ত্রী, ওঁকে বিদেয় ক'রে দাও—" সকলে মহা তম্বী ক'রে বললে, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ওকে বিদেয় করুন।"

আর একজন পণ্ডিত বললেন, "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কি?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য এই যে, তোমার মতো মোটা বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের এ রকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুরমতো খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজা মশাইয়ের খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা" ব'লে গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা সুঁটকো মতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র উজির নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী হলো, কী হলো?"

তখন অনেক জলের ছিটা পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল, "মহারাজ, সেটা কী দাঁড়কাক ছিল?" সকলে বলল, "হাঁ-হাঁ-হাঁ, কেন বল দেখি?" লোকটা আবার বলল, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসেছিল—আর মাথা নিচু ক'রে ছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর 'কঃ' ক'রে শব্দ করেছিল?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন?"

রাজা বললেন, "তাই তো, একে তখন তোমরা খবর দাওনি কেন?" লোকটাকে কেউই চেনে না, তবু সে কথা বলতে সাহস পেল না, সবাই বললে, "হ্যাঁ, ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কী খবর দেবে, একথা কেউই বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত ক'রে বলল, "দ্রিঘাংচু"। সে আবার কি! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দিঘাঙু কি হে?" লোকটা বলল, "দিঘাঙু নয়, দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল, "ও!" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম হে," লোকটা বলল, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের উপর ব'সে মাথা নিচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে, চোখ পাকিয়ে 'কঃ' ব'লে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।"

রাজা বললেন, ''তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কী?'' লোকটা বলল, "মহারাজ, সে কথা বললে লোকে যদি বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল।" সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বলল, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র যদি তাকে বলতে পারতাম তা হলে কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোনো বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব?" রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বলত।" লোকটা বলল, "সর্বনাশ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে, তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হ'লেই সর্বনাশ!"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজা মশাই দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজা মশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ ক'রে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোনো রকম আশ্চর্য কিছু হয় কি না! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পাননি।

এক বছরের রাজা

এক ছিলেন সওদাগর--তাঁর একটি সামান্য ক্রীতদাস তাঁর একমাত্র ছেলেকে জল থেকে বাঁচায়। সওদাগর খুশি হয়ে তাকে মুক্তি তো দিলেনই, তা ছাড়া জাহাজ বোঝাই ক'রে নানা রকম বাণিজ্যের জিনিস তাকে বকশিশ দিয়ে বললেন, ''সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে যাও—এই সব জিনিস বেচে যা টাকা পাবে, সবই তোমার।" ক্রীতদাস মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়ে রওনা হল বাণিজ্য করতে।

কিন্তু বাণিজ্য করা আর হল না। সমুদ্রের মাঝখানে তুফান উঠে জাহাজটিকে ভেঙে-চুরে জিনিসপত্র লোকজন কোথায় যে ভাসিয়ে নিল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না!

ক্রীতদাসটি অনেক কষ্টে হাবুডুবু খেয়ে, একটা দ্বীপের চড়ায় এসে ঠেকল। সেখানে ডাঙায় উঠে সে চারিদিকে চেয়ে দেখল, তার জাহাজের চিহ্নমাত্র নাই, তার সঙ্গের লোকজন কেউ নাই। তখন সে হতাশ হয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে পড়ল। তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে এল, তখন সে উঠে দ্বীপের ভিতর দিকে যেতে লাগল। সেখানে বড় বড় গাছের বন—তারপর প্রকাণ্ড মাঠ, আর তারই ঠিক মাঝখানে চমৎকার শহর। শহরের ফটক দিয়ে মশাল হাতে মেলাই লোক বার হচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই সেই লোকেরা চীৎকার ক'রে বলল, "মহারাজের শুভাগমন হোক। মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন।" তারপর সবাই তাকে খাতির ক'রে জমকালো গাড়িতে চড়িয়ে, প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানের চাকরগুলো তাড়াতাড়ি রাজপোশাক এনে তাকে সাজিয়ে দিল।

সবাই বলছে, 'মহারাজ', 'মহারাজ', হুকুম মাত্র সবাই চট্‌পট্‌ কাজ করছে, এসব দেখেশুনে সে বেচারা একেবারে অবাক। সে ভাবল সবই বুঝি স্বপ্ন—বুঝি তার নিজেরই মাথা খারাপ হয়েছে তাই এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারল সে জেগেই আছে আর দিব্যি জ্ঞানও রয়েছে, আর যা যা ঘটছে সব সত্যিই। তখন সে লোকদের বলল, ''এ কি রকম হচ্ছে বল তো? আমি তো এর কিছুই বুঝছি না। তোমরা কেনই বা আমায় 'মহারাজ' বলছ আর কেনই বা এমন সম্মান দেখাচ্ছ?''

তখন তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো উঠে বলল, "মহারাজ, আমরা কেউ মানুষ নই--আমরা সকলেই প্রেতগন্ধর্ব—যদিও আমাদের চেহারা ঠিক মানুষেরই মতো। অনেক দিন আগে আমরা 'মানুষ রাজা' পাবার জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা করেছিলাম; কারণ, মানুষের মতো বুদ্ধিমান আর কে আছে? সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মানুষ রাজার অভাব হয়নি। প্রতি বৎসরে একটি ক'রে মানুষ এইখানে আসে, আর আমরা তাকে এক বৎসরের জন্য রাজা করি। তার রাজত্ব শুধু ঐ এক বৎসরের জন্যই। বৎসর শেষ হলেই তাকে সব ছাড়তে হয়। তাকে জাহাজে ক'রে সেই মরুভূমির দেশে রেখে আসা হয়, যেখানে সামান্য ফল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না—আর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বালি না খুঁড়লে এক ঘটি জলও মেলে না। তারপর আবার নূতন রাজা আসে—এই রকমে বৎসরের পর বৎসর আমাদের চলে আসছে।"

তখন দাসরাজা বললেন, ''আচ্ছা বল তো—এর আগে তোমাদের রাজারা কি রকম

স্বভাবের লোক ছিলেন?" বুড়ো বলল, "তাঁরা সবাই ছিলেন অসাবধান আর খামখেয়ালি। সারাটি বছর সবাই শুধু জাঁকজমকে আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাতেন—বছর শেষে কি হবে কেউ সে কথা ভাবতেন না।"

নতুন রাজা মন দিয়ে সব শুনলেন, বছরের শেষে তাঁর কি হবে এই কথা ভেবে ক'দিন তাঁর ঘুম হল না!

তারপর সে দেশের সকলের চেয়ে জ্ঞানী আর পণ্ডিত যারা, তাদের ডেকে আনা হল, আর রাজা তাদের কাছে মিনতি ক'রে বললেন, "আপনারা আমাকে উপদেশ দিন—যাতে বছর শেষে এই সর্বনেশে দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।"

তখন সবচেয়ে প্রবীণ বৃদ্ধ যে, সে বলল, "মহারাজ, শূন্য হাতে আপনি এসেছিলেন, শূন্য হাতেই আবার সেই দেশে যেতে হবে—কিন্তু এই এক বছর আপনি আমাদের যা ইচ্ছা হয় তাই করাতে পারেন। আমি বলি—এই বেলা রাজ্যের ওস্তাদ লোকদের সেই দেশে পাঠিয়ে, সেখানে বাড়ি ক'রে, বাগান ক'রে, চাষবাসের ব্যবস্থা ক'রে চারিদিক সুন্দর ক'রে রাখুন। ততদিনে ফলে ফুলে দেশ ভরে উঠবে, সেখানে লোকের যাতায়াত হবে। আপনার এখানকার রাজত্ব শেষ হতেই সেখানে আপনি সুখে রাজত্ব করবেন। বৎসর তো দেখতে দেখতে চলে যাবে, অথচ কাজ আপনার ঢের; কাজেই বলি, এই বেলা খেটে-খুটে সব ঠিক ক'রে নিন।" রাজা তখনই হুকুম দিয়ে লোকলস্কর, জিনিসপত্র, গাছের চারা, ফলের বীজ, আর বড় বড় কলকব্জা পাঠিয়ে, আগে থেকে সেই মরুভূমিকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন।

তারপর বছর যখন ফুরিয়ে এল, তখন প্রজারা তাঁর ছত্র মুকুট রাজদণ্ড সব ফিরিয়ে নিল, তাঁর রাজার পোশাক ছাড়িয়ে এক বছর আগেকার সেই সামান্য কাপড় পরিয়ে, তাঁকে জাহাজে তুলে সেই মরুভূমির দেশে রেখে এল। কিন্তু সে দেশ আর এখন মরুভূমি নাই—চারিদিকে ঘর বাড়ি, পথ ঘাট, পুকুর বাগান। সে দেশ এখন লোকে লোকারণ্য। তারা সবাই এসে ফুর্তি ক'রে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এক বছরের রাজা সেখানে জন্ম ভরে রাজত্ব করতে লাগলেন।

হিংসুটি

এক ছিল দুষ্টু মেয়ে—বেজায় হিংসুটে, আর বেজায় ঝগড়াটি। তার নাম বলতে গেলেই তো মুশকিল, কারণ ঐ নামে শান্ত লক্ষ্মী পাঠিকা যদি কেউ থাকেন, তাঁরা তো আমার উপর চটে যাবেন।

হিংসুটির দিদি বড় লক্ষ্মী মেয়ে—যেমন কাজে কর্মে, তেমনি লেখাপড়ায়। হিংসুটির বয়েস সাত বছর হ'য়ে গেল, এখনও তার প্রথম ভাগই শেষ হল না—আর তার দিদি তার চাইতে মোটে এক বছরের বড়, সে এখনই "বোধোদয়" আর "ছেলেদের রামায়ণ" পড়ে ফেলেছে, ইংরিজি ফার্স্ট বুক তার কবে শেষ হয়ে গেছে। হিংসুটি কিনা সবাইকে হিংসে করে, সে তো দিদিকেও হিংসে করত। দিদি স্কুলে যায়, প্রাইজ পায়—হিংসুটি খালি বকুনি খায় আর শাস্তি পায়।

দিদি যেবার ছবির বই প্রাইজ পেলে আর হিংসুটি কিচ্ছু পেলে না, তখন যদি তার অভিমান দেখতে! সে সারাটি দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে ব'সে রইল—কারও সঙ্গে কথাই বলল না। তারপর রাত্রিবেলায় দিদির অমন সুন্দর বইখানাকে কালি ঢেলে, মলাট ছিঁড়ে, কাদায় ফেলে নষ্ট করে দিল। এমন দুষ্টু হিংসুটে মেয়ে!

হিংসুটির মামা এসেছেন, তিনি মিঠাই এনে দু'বোনকেই আদর ক'রে খেতে দিয়েছেন। হিংসুটি খানিকক্ষণ তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলল। মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কি রে, কী হ'ল? জিভে কামড় লাগল নাকি?" হিংসুটির মুখে আর কথা নেই, সে কেবলই কাঁদছে। তখন তার মা এক ধমক দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে বল্ না!" তখন হিংসুটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "দিদির ঐ রসমুণ্ডিটা আমারটার চাইতেও বড়।" তাই শুনে দিদি তাড়াতাড়ি নিজের রসমুণ্ডিটা তাকে দিয়ে দিল। অথচ হিংসুটি নিজে যা খাবার পেয়েছিল তার অর্ধেক সে খেতে পারল না—নষ্ট ক'রে ফেলে দিল। দিদির জন্মদিনে দিদির জন্য নতুন জামা, নতুন কাপড় আস্‌লে হিংসুটি তাই নিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তোলে।

একদিন হিংসুটি তার মায়ের আলমারি খুলে দেখে কি—লাল জামা গায়ে, লাল জুতা পায়ে, টুক্‌টুকে রাঙা পুতুল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে। হিংসুটি বলল, "দেখেছ! দিদি কি দুষ্টু! নিশ্চয়ই মামার কাছ থেকে পুতুল আদায় করেছে—আবার আমায় না দেখিয়ে মায়ের কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছে!" তখন তার ভয়ানক রাগ হল। সে ভাবল, "আমি তো ছোট বোন, আমারই তো পুতুল পাওয়া উচিত। দিদি কেন মিছিমিছি পুতুল পাবে?" এই ভেবে সে পুতুলটাকে উঠিয়ে নিল।

কি সুন্দর পুতুল! কেমন মিট্‌মিটে চোখ, আর ফুট্‌ফুটে মুখ, কেমন কচি কচি হাত পা, আর টুক্‌টুকে জামা কাপড়! যত সব ভালো ভালো জিনিস সব কিনা দিদি পাবে! হিংসুটির চোখ ফেটে জল এল। সে রেগে পুতুলটাকে আছড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তাতেও তার রাগ গেল না; সে একটা ডাণ্ডা নিয়ে ধাঁই ধাঁই ক'রে পুতুলটাকে মারতে লাগল। মারতে মারতে তার নাক মুখ হাত পা ভেঙে, তার জামা কাপড়

ছিঁড়ে—আবার তাকে বাক্সের মধ্যে ঠেসে সে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

বিকেলবেলা মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন আর বললেন, "তোর জন্য কি এনেছি দেখিস্‌নি?" শুনে হিংসুটি দৌড়ে এল, "কই মামা? কী এনেছ দাও না।"

মামা বললেন, "মার কাছে দেখ্‌ গিয়ে কেমন সুন্দর পুতুল এনেছি।" হিংসুটি উৎসাহে নাচতে লাগল, মাকে বলল, "কোথায় রেখেছ মা?" মা বললেন, "আলমারিতে আছে।" শুনে ভয়ে হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে উঠল। সে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, "সেটার কি লাল জামা আর লাল জুতো পরান—মাথায় কালো কালো কোঁকড়ানো চুল ছিল?" মা বললেন, "হ্যাঁ, তুই দেখেছিস্‌ নাকি?"

হিংসুটির মুখে আর কথা নেই! সে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে তারপর একেবারে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এর পরে যদি তার হিংসে আর দুষ্টুমি না কমে, তবে আর কী ক'রে কমবে?

দুই বন্ধু

এক ছিল মহাজন, আর এক ছিল সওদাগর। দুজনে ভারি ভাব। একদিন মহাজন এক থলি মোহর নিয়ে তার বন্ধুকে বলল, "ভাই, ক'দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি; আমার কিছু টাকা তোমার কাছে রাখতে পারবে?" সওদাগর বলল, "পারব না কেন? তবে কি জানো, পরের টাকা হাতে রাখা আমি পছন্দ করি না। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে আর বলবার কী আছে, আমার ঐ সিন্দুকটি খুলে তুমি নিজেই তার মধ্যে তোমার টাকাটা রেখে দাও—আমি ও টাকা ছোঁব না।" তখন মহাজন তার থলে ভরা মোহর সেই সওদাগরের সিন্দুকের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি গেল।

এদিকে হয়েছে কি, বন্ধু যাবার পরেই সওদাগরের মনটা কেমন উস্‌খুস্‌ করছে। সে কেবলই ঐ টাকার কথা ভাবছে আর তার মনে হচ্ছে যে বন্ধু না জানি কত কী রেখে গেছে! একবার খুলে দেখতে দোষ কি? এই ভেবে সে সিন্দুকের ভিতর উঁকি মেরে থলিটা খুলে দেখল—থলি ভরা চক্‌চকে মোহর! এতগুলো মোহর দেখে সওদাগরের ভয়ানক লোভ হল—সে তাড়াতাড়ি মোহরগুলো সরিয়ে তার জায়গায় কতগুলো পয়সা ভরে থলিটাকে বন্ধ ক'রে রাখল।

দশ দিন পরে তার বন্ধু যখন ফিরে এল, তখন সওদাগর খুব হাসিমুখে তার সঙ্গে গল্প-সল্প করল, কিন্তু তার মনটা কেবলই বলতে লাগল, "কাজটা ভালো হয়নি। বন্ধু এসে বিশ্বাস করে টাকাটা রাখল, তাকে ঠকানো উচিত হয়নি।" একথা সেকথার পর মহাজন বলল, "তাহলে বন্ধু, আজকে টাকাটা নিয়ে এখন উঠি—সেটা কোথায় আছে?" সওদাগর বললে, "হ্যাঁ বন্ধু, সেটা নিয়ে যাও। তুমি যেখানে রেখেছিলে সেইখানেই পাবে—আমি থলিটা আর সরাইনি।" বন্ধু তখন সিন্দুক খুলে তার থলিটা বের ক'রে নিল। কিন্তু, কি সর্বনাশ! থলিভরা মোহর ছিল, সব গেল কোথায়? সব যে কেবল পয়সা! মহাজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল!

সওদাগর বলল, "ওকি বন্ধু! মাটিতে বসলে কেন?" বন্ধু বলল, "ভাই, সর্বনাশ হয়েছে! আমার থলিভরা মোহর ছিল—এখন দেখছি একটাও মোহর নাই, কেবল কতগুলো পয়সা!" সওদাগর বলল, "তাও কি হয়? মোহর কখনও পয়সা হয়ে যায়?" সওদাগর চেষ্টা করছে এরকম ভাব দেখাতে যেন সে কতই আশ্চর্য হয়েছে; কিন্তু তার বন্ধু দেখল তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে তার আর বাকি রইল না—তবু সে কোনো রকম রাগ না দেখিয়ে হেসে বলল, "আমি তো মোহর মনে করেই রেখেছিলাম—এখন দেখছি কোথাও কোনো গোল হয়ে থাকবে। যাক যা গেছে তা গেছেই—সে ভাবনায় আর কাজ নেই।" এই বলে সে সওদাগরের কাছে বিদায় নিয়ে পয়সার থলি বাড়িতে নিয়ে গেল। সওদাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু'মাস পরে হঠাৎ একদিন মহাজন তার বন্ধুর বাড়ি এসে বলল, "বন্ধু, আজ আমার বাড়িতে পিঠে হচ্ছে—বিকেলে তোমার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও!" বিকালবেলা সওদাগর তার ছেলেকে নিয়ে মহাজনের বাড়িতে রেখে এল, আর বলল, "সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যাব।" মহাজন করল কি, ছেলেটার পোশাক বদলিয়ে তাকে কোথায় লুকিয়ে

রাখল—আর একটা বাঁদরকে সেই ছেলের পোশাক পরিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিল।

সন্ধ্যার সময় সওদাগর আসতেই তার বন্ধু এসে মুখখানা হাঁড়ির মতো করে বলল, "ভাই! একটা বড় মুশকিলে পড়েছি। তোমার ছেলেটিকে তুমি যখন দিয়ে গেলে, তখন দেখলাম দিব্যি কেমন নাদুস-নুদুস ফুটফুটে চেহারা—কিন্তু এখন দেখছি কি রকম হয়ে গেছে—ঠিক যেন বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে! কি করা যায় বলত বন্ধু!" ব্যাপার দেখে সওদাগরের তো চক্ষুস্থির! সে বলল, "কি পাগলের মতো বক্‌ছ? মানুষ কখনও বাঁদর হয়ে যায়?" মহাজন অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো বলল, "কি জানি ভাই! আজকাল কি সব ভূতের কাণ্ড হচ্ছে, কিছু বুঝবার যো নেই। এই দেখ না সেদিন আমার সোনার মোহরগুলো খামখা বদলে সব তামার পয়সা হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার!"

তখন সওদাগর রেগে বন্ধুকে গালাগালি দিয়ে কাজির কাছে দৌড়ে গেল নালিশ করতে। কাজির হুকুমে চার-চার প্যায়দা এসে মহাজনকে পাকড়াও ক'রে কাজির সামনে হাজির করল। কাজি বললেন, "তুমি এর ছেলেকে নিয়ে কী করেছ?" শুনে চোখ দুটো গোল ক'রে মস্ত বড় হাঁ ক'রে মহাজন বলল, "আমি? আমি মুখ্য-সুখ্য মানুষ, আমি কি অত সব বুঝতে পারি? হুজুর! ওর বাড়িতে মোহর রাখলাম, দশদিনে সব পয়সা হয়ে গেল। আবার দেখুন ওর ছেলেটা আমার বাড়ি আসতে না আসতেই ল্যাজ্‌-ট্যাজ্‌ গজিয়ে দস্তুরমতো বাঁদর হয়ে উঠেছে। কি রকম যে হচ্ছে—আমার বোধ হয় সব ভূতুড়ে কাণ্ড।" এই ব'লে সে কাজিকে লম্বা সেলাম করতে লাগল।

কাজিও চালাক লোক, ব্যাপার বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, তোমরা ঘরে যাও। আমি দৈবজ্ঞ ফকির ডাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ভূত ঝাড়িয়ে সব সায়েস্তা করছি। তোমার পয়সার থলি ওর কাছে দাও—আর তোমার বাঁদর ছেলেকে এর কাছেই রাখ। কাল সকালের মধ্যে সব যদি ঠিক না হয় তবে বুঝব এতে তোমাদের কারুর শয়তানি আছে। সাবধান! তাহলে তোমার পয়সাও পাবে না, মোহরও পাবে না—আর তোমার ছেলে তো মরবেই, ছেলের বাপ মা খুড়ো জ্যাঠা সবসুদ্ধ মেরে সাবাড় করব।"

সওদাগর পয়সার থলি সংগে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘরে চলল। মহাজন বাঁদর নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। ভোর না হতেই সওদাগর থলির মধ্যে আবার মোহর ভ'রে মহাজনের বাড়ি গিয়ে বলছে, "বন্ধু! বন্ধু! কি আশ্চর্য দেখে যাও! তোমার পয়সাগুলো আবার সব মোহর হয়েছে।" মহাজন বলল, "তাই নাকি? কি আশ্চর্য এদিকে সেই বাঁদরটাও আবার তোমার খোকা হয়ে গেছে।" তারপর মোহরের থলি নিয়ে সওদাগরের ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে মহাজন বলল, "দেখ্‌ জোচ্চোর! ফের আমায় 'বন্ধু' 'বন্ধু' বলবি তো মেরে তোর থোঁতামুখ ভোঁতা ক'রে দেব।"

গরুর বুদ্ধি

পণ্ডিতমশাই ভট্‌চার্যি বামুন, সাদাসিধে শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষ। বাড়িতে তাঁর সরষের তেলের দরকার পড়েছে, তাই তিনি কলুর বাড়ি গেছেন তেল কিনতে।

কলুর ঘরে মস্ত ঘানি, একটা গরু গম্ভীর হয়ে সেই ঘানি ঠেলছে, তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। গরুটা চলছে চলছে আর ঘানিটা ঘুরছে, আর সরষে পিষে তা থেকে তেল বেরুচ্ছে। আর গলার ঘণ্টাটা টুংটাং টুংটাং ক'রে বাজছে।

পণ্ডিতমশাই রোজই আসেন রোজই দেখেন, কিন্তু আজ তাঁর হঠাৎ ভারি আশ্চর্য বোধ হল। তিনি চোখমুখ গোল ক'রে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাই তো! এটা তো ভারি চমৎকার ব্যাপার!

কলুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে কলুর পো, ও জিনিসটা কি হে?" কলু বলল, "আজ্ঞে ওটা ঘানিগাছ, ওতে তেল হয়।" পণ্ডিতমশাই ভাবলেন—এটা কি রকম হল? আম গাছে আম হয়, জাম গাছে জাম হয়, আর ঘানি গাছের বেলায় তেল হয় মানে কি? কলুকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ঘানি ফল হয় না?" কলু বললে, "সে আবার কি?"

পণ্ডিতমশাই টিকিতে হাত বুলিয়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর প্রশ্নটা বোধহয় ঠিক হয়নি। কিন্তু কোথায় যে ভুল হয়েছে, সেটা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না। তাই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে তারপর বললেন, "তেল কী ক'রে হয়?" কলু বলল, "ঐখেনে সর্ষে দেয় আর গরুতে ঘানি ঠেলে—আর ঘানির চাপে তেল বেরোয়।" এইবারে পণ্ডিতমশাই খুব খুশি হ'য়ে ঘাড় নেড়ে টিকি দুলিয়ে বললেন, "ও বুঝেছি! তৈল-নিষ্পেষণ যন্ত্র!"

তারপর কলুর কাছ থেকে তেল নিয়ে পণ্ডিতমশাই বাড়ি ফিরতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে আর একটা খট্‌কা লাগল—'গরুর গলায় ঘণ্টা কেন?' তিনি বললেন, "ও কলুর পো, সবি তো বুঝলুম, কিন্তু গরুর গলায় ঘণ্টা দেবার অর্থ কী? ওতে কি তেল ঝাড়াবার সুবিধা হয়?" কলু বলল, "সব সময় তো আর গরুটার উপরে চোখ রাখতে পারি নে, তাই ঘণ্টাটা বেঁধে রেখেছি। ওটা যতক্ষণ বাজে, ততক্ষণ বুঝতে পারি যে গরুটা চলছে। থামলেই ঘণ্টার আওয়াজ বন্ধ হয়, আমিও টের পেয়ে তাড়া লাগাই।"

পণ্ডিতমশাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর দেখেননি; তিনি বাড়ি যাচ্ছেন আর কেবলই ভাবছেন—'কলুটার কি আশ্চর্য বুদ্ধি! কি কৌশলটাই খেলিয়েছে! গরুটার আর ফাঁকি দেবার যো নেই। একটু থেমেছে কি ঘণ্টা বন্ধ হয়েছে, আর কলুর পো তেড়ে উঠেছে!' এই রকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে হল—'আচ্ছা, গরুটা যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে তাহলেও ত ঘণ্টা বাজবে, তখন কলুর পো টের পাবে কী ক'রে?'

ভট্‌চার্যিমশায়ের ভারি ভাবনা হল। গরুটা যদি শয়তানি ক'রে ফাঁকি দেয়, তা হলে কলুর ত লোকসান হয়। এই ভেবে তিনি আবার কলুর কাছে ফিরে গেলেন।

গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হে, ঐ যে ঘণ্টার কথাটা বললে, ওটার মধ্যে একটা মস্ত গলদ থেকে গেছে। গরুটা যদি ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টা বাজায় তাহলে কী করবে?" কলু বিরক্ত হয়ে বললে, "ফাঁকি দিয়ে আবার ঘণ্টা বাজাবে কি রকম?" পণ্ডিতমশাই বললেন, "মনে কর যদি এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে, তা হলেও ত ঘণ্টা বাজবে, কিন্তু ঘানি ত চলবে না। তখন কী করবে?" কলু তখন তেল মাপছিল, সে তেলের পলাটা নামিয়ে পণ্ডিতমশায়ের দিকে ফিরে গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার গরু কি ন্যায়শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়েছে, যে তার অত বুদ্ধি হবে? সে আপনার টোলে যায়নি, শাস্ত্রও পড়েনি, আর গরুর মাথায় অত মতলব খেলে না।"

পণ্ডিতমশাই ভাবলেন, 'তাও তো বটে। মূর্খ গরুটা ন্যায়শাস্ত্র পড়েনি, তাই কলুর কাছে জব্দ আছে।'

ছাতার মালিক

তারা দেড় বিঘৎ মানুষ।

তাদের আড্ডা ছিল, গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে, বনের ধারে, ব্যাং-ছাতার ছায়ার তলায়। ছেলেবেলায় যখন তাদের দাঁত ওঠেনি, তখন থেকে তারা দেখে আসছে, সেই আদ্যিকালের ব্যাঙের ছাতা। সে যে কোথাকার কোন ব্যাঙের ছাতা, সে খবর কেউ জানে না, কিন্তু সবাই বলে, ''ব্যাঙের ছাতা।''

যত সব দুষ্টু ছেলে, রাত্রে যারা ঘুমোতে চায় না, মায়ের মুখে ব্যাঙের ছাতার গান শুনে শুনে তাদেরও চোখ বুজে আসে।—

গালফোলা কোলা ব্যাং, পালতোলা রাঙা ছাতা
মেঠো ব্যাং, গেছো ব্যাং, ছেঁড়া ছাতা, ভাঙা ছাতা।
সবুজ রং জবড়জং জরির ছাতা সোনা ব্যাং
টোক্কা-আঁটা ফোক্‌লা ছাতা কোঁকড়া মাথা কোনা ব্যাং॥

—কত ব্যাঙের কত ছাতা!

কিন্তু, আজ অবধি ব্যাংকে তারা চোখেও দেখেনি। সেখানে, মাঠের মধ্যে ঘাসের মধ্যে, সবুজ সবুজ পাগ্‌লা ফড়িং থেকে থেকে তুড়ুক্ ক'রে মাথা ডিঙিয়ে লাফিয়ে যায়; সেখানে রং-বেরঙের প্রজাপতি, তারা ব্যস্ত হয়ে ওড়ে ওড়ে আর বসতে চায়, বসে বসে আর উড়ে পালায়; সেখানে গাছে গাছে কাঠবেড়ালি সারাটা দিন গাছ মাপে আর জরিপ করে, গাছ বেয়ে ওঠে আর গাছ বেয়ে নামে, আর রোদে ব'সে গোঁফ তাওয়ায় আর হিসেব কষে। কিন্তু তারাও কেউ ব্যাঙের খবর বলতে পারে না।

গ্রামের যত বুড়োবুড়ি, দিদিমা আর ঠাকুরমা, তাঁরা বলেন, আজও সে ব্যাং মরেনি, তার ছাতার কথা ভোলেনি। যখন ভরা বর্ষায় বাদল নামে, বন-বাদাড়ে লোক থাকে না, ব্যাং তখন আপন ছাতার তলায় ব'সে মেঘের সঙ্গে তর্ক করে। যখন নিশুত রাতে সবাই ঘুমোয়, কেউ দেখে না, তখন ব্যাং এসে তার ছাতার ছাওয়ায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বুক ফুলিয়ে তান জুড়ে দেয়, "দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্, এখন দ্যাখ্।" কিন্তু যেদিন সব দুষ্টু ছেলে জট্‌লা ক'রে বাদ্‌লায় ভিজে দেখতে গেল, কই তারা ত কেউ ব্যাং দেখেনি। আর যেবার তারা নিঝুম রাতে ভরসা ক'রে বনের ধারে কান পেতেছে, সেবারে ত কই গান শোনেনি!

কিন্তু ছাতা যখন আছে, ব্যাং তখন না এসে যাবে কোথায়? একদিন না একদিন ব্যাং ফিরে আসবেই আসবে,—আর বলবে, "আমার ছাতা কই?" তখন তারা বলবে, ''এই যে তোমার আদ্যিকালের নতুন ছাতা—নিয়ে যাও। আমরা ভাঙিনি, ছিঁড়িনি, নষ্ট করিনি, নোংরা করিনি, খালি ওর ছায়ায় ব'সে গল্প করেছি।"—কিন্তু ব্যাংও আসে না, ছাতাও সরে না, ছায়াও নড়ে না, গল্পও ফুরোয় না।

এম্‌নি ক'রেই দিন কেটে যায়, এম্‌নি ক'রেই বছর ফুরোয়। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় গ্রাম জুড়ে এই রব উঠল, "ব্যাং এসেছে, ব্যাং এসেছে। ছাতা নিতে ব্যাং এসেছে!"

কোথায় ব্যাং? কে দেখেছে? বনের ধারে ছাতার তলায়; লালু দেখেছে, ফালু দেখেছে, চাঁদা ভোঁদা সবাই দেখেছে। কী করছে ব্যাং? কী রকম ব্যাং? লালু বললে, "পাট্‌কিলে লাল ব্যাং—যেন হলুদগোলা চুন। এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" ফালু বললে, "ছাইয়ের মতন ফ্যাক্‌সা রং, এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" চাঁদা বললে, "চক্‌চকে সবুজ, যেন নতুন কচি ঘাস—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" ভোঁদা বললে, "ভুসো-ভুসো রং, যেন পুরোনো তেঁতুল—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।"

গ্রামের যত বুড়ো, যত মহা-মহা পণ্ডিত সবাই বললে, "কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তোরা কী দেখেছিস্ আবার বল।" লালু কালু চাঁদা ভোঁদা সবাই বললে, "ছাতার তলায় জ্যান্ত ব্যাং, তার চার হাত লম্বা ল্যাজ!" শুনে সবাই মাথা নেড়ে বললে, "উঁহুঁ উঁহুঁ! তাহ'লে কক্ষনো সেটা ব্যাং নয়, সেটা বোধহয় ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙাচি। তা নইলে ল্যাজ থাকবে কেন?"

ব্যাং না হোক, ব্যাঙের ছেলে তো বটে—ছেলে না হোক নাতি, কিম্বা ভাইপো, কিম্বা ব্যাঙের কেউ তো বটে। সবাই বললে, "চল্ চল্ দেখবি চল্, দেখবি চল্।" সবাই মিলে দৌড়ে চলল।

মাঠের পারে, বনের ধারে, ব্যাং-ছাতার আগায় ব'সে কে একজন রোদ পোয়াচ্ছে। রংটা যেন শ্যাওলা-ধরা গাছের বাকল, ল্যাজখানা তার ঘাসের উপর ঝুলে পড়েছে, এক চোখ বুজে এক চোখ খুলে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে। সবাই তখন চেঁচিয়ে বললে, "তুমি কে হে? কস্ত্বম্? তুম্ কোন্ হায়? হু আর ইউ?" শুনে সে ডাইনেও তাকালে না, বাঁয়েও তাকালে না, খালি একবার রং বদলিয়ে খোলা চোখটা বুজ্‌লে আর বোজা চোখটা খুল্‌লে, আর চিড়িক্ করে এক হাত লম্বা জিভ বার ক'রেই তক্ষুনি আবার গুটিয়ে নিলে।

গ্রামের যে হোম্‌রা বুড়ো, সে বললে, "মোড়ল ভাই, ওটা যে জবাব দেয় না? কালা না কি?" মোড়ল বললে, "হবেও বা।" সর্দার খুড়ো সাহস ক'রে বললে, "চল্ না ভাই, এগিয়ে যাই, কানের কাছে চেঁচিয়ে বলি।" মোড়ল বললে, "ঠিক বলেছ।" হোম্‌রা বললে, "তোমরা এগোও। আমি এই আঁক্‌শি নিয়ে ঐ ঝোপের মধ্যে উঁচিয়ে বসি। যদি কিছু করতে আসে, ঘ্যাঁচাৎ ক'রে কুপিয়ে দেব।"

তখন সর্দার সেই ছাতার উপর উঠে ল্যাজওয়ালাটার কানের কাছে হঠাৎ "কোন্ হ—া—য়্" ব'লে এম্‌নি জোরে হাঁকড়ে উঠল যে, সেটা আরেকটু হলেই ছাতার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে সাম্‌লে নিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে, দু'চোখ তাকিয়ে বললে, "উঃ? অত চেঁচান কেন মশাই? আমি কি কালা?" তখন সর্দার নরম হ'য়ে বললে, "তবে যে জবাব দিচ্ছিলে না?" ল্যাজওয়ালা বললে, "দেখছেন না, মাছি খাচ্ছিলাম? কি বলতে চাচ্ছেন বলুন না?"

সর্দার তখন থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বললে, "বলছিলাম কি, তুমি কি ব্যাঙের ছেলে, না ব্যাঙের নাতি, না ব্যাঙের—" ল্যাজওয়ালা তখন বেজায় চটে গিয়ে বললে, "আপনি কি আরসুলার পিশে? আপনি কি চাম্‌চিকের খোকা?" সর্দার বললে, "আহা, রাগ করছ কেন?" সে বললে, "আপনি আমায় ব্যাং ব্যাং করছেন কেন?" সর্দার বললে, "তুমি কি ব্যাঙের কেউ হও না?" জন্তুটা তখন "না-না-না-না—কেউ না—কেউ না—কেউ না" ব'লে দুই চোখ বুজে ভয়ানক রকম দুলতে লাগল।

তাই না দেখে সর্দার বুড়ো চীৎকার ক'রে বললে, "তবে যে তুমি ছাতা নিতে এয়েছ?"

সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচাতে লাগল, "নেমে এসো, নেমে এসো,—শিগ্‌গির নেমে এসো।" মোড়ল খুড়ো ছুটে গিয়ে প্রাণপণে তার ল্যাজটা ধরে টানতে লাগল। আর হোম্‌রা বুড়ো ঝোপের মধ্যে থেকে আঁক্‌শিটা উঁচিয়ে তুলল। ল্যাজওয়ালা বিরক্ত হয়ে বললে, "কি আপদ! মশাই, ল্যাজ ধ'রে টানেন কেন? ছিঁড়ে যাবে যে?" সর্দার বললে, "তুমি কেন ব্যাঙের ছাতায় চড়েছ? আর পা দিয়ে ছাতা মাড়াচ্ছ?'' জন্তুটা তখন আকাশের দিকে গোল গোল চোখ ক'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বললে, ''কি বললেন? কিসের কী?'' সর্দার বললে, ''বললাম যে ব্যাঙের ছাতা।"

যেম্‌নি বলা, অম্‌নি সে খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ ক'রে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে, একেবারে মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল। তার গায়ে লাল নীল হলদে সবুজ রামধনুর মতো অদ্ভুত রং খুলতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হ'য়ে দৌড়ে এল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?" কেউ বললে, ''জল দাও," কেউ বললে, ''বাতাস কর।" অনেকক্ষণ পর জন্তুটা ঠাণ্ডা হ'য়ে, উঠে বললে, "ব্যাঙের ছাতা কি হে? ওটা বুঝি ব্যাঙের ছাতা হ'ল? যেমন বুদ্ধি তোমাদের! ওটা ছাতাও নয়, ব্যাঙেরও কিছু নয়। যারা বোকা, তারা বলে ব্যাঙের ছাতা।" শুনে কেউ কোনো কথা বলতে পারলে না, সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষকালে ছোকরা মতো একজন জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কে মশাই?'' ল্যাজওয়ালা বললে, ''আমি বহুরূপী —আমি গিরগিটির খুড়তুত ভাই, গোসাপের জ্ঞাতি। এটা এখন আমার হ'ল—আমি বাড়ি নিয়ে যাব।"

এই ব'লে সে "ব্যাঙের ছাতা"টাকে বগলদাবা করে নিয়ে, গম্ভীরভাবে চলে গেল। আর সবাই মিলে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

অসিলক্ষণ পণ্ডিত

রাজার সভায় মোটা মোটা মাইনেওয়ালা অনেকগুলি কর্মচারী। তাদের মধ্যে সকলেই যে খুব কাজের লোক, তা নয়। দু'চারজন খেটেখুটে কাজ করে আর বাকি সবাই ব'সে ব'সে মাইনে খায়।

যারা ফাঁকি দিয়ে রোজগার করে, তাদের মধ্যে একজন আছেন, তিনি অসিলক্ষণ পণ্ডিত। তিনি রাজার কাছে এসে বললেন, তিনি অসিলক্ষণ (অর্থাৎ তলোয়ারের দোষ-গুণ) বিচার করতে জানেন। অমনি রাজা বললেন, "উত্তম কথা, আপনি আমার সভায় থাকুন, আমার রাজ্যের যত তলোয়ার আপনি তার লক্ষণ বিচার করবেন।"

সেই অবধি ব্রাহ্মণ রাজার সভায় ভর্তি হয়েছেন, মোটারকম মাইনে পাচ্ছেন, আর প্রতিদিন তলোয়ার পরীক্ষা করছেন, আর বলছেন "এই তলোয়ারটা ভালো, এই তলোয়ারটা খারাপ।" ভারি কঠিন কাজ! কত তলোয়ার ঘেঁটে-ঘুঁটে, দেখে আর শুঁকে, চট্‌পট্ তার বিচার করছেন।

তাঁর বিচারের নিয়মটি কিন্তু ভারি সহজ! তলোয়ার এনে যখন তাঁর হাতে দেওয়া হয়, তখন তিনি সেটাকে শুঁকে দেখেন। তলোয়ার যারা বানায়, তারা তলোয়ারের গায়ে তাদের মার্কা এঁকে দেয়। তাই দেখে বোঝা যায় কোনটা কার তলোয়ার। পণ্ডিতমহাশয় শুঁকবার সময় সেই মার্কাটুকু দেখে নেন। যাদের উপর তিনি খুব খুশি থাকেন, যারা তাঁকে পয়সা-টয়সা দেয়, আর খাইয়ে-দাইয়ে তোয়াজ করে, তাদের তলোয়ার দেখলেই তিনি নেড়েচেড়ে টিপেটুপে বলেন, "খাসা তলোয়ার! দিব্যি তলোয়ার! হাজার টাকা দামের তলোয়ার!" আর যাদের উপর তিনি চটা, যারা তাঁকে ঘুষও দেয় না, খাতিরও করে না, তাদের তলোয়ার যত ভালোই হোক না কেন, তাঁর কাছে পার পাবার যো নেই। সেগুলি হাতে পড়লেই তিনি অমনি একটু শুঁকেই নাক সিঁট্‌কিয়ে ব'লে ওঠেন, "অতি বিচ্ছিরি! অতি বিচ্ছিরি! তলোয়ার তো নয়, যেন কাস্তে গড়েছে!"

এমনি ক'রে কত ভালো ভালো কারিকর, কত চমৎকার চমৎকার তলোয়ার বানিয়ে আনে, কিন্তু বিচারের গুণে তার দু'টাকাও দাম হয় না। এর মধ্যে একজন ওস্তাদ কারিকর আছে, সে বেচারা মনপ্রাণ দিয়ে এক একখানি তলোয়ার গড়ে, আর বিচারক মশাই "দূর! দূর!" ক'রে সব বাতিল করে দেন। এই রকম হতে হতে শেষটা কারিকর গেল ক্ষেপে।

একদিন সে করল কি, একখানি তলোয়ার বানিয়ে, তার গায়ে বেশ ক'রে লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে অসিলক্ষণ পণ্ডিতের কাছে এনে হাজির করল। পণ্ডিত নিতান্ত তাচ্ছিল্য ক'রে, "আবার কী গড়ে আন্‌লি? দেখি?" ব'লে, যেম্‌নি তাতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকতে গেছেন, অম্‌নি লঙ্কার গুঁড়ো নাকে ঢুকতেই হ্যাঁ-চ্‌-চো ক'রে এক বিকট হাঁচি, আর সেই সঙ্গে তলোয়ারের আগায় ঘ্যাঁচ্ ক'রে নাক কেটে দু'খান!

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল, "জল আন্‌রে," "কবিরাজ ডাক্‌রে,"—ততক্ষণে তলোয়ারওয়ালা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার বাড়ি পর্যন্ত পিঠ্‌টান দিয়েছে।

অসিলক্ষণ পণ্ডিতের মহা মুশকিল। একে তো কাটা নাকের যন্ত্রণা, তার উপর সভায় বেরুলে সবাই ক্ষ্যাপায় "নাক-কাটা পণ্ডিত" ব'লে। বেচারার এখন মুখ দেখানই দায়, সে সভায়ও যেতে পারে না, চাকরিও করতে পারে না। তাকে দেখলেই লোক জিজ্ঞাসা করে, "ত’লোঁয়াঁরটাঁ কে’মন ছি’ল’!"

ব্যাঙের রাজা

রাজবাড়িতে যাবার যে পথ, সেই পথের ধারে প্রকাণ্ড দেয়াল, সেই দেয়ালের একপাশে ব্যাঙেদের পুকুর। সোনাব্যাং, কোলাব্যাং, গেছোব্যাং, মেঠোব্যাং—সকলেরই বাড়ি সেই পুকুরের ধারে। ব্যাঙেদের সর্দার যে বুড়ো ব্যাং, সে থাকে দেয়ালের ধারে, একটা মরা গাছের ফাটলের মধ্যে, আর ভোর হলে সবাইকে ডাক দিয়ে জাগায়—"আয় আয় আয়—গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্—দেখ্ দেখ্ দেখ্—ব্যাং ব্যাং ব্যাং—ব্যাঙাচি।" এই ব'লে সে অহংকারে গাল ফুলিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আর ব্যাংগুলো সব "যাই যাই যাই—থাক্ থাক্ থাক্" ব'লে, ঘুম ভেঙে, মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে, পুকুর-পারের সভায় বসে।

একদিন হয়েছে কি, সর্দার ব্যাং ফুর্তির চোটে লাফ দিয়েছে উলটোমুখে ডিগবাজি খেয়ে—আর পড়বি তো পড়, এক্কেবারে দেয়াল টপকে রাজপথের মধ্যিখানে! রাজা তখন সভায় চলেছেন, সিপাইশান্ত্রী লোকলস্কর দলবল সব সঙ্গে চলেছে। মোটা মোটা সব নাগ্‌রাই জুতো, খট্‌মট্ ঘ্যাঁচ্‌ম্যাঁচ্ ক'রে ব্যাং বুড়োর মাথার উপর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে এমনি রোখ ক'রে চলতে লেগেছে, যে ভয়ে ব্যাঙের প্রাণ তো যায় যায়! হঠাৎ কোত্থেকে কার একটা লাঠি না ছাতা না কিসের গুঁতো এসে এমনি ধাঁই করে ব্যাঙের গায়ে লেগেছে যে সে বেচারা ঠিক্‌রে গিয়ে পথের ধারে ঘাসের উপর চিৎপাত হয়ে পড়েছে।

ব্যাং বুড়োর খুব লেগেছিল, কিন্তু হাতও ভাঙেনি, পাও ভাঙেনি, সে আস্তে আস্তে উঠে বসল—আর চারদিকে তাকিয়ে, দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল দেখে, তাড়াতাড়ি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে খুব সাবধানে মুখ বার ক'রে সে চেয়ে দেখল, মাথায়-মুকুট রঙিন-পোশাক রাজা, আলো-ঝল্‌মল্ চতুর্দোলায় চড়ে সভায় যাচ্ছেন। লোকেরা সব "রাজা, রাজা" ব'লে নমস্কার করছে, নাচছে, গাইছে আর ছুটোছুটি করছে। আর রাজামশাই চতুর্দোলায় ব'সে খুশি হয়ে, এর দিকে তাকাচ্ছেন, ওর দিকে তাকাচ্ছেন, আর কেবলি হাসছেন। তাই দেখে ব্যাঙের বড় ভালো লাগল, সেও দু'হাত তুলে নমস্কার করতে লাগল আর বলতে লাগল, "রাজা রাজা রাজা —রাজা রাজা রাজা—" তার মনে হল রাজামশাই ঠিক যেন তার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেললেন! ব্যাং তখন কাঁদ কাঁদ হ'য়ে নিশ্বাস ফেলে ভাবল, "আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!"

তারপর ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজে খুঁজে ব্যাং যখন বাসায় ফিরল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সবাই বলল, "সর্দার বুড়ো, সর্দার বুড়ো, সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে? আমরা যে কত ডাকলাম, কত খুঁজলাম, তুমি তো কই সাড়াও দিলে না।" সর্দার বলল—"চোপ্ চোপ্ চোপ্ রাও! রাজা দেখতে গিয়েছিলাম।" তাই শুনে ব্যাঙেরা সব এক সঙ্গে "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" ব'লে চেঁচিয়ে উঠল। বুড়ো তখন গাল ফুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে, দু'চোখ বুজে, দু'হাত তুলে লাফিয়ে বলল, "রাজা হচ্ছে এই এত্তো বড়ো উঁচু, আর ধব্‌ধবে সাদা

আর ঝক্‌ঝকে আলোর মতো—আর তাকে দেখলেই সবাই মিলে ডাকতে থাকে—‘রাজা রাজা রাজা রাজা’।” তাই শুনে ব্যাঙেরা সবাই বলতে লাগল, “আহা! আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!” তাদের যে রাজা নেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে তাদের চোখ দিয়ে ঝরঝর ক’রে জল পড়তে লাগল। বুড়ো ব্যাং বলল, “ভাই সকল, এস আমরা রাজার জন্য দরখাস্ত করি।” তখন সবাই মিলে গোল হয়ে ব’সে, আকাশের দিকে চোখ তুলে, নানান্‌ সুরে ডাকতে লাগল—“রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা চাই রাজা চাই—রাজা চাই রাজা চাই।”

ব্যাংপুকুরের ব্যাং দেবতা—যিনি বাদ্‌লা দিনে বর্ষা মেঘের ঝাঁঝ্‌রি দিয়ে পুকুর ভরে জল ঢালেন—তিনি তখন আকাশতলায় চাদর মেলে ঘুমচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্যাঙেদের চীৎকারে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, “বৃষ্টিও নেই, বাদ্‌লাও নেই, মেঘের কোনো চিহ্নও নেই, বাছারা সব চেঁচাও কেন?” ব্যাঙেরা বলল, ‘‘আমাদের রাজা নেই, রাজা চাই।” দেবতা বললেন, ‘‘এই নে রাজা।” ব’লে মরা গাছের একখানা ডাল ভেঙে তাদের সামনে ফেলে দিলেন।

ভাঙা ডাল পুকুরপাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার মাথার উপর মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা জোছনায় চক্‌চক্‌ করতে লাগল। তাই দেখে ব্যাঙের ফুর্তি আর ধরে না। তারা গোল হয়ে ঘিরে ব’সে মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গাইতে লাগল—‘‘রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা—’’

এমনি ক’রে দু’দিন যায়, দশদিন যায়, শেষটায় একদিন সর্দার ব্যাঙের গিন্নী বললেন, “ছাই রাজা! কর্তা যে সেদিন রাজা দেখলেন, এর চেয়ে সে অনেক ভালো। এ রাজা নড়েও না চড়েও না, এদিকেও দেখে না ওদিকেও দেখে না—ছাই রাজা!” তাই শুনে সবাই বলল, “ছাই রাজা! ছাই রাজা!—নড়েও না চড়েও না, দেখেও না শোনেও না—ছাই রাজা!” তখন আবার বুড়ো ব্যাং গাছের উপর চড়ে বলল, “ভাই সকল, এস আমরা দরখাস্ত করি—আমাদের ভালো রাজা চাই।” আবার সবাই গোল হয়ে ব’সে আকাশপানে চোখ তাকিয়ে নানান্‌ সুরে ডাকতে লাগল—“রাজা চাই! রাজা চাই! ভালো রাজা—নতুন রাজা।” তাই শুনে ব্যাং দেবতা জেগে বললেন, “ব্যাপারখানা কী? এই তো সেদিন তোদের রাজা দিলাম, এর মধ্যে আবার নতুন কী হল?” ব্যাঙেরা বলল, “ও রাজা ছাই রাজা! ও রাজা বিশ্রী রাজা—ও রাজা নড়েও না চড়েও না—ও রাজা চাই না চাই না চাই না চাই না চাই না—” ব্যাং দেবতা বললেন, “থাম্‌ তোরা থাম্‌—নতুন রাজা দিচ্ছি।” এই ব’লে, একটা বককে সেই পুকুরের ধারে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, “এই নে তোদের নতুন রাজা।”

তাই না দেখে, ব্যাঙেরা সব অবাক হয়ে বলতে লাগল, “বাপ্‌রে বাপ্‌! কি প্রকাণ্ড রাজা!” চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ধব্‌ধবে সাদা! ভালো রাজা! সুন্দর রাজা! রাজা রাজা রাজা রাজা।” বকের তখন খিদে ছিল না, মাছ খেয়ে পেট ভরা ছিল, তাই সে কিছু বলল না: খালি চোখ মিট্‌মিট্‌ ক’রে একবার এদিকে তাকাল, একবার ওদিকে তাকাল, তারপর এক পা তুলে চুপচাপ ক’রে দাঁড়িয়ে রইল। তাই দেখে ব্যাঙেদের উৎসাহ আর ধরে না, তারা প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল। সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল হল, সন্ধ্যা হল—তারপর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রি এল—তখন ব্যাঙেদের গান গাওয়া বন্ধ হল।

তার পরের দিন সকালবেলায় উঠে যেমনি তারা গান ধরেছে, অমনি বকরাজা এসে একটা গোব্‌দামতন মোটা ব্যাংকে টপাস্‌ ক’রে মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে! তাই দেখে

ব্যাঙেরা সব হঠাৎ কেমন মুষড়ে গেল—তাদের ''রাজা রাজা''র গান একেবারে পাঁচ সুর নেমে গেল। বকরাজা ব্যাংটিকে দিয়ে জলযোগ ক'রে একটি ঠ্যাং মুড়ে ধ্যান করতে লাগলেন।

এমনি ক'রে এক-এক বেলায় এক-একটি ক'রে ব্যাং বকরাজার পেটের মধ্যে যায়। ব্যাং-মহলে হৈ চৈ লেগে গেল। সবাই মিলে সভায় ব'সে যুক্তি ক'রে বলল, "এটা বড় অন্যায় হচ্ছে। রাজাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, সে হল আমাদের রাজা, সে এমন করলে আমরা পালাই কোথা?" কিন্তু বুঝিয়ে বলবে কে? সর্দার গিন্নী বললেন, "তার জন্য ভাবছিস্ কেন? এতে আর মুশকিল কিসের? এই দেখ্ না, আমিই গিয়ে ব'লে আসছি।"

সর্দার গিন্নী বকরাজার পায়ের সামনে গ্যাঁট হয়ে ব'সে, হাতমুখ নেড়ে কড়্‌কড়ে গলায় বলতে লাগলেন, ''ও রাজা, তোর ভাগ্যি ভালো, তুই আমাদের রাজা হলি। তোর চোখ ভালো, মুখ ভালো, ঝক্‌ঝকে রঙ ভালো, তোর এক পা-ও ভালো, দুই পা-ও ভালো, কেবল ঐটি তোর ভালো নয়,—তুই আমাদের খাস কেন? শামুক আছে শামুক খা' না, পোকা মাকড় প্রজাপতি তাও তো তুই খেতে পারিস। রাজা হয়ে আমাদের খেতে চাস? ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাম রাম রাম রাম—অমন আর কক্ষনো করিসনে।'' বক দেখলে তার পায়ের কাছে দিব্যি একটা নাদুস্‌নুদুস্ ব্যাং, তার নরম নরম গোলগাল চেহারা! টপ্ ক'রে বকরাজার জিভ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল আর খপ্ ক'রে সর্দার গিন্নী তার মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন!

ব্যাঙেদের মুখে আর কথাটি নেই। সবাই তাড়াতাড়ি চট্‌পট্ সরে ব'সে বড় বড় হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। পরে সর্দার ব্যাং রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, ''পাজি রাজা! লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু রাজা!'' তাই শুনে সবাই একসঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, ''পাজি রাজা! দুষ্টু রাজা!—চাই না চাই না চাই না চাই না—রাজা চাই না, রাজা চাই না।"

ব্যাং দেবতা জেগে বললেন, ''দূর ছাই! আবার কী হল?'' ব্যাঙেরা বলল, ''বাপ্‌রে বাপ্! বাপ্‌রে বাপ্! কী দুষ্টু রাজা! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও!"

তখন ব্যাং দেবতা হুশ্ ক'রে তাড়া দিতেই বকরাজা পাখা মেলে উড়ে পালাল। আর ব্যাঙেরা সব বাসায় গিয়ে বলতে লাগল,''গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্—বাপ্ বাপ্ বাপ্—ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাজাটাজা আর কক্ষনো চাইব না।"



ডাকাত নাকি?

হারুবাবু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছেন। স্টেশন থেকে বাড়ি প্রায় আধ মাইল দূর, বেলাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হারুবাবু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলছেন। তাঁর এক হাতে ব্যাগ, আর এক হাতে ছাতা।

চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর পিছন পিছন আসছে। তিনি আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন, সত্যি সত্যি কে যেন ঠিক তাঁরই মতন হন্‌হনিয়ে তাঁর পিছন পিছন আসছে। হারুবাবুর মনে কেমন ভয় হল—চোর ডাকাত নয়তো! ওরে বাবা! সামনের ঐ মাঠটা পার হবার সময় একলা পেয়ে হঠাৎ যদি ঘাড়ের উপর দু'চার ঘা লাঠি কষিয়ে দেয় তাহলেই ত গেছি! হারুবাবুর রোগা-রোগা পা দু'টো কাঁপতে কাঁপতে ছুটতে লাগল। কিন্তু লোকটাও যে সঙ্গে সঙ্গে ছোটে!

তখন হারুবাবু ভাবলেন, সোজা মাঠের উপর দিয়ে গিয়ে কাজ নেই। বড় রাস্তা দিয়ে বদ্যিপাড়া ঘুরেই যাওয়া যাক, না হয় একটু হাঁটাই হল। তিনি ফস্ ক'রে ডানদিকের একটা গলির ভিতর ঢুকেই বক্সীদের বেড়া টপকিয়ে একদৌড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। ওমা! সেই লোকটাও কি দুষ্টু, সেও দেখাদেখি ঠিক তেমনি ক'রে বেপথ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে হাজির!

হারুবাবু ছাতাটাকে বেশ শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলেন—ভাবলেন, যা থাকে কপালে, কাছে আসলেই দু'চার ঘা কষিয়ে দেব। হারুবাবুর মনে পড়ল, ছেলেবেলায় তিনি 'জিম্‌নাস্টিক্ করতেন—দু'তিনবার তিনি হাতের 'মাস্‌ল্' ফুলিয়ে দেখলেন, এখনও

শক্ত হয় কিনা।

আর একটু সামনেই কালিবাড়ি। হারুবাবু তার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ঝোপজঙ্গল ভেঙে প্রাণপণ ছুটতে লাগলেন। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন যে, লোকটাও সঙ্গে সঙ্গেই ছুটছে! এ কিন্তু ডাকাত না হয়ে যেতেই পারে না! হারুবাবুর হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল, সামনে ঘাটের পাশে বসে কারা যেন গল্প করছে।

শুনবামাত্র হারুবাবুর মনে সাহস হল। তিনি ধাঁ ক'রে ছাতা বাগিয়ে সিংহবিক্রমে ফিরে বললেন, "তবে রে! আমি টের পাইনি বুঝি? ভালো চাস ত—" কিন্তু লোকটির চেহারা দেখে হঠাৎ তাঁর বক্তৃতার তেজ থেমে গেল। অত্যন্ত নিরীহ রোগা ভালোমানুষ গোছের লোকটি—ডাকাতের মতো একেবারেই নয়!

হারুবাবু তখন একটু নরম মতো ধমক দিয়ে বললেন—"খামখা আমার পেছন পেছন ঘুরছ কেন হে?" লোকটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে আর থতমত খেয়ে বলল, "স্টেশনের বাবুটি যে বললেন, আপনি বলরামবাবুর পাশের বাড়িতেই থাকেন, আপনার সঙ্গে গেলেই ঠিকমতো পৌঁছব।—তা আপনি কি বরাবর এইরকম ক'রে বেঁকেচুরে চলেন নাকি?" হারুবাবু ঠিক এক মিনিট হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকেও বলবার মতো কোনো জবাব খুঁজে পেলেন না। কাজেই ঘাড় হেঁট ক'রে আবার সোজা পথে বাড়ি ফিরে চললেন।

পুতুলের ভোজ

পুতুলের মা খুকী আজ ভয়ানক ব্যস্ত। আজ কিনা ছোট্ট পুতুলের জন্মদিন, তাই খুব খাওয়ার ধুম লেগেছে। ছোট্ট টেবিলের উপর ছোট্ট ছোট্ট থালা বাটি সাজিয়ে, তার মধ্যে কি চমৎকার ক'রে খাবার তৈরি ক'রে রাখা হয়েছে। আর চারদিকে সত্যিকারের ছোট্ট ছোট্ট চেয়ার সাজানো রয়েছে, পুতুলেরা বসে খাবে ব'লে।

খুকীর যে ছোটদাদা, তার কিনা সাড়ে চার বছর বয়স, তাই সে বলে, "পুতুলরা খেতেই পারে না, তাদের আবার জন্মদিন কি?" কিন্তু খুকী সে কথা মানবে কেন? সে বলে, "পুতুলরা সব পারে। কে বলল পারে না? কে বলল যে কক্ষনো কোনোদিন তারা কথা বলে না, কক্ষনো কোনোদিন খায় না?"—খোকাপুতুলের যখন অসুখ করেছিল তখন সে কি 'মা, মা' ব'লে কাঁদত না? নিশ্চয়ই কাঁদত। তা না হ'লে খুকী জানল কী ক'রে যে তার অসুখ করেছে? খুকীর দাদা এ সবের জবাব দিতে পারে না, তাই সে ''বোকা মেয়ে, হাঁদা মেয়ে'' ব'লে মুখ ভেংচিয়ে চলে যায়।

খুকী গেল তার মা'র কাছে নালিশ করতে। মা সব শুনে-টুনে বললেন, ''সব সময়ে সকলের কাছে কি পুতুলরা জ্যান্ত হয়? যেদিন দেখবি পুতুল সত্যি ক'রে খাবার খাচ্ছে, সেদিন ছোড়দাকে ডেকে দেখাস্।'' খুকী বললে, ''আজকে যদি ওরা জেগে উঠে খাবার খেতে থাকে, তাহলে কী মজাই হবে! আমার বোধ হয় রাত্তিরে যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, তখন তাদের দিন হয়! তা না হ'লে আমরা তো দেখতে পেতাম? সেই যে একদিন টিনের তৈরি দুষ্টু পুতুলটা খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল—নিশ্চয় ওরা রাত্রে উঠে মারামারি করেছিল! তা না হলে খাট থেকে পড়ল কেন? আজ থেকে আমি ঘুমোবার সময় খুব ভালো ক'রে কান পেতে থাকব।''

পুতুলের জন্মদিনে কি চমৎকার খাবার! ময়দার মিঠাই, ময়দার পিঠে, ছোট্ট ছোট্ট নারকলের মোয়া, আর ছোট্ট ছোট্ট গুড়ের টিক্‌লি—এম্‌নি সব আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস। রাত্রে শোবার আগে খুকী তার পুতুলদের ঝেড়ে মুছে নাইয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়াল আর বলে দিল, "এই দেখ্, খাবার-টাবার রইল, রাত্রে উঠে খাস্।" কোথায় কে বসবে, কোনটার পর কোনটা খাবে, ঝগড়া করলে কে কী শাস্তি পাবে সব ব'লে, তারপর দুষ্টু পুতুলটাকে খুব ব'কে ধমকে, আর ছোট্ট পুতুলকে জন্মদিনের জন্য খুব খানিকটা আদর-টাদর ক'রে, তারপর খুকী গেল বিছানায় শুতে। যেম্‌নি শোয়া অম্‌নি ঘুম।

খুকীও ঘুমিয়েছে, আর অম্‌নি ঘরের মধ্যে কাদের টিপ্‌টিপ্ পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাদের একজন খুকুমণির জুতোর কাছে, ঘরের কোণে ছবির বইগুলোর কাছে, পুতুলদের চাদর-ঢাকা খাটের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এটা ওটা শুঁক্‌ছে, আর কুটুর-কুটুর ক'রে এতে ওতে কামড়িয়ে দেখছে! খানিকটা বর্ণ-পরিচয়ের পাতা খেয়ে দেখল, ভালো লাগে না; জুতোর ফিতেটা চিবিয়ে দেখল, তার মধ্যে কিচ্ছু রস নেই; টিনের পুতুলটাকে কামড়িয়ে দেখল—ওরে বাবা, কী শক্ত! এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে তার চোখ পড়ল—টেবিলে সাজানো ও সব কী রে!

দৌড়ে চেয়ার-টেয়ার উল্‌টিয়ে এক লাফে টেবিলের উপর চ'ড়ে সে একটুখানি শুঁকেই ব্যস্ত হয়ে বলল, "কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ কীঁ—চ্‌!" তার মানে, "ওগো শিগ্‌গির এস—দেখে যাও!" অম্‌নি টিপ্‌ টিপ্‌ টুপ্‌ টুপ্‌ ট্যাপ্‌ ট্যাপ্‌ থপ্‌ ক'রে সেইরকম আর একটা এসে হাজির। ঠিক সেইরকম লোমে ঢাকা ছেয়ে রং, সেইরকম সরু লম্বা ল্যাজ, আর সেইরকম চোখা চোখা নাক আর মিট্‌মিটে কালো কালো চোখ। দু'জনের উৎসাহ আর ধরে না! টপাটপ্‌ টপাটপ্‌ খাচ্ছে আর তাদের ভাষায় কেবলি বলছে, ''এটা খাও ওটা খাও! এটা কী সুন্দর! ওটা কেমন চমৎকার!'' এম্‌নি ক'রে, দেখতে দেখতে, যত খাবার সব চেটেপুটে শেষ!

সকালবেলায় খুকী উঠে দেখল—ওমা! কি আশ্চর্য! সব খাওয়া শেষ হয়ে গেছে! কখন যে পুতুলগুলো জেগে উঠল, কখন যে খেল, আর কখন যে আবার ঘুমোল, কিছুই সে টের পায়নি। "খেয়েছে! খেয়েছে! সব খাবার খেয়েছে" ব'লে সে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে মা বাবা ছোড়দা বড়দা সবাই ছুটে এসে হাজির।

ব্যাপার দেখে আর খুকীর কথা শুনে সবাই বলল, "তাই তো! কি আশ্চর্য!" খালি ছোড়দা বলল, "তা বই কি! ও নিজে খেয়ে এখন বলছে—পুতুলে খেয়েছে।" দেখ তো কি অন্যায়!

আসলে ব্যাপারটা যে কী, তা কেবল মা জানেন আর বাবা জানেন, কারণ তাঁরা ঘরের কোণে ইঁদুরের ছোট্ট ছোট্ট পায়ের দাগ দেখেছিলেন। কিন্তু সে কথা খুকীকে যদি বল, সে কক্ষনো তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

উকিলের বুদ্ধি

গরিব চাষা, তার নামে মহাজন নালিশ করেছে। বেচারা কবে তার কাছে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল, সুদে-আসলে তাই এখন পাঁচশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। চাষা অনেক কষ্টে একশো টাকা যোগাড় করেছে; কিন্তু মহাজন বলছে, "পাঁচশো টাকার এক পয়সাও কম নয়; দিতে না পার তো জেলে যাও"। সুতরাং চাষার আর রক্ষা নাই।

এমন সময় শামলা মাথায় চশমা চোখে তোখোড়-বুদ্ধি উকিল এসে বলল, "ঐ একশো টাকা আমায় দিলে, তোমার বাঁচবার উপায় করতে পারি।" চাষা তার হাতে ধরল, পায়ে ধরল, বলল, "আমায় বাঁচিয়ে দিন।" উকিল বলল, "তবে শোন, আমার ফন্দি বলি। যখন আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে, তখন বাপু কথা-টথা কয়ো না। যে যা খুসি বলুক, গাল দিক আর প্রশ্ন করুক, তুমি তার জবাবটি দেবে না—খালি পাঁঠার মতো 'ব্যা—' করবে। তা যদি করতে পার, তা হ'লে আমি তোমায় খালাস করিয়ে দেব।" চাষা বলল, "আপনি কর্তা যা বলেন, তাতেই আমি রাজী।"

আদালতে মহাজনের মস্ত উকিল, চাষাকে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি সাত বছর আগে পঁচিশ টাকা কর্জ নিয়েছিলে?" চাষা তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "ব্যা—"। উকিল বলল, "খবরদার!—বল, নিয়েছিলে কি না।" চাষা বলল, "ব্যা—"। উকিল বলল, "হুজুর! আসামীর বেয়াদবি দেখুন।" হাকিম রেগে বললেন, "ফের্ যদি অম্‌নি করিস, তোকে আমি ফাটক দেব।" চাষা অত্যন্ত ভয় পেয়ে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বলল, "ব্যা—ব্যা—"। হাকিম বললেন, "লোকটা পাগল নাকি?"

তখন চাষার উকিল উঠে বলল, "হুজুর, ও কি আজকের পাগল—ও বহুকালের পাগল, জন্মে অবধি পাগল। ওর কি কোনো বুদ্ধি আছে, না কাণ্ডজ্ঞান আছে? ও আবার কর্জ নেবে কি! ও কি কখনও খত্ লিখতে পারে নাকি? আর পাগলের খত্ লিখলেই বা কি? দেখুন দেখি, এই হতভাগা মহাজনটার কাণ্ড দেখুন তো! ইচ্ছে ক'রে জেনে শুনে পাগলটাকে ঠকিয়ে নেবার মতলব করেছে। আরে, ওর কি মাথার ঠিক আছে? এরা বলেছে, 'এইখানে একটা আঙ্গুলের টিপ্ দে'—পাগল কি জানে, সে অম্‌নি টিপ্ দিয়েছে। এই তো ব্যাপার!"

দুই উকিলে ঝগড়া বেধে গেল। হাকিম খানিক শুনে-টুনে বললেন, "মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্।" মহাজনের তো চক্ষুস্থির। সে আদালতের বাইরে এসে চাষাকে বলল, "আচ্ছা, না হয় তোর চারশো টাকা ছেড়েই দিলাম—ঐ একশো টাকাই দে।" চাষা বলল, "ব্যা—!" মহাজন যতই বলে, যতই বোঝায়, চাষা তার পাঁঠার বুলি কিছুতেই ছাড়ে না। মহাজন রেগে-মেগে ব'লে গেল, "দেখে নেব, আমার টাকা তুই কেমন ক'রে হজম করিস!"

চাষা তার পোঁট্‌লা নিয়ে গ্রামে ফিরতে চলেছে, এমন সময় তার উকিল এসে ধরল, "যাচ্ছ কোথায় বাপু? আমার পাওনাটা আগে চুকিয়ে যাও। একশো টাকায় যে রফা হয়েছিল, এখন মোকদ্দমা তো জিতিয়ে দিলাম।" চাষা অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যা—।" উকিল বলল, "বাপু হে, ও-সব চালাকি খাটবে না—

টাকাটি এখন বের কর।'' চাষা বোকার মতো মুখ ক'রে আবার বলল, ''ব্যা—।'' উকিল তাকে নরম গরম অনেক কথাই শোনাল, কিন্তু চাষার মুখে কেবলই ঐ এক জবাব! তখন উকিল বলল, ''হতভাগা গোমুখ্যু পাড়াগেঁয়ে ভূত—তোর পেটে অ্যাতো শয়তানি কে জানে! আগে যদি জানতাম তা হ'লে পোঁট্‌লাসুদ্ধ টাকাগুলো আটকে রাখতাম।''

বুদ্ধিমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হল না।

বুদ্ধিমান শিষ্য

এক মুনি, তাঁর অনেক শিষ্য। মুনিঠাকুর তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে এক মস্ত যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সে যজ্ঞ এর আগে মুনির আশ্রমে আর হয়নি। তাই তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, "আমি এক যজ্ঞের আয়োজন করেছি, সে যজ্ঞ তোমরা হয়তো আর কোথাও দেখবার সুযোগ পাবে না, কাজেই যজ্ঞের সব কাজ কর্ম বিধি ব্যবস্থা বেশ মন দিয়ে দেখো। নিজের চোখে সব ভালো ক'রে না দেখলে শুধু পুঁথি পড়ে এ যজ্ঞ করা সম্ভব হবে না।"

মুনিঠাকুরের আশ্রমে বেড়ালের ভারি উৎপাত; যজ্ঞের আয়োজন সব ঠিক হচ্ছে, এর মধ্যে বেড়ালগুলো এসে জ্বালাতন আরম্ভ করেছে—এটাতে মুখ দেয়, ওটা উল্‌টে ফেলে, কিছুতেই তাদের সামলানো যায় না। তখন মুনিঠাকুর রেগে বললেন, "বেড়াল-গুলোকে ধরে ঐ কোণায় বেঁধে রেখে দাও তো।" অমনি নয়টা বেড়ালকে ধরে সভার এক পাশে খোঁটায় বেঁধে রাখা হল। তারপর ঠিক সময় বুঝে যজ্ঞ আরম্ভ হল। শিষ্যেরা সব সভার সাজসজ্জা, আয়োজন, যজ্ঞের সব ক্রিয়া-কাণ্ড, মন্ত্রোচ্চারণের নিয়ম ইত্যাদি মন দিয়ে দেখতে আর শুনতে লাগল। নির্বিঘ্নে অতি সুন্দররূপে মুনি-ঠাকুরের যজ্ঞ সম্পন্ন হল।

কিছুকাল পরে শিষ্যদের মধ্যে একজনের বাবা মারা গেলেন। শিষ্যের ভারি ইচ্ছা তার পিতৃশ্রাদ্ধে সেও ঐ রকম সুন্দর যজ্ঞের আয়োজন করে। সে গিয়ে তার গুরুকে ধরল। তিনি বললেন, "আচ্ছা, সব আয়োজন করতে থাক, আমি এসে যজ্ঞের পুরোহিত হব।" শিষ্য মহা সন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞের সব ঠিকঠাক করতে লাগল।

ক্রমে যজ্ঞের দিন উপস্থিত। মুনিঠাকুর সশিষ্য শ্রাদ্ধের সভায় উপস্থিত; ঠিক নিয়ম মতো যজ্ঞের সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু শিষ্যটি তখনও সভাস্থলে এসে বসছে না, কেবল ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছে। এদিকে যজ্ঞের সময় প্রায় উপস্থিত দেখে মুনিঠাকুরও ক্রমে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি শিষ্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর বিলম্ব কেন? সবই তো প্রস্তুত, যজ্ঞের সময়ও উপস্থিত, এই বেলা সভায় এস।" শিষ্য বলল, "আজ্ঞে একটা আয়োজন বাকি রয়ে গেছে, সেইটা নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছি।" মুনি বললেন, "কই, কিছুরই তো অভাব দেখছি না।" শিষ্য বলল, "আজ্ঞে চারটে বেড়াল কম পড়েছে।" মুনি বললেন, "সে কি রকম?" শিষ্য মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলল, "ঐ যে আপনার যজ্ঞে দেখলাম ঈশান কোণে নয়টা বেড়াল বাঁধা রয়েছে। আমাদের এ গ্রামে অনেক খুঁজে পাঁচটার বেশি পাওয়াই গেল না, কাজেই আর বাকি চারটার জন্য পাশের গ্রামে লোক গিয়েছে; তারা এই এসে পড়ল ব'লে।" শুনে গুরুর তো চক্ষুস্থির! তিনি বললেন, "আরে বুদ্ধিমান! কোনটা যজ্ঞের অংগ আর কোনটা নয় তাও বিচার করতে শেখনি? আশ্রমের বেড়ালগুলি উৎপাত করছিল তাই বেঁধে রেখেছিলাম, তোমার এখানে কোনো উৎপাত ছিল না, তুমি আবার গায়ে পড়ে উৎপাত সংগ্রহ করতে গিয়েছ? বসে পড়, বসে পড়, আর বেড়াল ধরে কাজ নেই। এখন যজ্ঞটা নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে যাক্।"

শিষ্য নিজের আহাম্মকিতে লজ্জিত হয়ে অপ্রস্তুত ভাবে সভার মধ্যে বসে পড়ল।

ছিটেফোঁটা

ডাক্তার ফস্টার
ইস্কুল মাস্টার।
বেত তার চট্‌পট্‌,
ছাত্রেরা ছট্‌ফট্‌—
ভয়ে সব পস্তায়,
বাড়ি ছেড়ে রাস্তায়,
গ্রাম ছেড়ে শহরে,
গয়া কাশী লাহোরে।
ফিরে আসে সন্ধ্যায়
পড়ে শোনে মন দ্যায়॥

বাস্‌রে বাস্‌! সাবাস্‌ বীর!
ধনুকখানি ধ'রে,
পায়রা দেখে মারলে তীর—
কাগ্‌টা গেল ম'রে!

বল্‌ছি, ওরে ছাগলছানা,
উড়িস্‌নে রে উড়িস্‌নে।
জানিস্‌নে তোর উড়তে মানা—
হাত পাগ্‌লো ছুঁড়িস্‌নে।

জংলা বনে পাগ্‌লা বুড়ো আমায় এসে বলে,
"আড়াই বিঘা সমুদ্রেতে কাঁঠাল কত ফলে?"
আমিও বলি আন্দাজেতে. "বল্‌ছি শোন কত—
তোমাদের ঐ ঝিঙের ক্ষেতে চিংড়ি গজায় যত।"

*

খিল্‌খিল্লির মুল্লুকেতে থাকত নাকি দুই বেড়াল,
একটা শুধায় আরেকটাকে, ''তুই বেড়াল না মুই বেড়াল?''
তাই থেকে হয় তর্ক শুরু. চীৎকারে তার ভূত পালায়,
আঁচড় কামড় চার্কিবাজী ধাঁই চটাপট্‌ চড় চালায়।
খাম্‌চা খাবল ডাইনে বাঁয়ে হুড়মুড়িয়ে হুলোর মতো,
উড়ল রোঁয়া চারদিকেতে রাম-ধুনুরীর তুলোর মতো।
তর্ক যখন শান্ত হল, ক্ষান্ত হল আঁচড় দাগা,
থাকত দুটো আস্ত বেড়াল, রইল দুটো ল্যাজের ডগা।

বুড়ো তুমি লোকটি ভালো,
চেহারাও নয়তো কালো—
তবু কেন তোমায় ভালো বাস্‌ছিনে?
কেন, তা তো কেউ না জানে,
ভেবে কিছু পাইনে মানে,
যত ভাবি ততই ভালো বাস্‌ছিনে।

*

আরে ছি ছি, রাম রাম! কলকেতা শহরে
লাল ধুতি পরে মুদি, তিন হাত বহরে।
মখ্‌মলি জামা জুতো ঝক্‌মকে টোপরে,
খায় দায় গান গায় রাস্তার উপরে।

*

উঠোন-কোণে কড়াই ছিল,
পায়েস ছিল তাতে,
তাই নিয়ে কাক লড়াই করে
কুঁকড়ো বুড়োর সাথে,
যুদ্ধ জিতে বড়াই ভারি,
তখন দেখে চেয়ে—
কখন এসে চড়াই পাখি,
পায়েস গেছে খেয়ে।

*

নন্দ ঘোষের শাম্‌লা গরু
ভাগলো কোথায় লক্ষ্মীছাড়া?
নন্দ ছোটে বনবাদাড়ে,
সন্ধানে ধায় বদ্যিপাড়া;
শেষকালেতে অর্ধরাতে,
হদ্দ হ'য়ে ফিরলে পরে—
বাসায় দেখে, ঘুমোয় গরু
ল্যাজ গুটিয়ে গোয়াল ঘরে।

অন্যান্য গল্প

বোকা বুড়ী

এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ী। তারা ভারি গরীব। আর বুড়ী বেজায় বোকা আর ভয়ানক বেশি কথা বলে—যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়—তার পেটে কোন কথা থাকে না।

বুড়ো একদিন তার জমি চষ্‌তে চষ্‌তে মাটির নিচে এক কলসী পেলে, সেই কলসী ভরা টাকা আর মোহর! তখন তার ভারি ভাবনা হল—এ টাকা যদি ফেলে রাখি কোনদিন কে চুরি ক'রে নেবে। আর যদি টাকা বাড়ি নিয়ে যাই, বুড়ী টের পেয়ে যাবে—সে সকলের কাছে তার গল্প করবে; ক্রমে কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়লে রাজার কোটাল এসে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যাবে। ভেবে ভেবে সে এক ফন্দি আঁট্‌ল। সে ঠিক করল যে বুড়ীকে সব কথা বলবে কিন্তু এ রকম উপায় করব যাতে বুড়ীর কথা কেউ না বিশ্বাস করে।

তখন সে একটা মাছ কিনে এনে তার ক্ষেতের ধারে একটা গাছের উপর বেঁধে রাখল, আর একটা খরগোস এনে নদীর ধারে একটা গর্তের মধ্যে জাল দিয়ে জড়িয়ে রাখল। তারপর সে তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল, "একটা ভারি আশ্চর্য খবর শুনলাম—গাছের ডালে নাকি মাছ উড়ে বসে আর খরগোস নাকি জলে খেলা করে। আমাদের গণক ঠাকুর বলেন—

"মৎস্য বসেন গাছে
জলে খরগোস নাচে
গুপ্ত রতন খুঁজলে পাবে খুঁড়লে তারি কাছে।"

বুড়ী বলল, "তোমার যেমন কথা!" বুড়ো বলল, "হাঁ! এরকম নাকি সত্যি সত্যি দেখা গেছে।" এই বলে বুড়ো আবার কাজে বেরুল।

আধঘণ্টা না যেতে যেতেই বুড়ো আবার ফিরে এসে ভারি ব্যস্ত হয়ে বুড়ীকে সেই টাকা পাওয়ার কথা বলল। তখন বুড়ো বুড়ী মিলে টাকা আনতে চলল। পথে যেতে যেতে বুড়ো সেই গাছতলায় এসে বলল, "গাছের উপর চক্‌চক্‌ করছে কি?" এই বলে সে একটা ঢিল ছুঁড়তেই মাছটা পড়ে গেল। বুড়ী ত অবাক! তখন বুড়ো বলল, "নদীতে জাল ফেলেছিলাম, মাছ-টাছ পড়ল কিনা দেখে আসি।" জাল টানতেই—ওমা! খরগোস যে! তখন বুড়ো বলল, "কেমন! গণক ঠাকুরের কথা আর অবিশ্বাস করবে?" তারপর টাকা নিয়ে তারা বাড়ি এল।

টাকা পেয়েই বুড়ী বলল, "ঘর করব, বাড়ি করব, গহনা বানাব, পোশাক কিনব।" বুড়ো বলল, "ব্যস্ত হ'য়ো না—কিছুদিন র'য়ে স'য়ে দেখ—ক্রমে সবই হবে। হঠাৎ অত কাণ্ড করলে লোকে সন্দেহ করবে যে।" কিন্তু বুড়ীর তাতে মন উঠে না—সে একে বলে, ওকে বলে; শেষে একবারে কোটালের কাছে নালিশ ক'রে দিল। কোটালের হুকুমে বুড়োকে হাতকড়া দিয়ে হাজির করা হল।

বুড়ো সব কথা শুনে বলল, "সে কি হুজুর! আমার স্ত্রীর কি মাথার কিছু ঠিক আছে? সে ত ওরকম আবোল তাবোল কত কি বলে।" কোটাল তখন তেড়ে উঠলেন—

"বটে! তুমি টাকা পেয়ে লুকিয়ে রেখেছ—আবার বুড়ীর নামে দোষ দিচ্ছ?" বুড়ো বলল, "কিসের টাকা? কবে পেলাম? কোথায় পেলাম? আমি তো কিছুই জানি না।"

বুড়ী বলল, "না তুমি কিছুই জান না? সেই যেদিন গাছের ডালে মাছ বসেছিল, নদীতে জাল ফেলে খরগোস ধরলে—সেদিনের কথা তোমার মনে নেই? কাঁচ খোকা আর কি?"

তাই শুনে সবাই হাসতে লাগল; কোটাল এক ধমক দিয়ে বুড়ীকে বলল—"যা পাগ্‌লী, বাড়ি যা! ফের যদি এসব যা-তা বলবি তোকে আমি কয়েদ ক'রে রাখব।"

বুড়ী তখন বাড়ি ফিরে গেল। কোটালের ভয়ে সে আর কারু কাছে টাকার কথা বলত না।

রাগের ওষুধ

কেদারবাবু বড় বদরাগী লোক। যখন রেগে বসেন, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

একদিন তিনি মুখখানা বিষণ্ণ ক'রে বসে আছেন, এমন সময় আমাদের মাস্টারবাবু এসে বললেন, 'কি হে কেদারকেষ্ট, মুখখানা হাঁড়ি কেন?'

কেদারবাবু বললেন, 'আর মশাই, বলবেন না। আমার সেই রুপোবাঁধানো হুঁকোটা ভেঙে সাত টুকরো হয়ে গেল—মুখ হাঁড়ির মত হবে না তো কি বদনার মত হবে?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'বল কি হে? এ তো কাচের বাসন নয় কি মাটির পুতুল নয়—অমনি খামখা ভেঙে গেল, এর মানে কি?'

কেদারবাবু বললেন, 'খামখা ভাঙতে যাবে কেন—কথাটা শুনুন না। হল কী,—কাল রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় নি। সকালবেলা উঠেছি, মুখ হাত ধুয়ে তামাক খেতে বসব, এমন সময় কল্‌কেটা কাত হয়ে আমার ফরাসের উপর টিকের আগুন প'ড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি যেই আগুনটা সরাতে গেছি অমনি কিনা আঙুলে ছ্যাঁক্ করে ফোস্কা প'ড়ে গেল! আচ্ছা, আপনিই বলুন—এতে কার না রাগ হয়? আরে, আমার হুঁকো, আমার কল্‌কে, আমার আগুন, আমার ফরাস, আবার আমার উপরেই জুলুম! তাই আমি রাগ ক'রে—বেশি কিছু নয়—ঐ মুগুরখানা দিয়ে পাঁচ দশ ঘা মারতেই কিনা হতভাগা হুঁকোটা ভেঙে খান্ খান্!'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তা যাই বল বাপু, এ রাগ বড় চণ্ডাল—রাগের মাথায় এমন কাণ্ড ক'রে বস, রাগটা একটু কমাও।'

'কমাও তো বললেন—রাগ যে মুখের কথায় বাগ মানবে—এ রাগ আমার তেমন নয়।'

'দেখো, আমি এক উপায় বলি। শুনেছি, খুব ধীরে ধীরে এক দুই তিন ক'রে দশ গুনলে—রাগটা নাকি শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু তোমার যেমন রাগ, তাতে দশ-বারোতে কুলোবে না—তুমি একেবারে একশো পর্যন্ত গুনে দেখো।'

তারপর একদিন কেদারবাবু ইস্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তখন ছুটির সময়, ছেলেরা খেলা করছে। হঠাৎ একটা মার্বেল ছুটে এসে কেদারবাবুর পায়ের হাড়ে ঠাঁই করে লাগল। আর যায় কোথা! কেদারবাবু ছাতের সমান এক লাফ দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ছেলের দল যে যেখানে পারে একেবারে সটান চম্পট্। তখন কেদারবাবুর

মনে হল মাস্টারবাবুর কথাটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখি। তিনি আরম্ভ করলেন, এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ—

ইস্কুলের মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে বিড়্‌বিড়্‌ করে অংক বলছে, তাই দেখে ইস্কুলের দারোয়ান ব্যস্ত হয়ে কয়েকজন লোক ডেকে আনল। একজন বলল, 'কী হয়েছে মশাই?' কেদারবাবু বললেন, 'ষোলো—সতেরো—আঠারো—উনিশ—কুড়ি—'

সকলে বলল, 'এ কী? লোকটা পাগল হল নাকি?—আরে, ও মশাই, বলি অমন-ধারা কচ্ছেন কেন?' কেদারবাবু মনে মনে ভয়ানক চটলেও—তিনি গুনেই চলেছেন, 'ত্রিশ—একত্রিশ—বত্রিশ—তেত্রিশ—'

আবার খানিক বাদে আর একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মশাই, আপনার কি অসুখ করেছে? কবরেজ মশাইকে ডাকতে হবে?' কেদারবাবু রেগে আগুন হয়ে বললেন, 'উনষাট—ষাট—একষট্টি—বাষট্টি—তেষট্টি—'

দেখতে দেখতে লোকের ভিড় জমে গেল—চারিদিকে গোলমাল, হৈ চৈ। তাই শুনে মাস্টারবাবু দেখতে এলেন, ব্যাপারখানা কি! ততক্ষণে কেদারবাবুর গোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি দুই চোখ লাল করে লাঠি ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন, 'ছিয়ানব্বুই—সাতানব্বুই—আটানব্বুই—নিরেনব্বুই—একশো—কোন্ হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মিথ্যাবাদী বলেছিল একশো গুনলে রাগ থামে?' বলেই ডাইনে বাঁয়ে দুম্‌দাম্ লাঠির ঘা।

লোকজন সব ছুটে পালাল। আর মাস্টারমশাই এক দৌড়ে সেই যে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, আর সারাদিন বেরোলেন না।

পালোয়ান

তাহার আসল নামটি যে কি ছিল, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছি—কারণ আমরা সকলেই তাহাকে ''পালোয়ান'' বলিয়া ডাকিতাম। এমন কি মাস্টারমহাশয়েরা পর্যন্ত তাহাকে ''পালোয়ান'' বলিতেন। কবে কেমন করিয়া তাহার এরূপ নামকরণ হইল, তাহা মনে নাই; কিন্তু নামটি যে তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল, একথা স্কুল শুদ্ধ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত।

প্রথমত, তাহার চেহারাটি ছিল একটু অতিরিক্ত রকমের হৃষ্টপুষ্ট। মোটা সোটা হাত পা, ব্যাঙের মত গোব্‌দা গলা—তাহার উপরেই গোলার মতো মাথাটি—যেন ঘাড়ে পিঠে এক হইয়া গিয়াছে। তার উপর সে কলিকাতায় গিয়া স্বচক্ষে কাল্লু ও করিমের লড়াই দেখিয়া আসিয়াছিল, এবং বড় বড় কুস্তির এমন আশ্চর্য রকম বর্ণনা দিতে পারিত যে, শুনিতে শুনিতে আমাদেরই রক্ত গরম হইয়া উঠিত। এক এক দিন উৎসাহের চোটে আমরাও তাল ঠুকিয়া স্কুলের উঠানে কুস্তি বাধাইয়া দিতাম। পালোয়ান তখন পাশে দাঁড়াইয়া নানারকম অংগভংগী করিয়া আমাদের প্যাঁচ ও কায়দা বাত্‌লাইয়া দিত। মাখনলাল আমার চাইতে আড়াই বছরের ছোট, কিন্তু পালোয়ানের কাছে ''ল্যাং মুচ্‌কির'' প্যাঁচ শিখিয়া সে যেদিন আমায় চিৎপাত করিয়া ফেলিল, সেইদিন হইতে সকলেরই বিশ্বাস হইল যে পালোয়ান ছোকরাটা আর কিছু না বুঝুক কুস্তিটা বেশ বোঝে।

ঘোষেদের পাঠশালার ছাত্রগুলি বেজায় ডানপিটে। খামখা এক একদিন আমাদের

সঙ্গে গায়ে পড়িয়া তাহারা ঝগড়া বাধাইত। মনে আছে, একদিন ছুটির পরে আমি আর পাঁচ সাতটি ছেলের সঙ্গে গোঁসাইবাড়ির পাশ দিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় দেখি পাঠশালার চারটা ছোকরা ঢেলা মারিয়া আম পাড়িতেছে। একটা ঢিল আরেকটু হইলেই আমার গায়ে পড়িত। আমরা দলে ভারি ছিলাম, সেই সাহসে আমাদের একজন ধমক দিয়া উঠিল, "এইও, বেয়াদব! মানুষ চোখে দেখিস্ নে?" ছোকরাদের এমনি আস্পর্ধা, একজন অমনি বলিয়া উঠিল, "হাঁ, মানুষ দেখি, বাঁদরও দেখি!"— শুনিয়া বাকী তিনটায় অসভ্যের মত হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। আমার তখন ভয়ানক রাগ হইল, আমি আস্তিন গুটাইয়া বলিলাম, "পরেশ! দে ত আচ্ছা ক'রে ঘা দুচ্চার কষিয়ে।" পরেশও দমিবার পাত্র নয়, সে হুঙ্কার দিয়া বলিল, "গুপে, আনত ওই ছোক্‌রাটার কানে ধ'রে।" গোপীকেষ্ট বলিল, "আমার হাতে বই আছে—ওরে ভুতো, তুই ধর্ দেখি একবার চেপে—"। ভুতোর বাড়ি বাঙাল দেশে—তার মেজাজটি যখন মাত্রায় চড়ে তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না—সে একটা ছোকরার কানে প্রকাণ্ড এক কীল বসাইয়া দিল। কীল খাইয়াই সে হতভাগা একেবারে 'গোব্‌রাদা' বলিয়া চীৎকার দিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাকী তিনজনও 'গোব্‌রাদা', 'গোব্‌রাদা' বলিয়া এমন একটা হৈ চৈ রব তুলিল যে, আমরা ব্যাপারটা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া রহিলাম। এমন সময় একটা কুচ্‌কুচে কালো মূর্তি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। আসিয়াই আর কথাবার্তা না বলিয়াই ভুতোর ঘাড়ে ধাক্কা মারিয়া, গুপের কান মলিয়া, আমার গালে ঠাস্‌ঠাস্ দুই চড় লাগাইয়া দিল। তারপর কাহার কি হইল আমি খবর রাখিতে পারি নাই। মোট কথা, সেদিন আমাদের যতটা অপমান বোধ হইয়াছিল, ভয় হইয়াছিল তাহার চাইতেও বেশি। সেই হইতে গোব্‌রার নাম শুনিলেই ভয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া আসিত।

পালোয়ানের কেরামতির পরিচয় পাইয়া আমাদের মনে ভরসা আসিল। আমরা ভাবিলাম, এবার যেদিন পাঠশালার ছেলেগুলা আমাদের ভ্যাংচাইতে আসিবে, তখন আমরাও আরো বেশি করিয়া ভ্যাংচাইতে ছাড়িব না। পালোয়ানও এ কথায় খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহাদের ঝগড়া বাধাইবার আর কোন মতলব দেখা গেল না, তখন আমাদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। আমরা বলিতে লাগিলাম, "ওরা নিশ্চয়ই পালোয়ানের কথা শুনতে পেয়েছে।" পালোয়ান বলিল—"হ্যাঁ, তাই হবে। দেখছ না, এখন আর বাছাদের টুঁ শব্দটি নেই।" তখন সবাই মিলিয়া স্থির করিলাম যে পালোয়ানকে সঙ্গে লইয়া গোব্‌রার দলের সঙ্গে ভালরকম বোঝাপড়া করিতে হইবে।

শনিবার দুইটার সময় স্কুল ছুটি হইয়াছে, এমন সময় কে যেন আসিয়া খবর দিল যে গোব্‌রা চার-পাঁচটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পুকুরঘাটে বসিয়া গল্প করিতেছে। যেমন শোনা অমনি আমরা দলেবলে হৈ হৈ করিতে করিতে সেখানে গিয়া হাজির! আমাদের ভাবখানা দেখিয়াই বোধ হয় তাহারা বুঝিয়াছিল যে আমরা কেবল বন্ধুভাবে আলাপ করিতে আসি নাই। তাহারা শশব্যস্ত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই আমরা তিন-চারজনে মিলিয়া গোব্‌রাকে একেবারে চাপিয়া ধরিলাম। সকলেই ভাবিলাম, এ-যাত্রায় গোব্‌রার আর রক্ষা নাই। কিন্তু আহাম্মক রামপদটা সব মাটি করিয়া দিল। সে বোকারাম ছাতা হাতে হাঁ করিয়া তামাসা দেখিতেছিল, এমন সময় পাঠশালার একটা ছোকরা এক থাব্‌ড়া মারিয়া তাহার ছাতাটা কাড়িয়া লইল। আমরা ততক্ষণে গোব্‌রা-চাঁদকে চিৎপাত করিয়া আনিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে পিঠে ডাইনে বাঁয়ে

ধপাধপ্ ছাতার বৃষ্টি শুরু হইল। আমরা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম, আর সেই ফাঁকে গোব্‌রাও এক লাফে গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তাহার পর চক্ষের নিমেষে তাহারা আমাদের চার-পাঁচজনকে ধরিয়া পুকুরের জলে ভালরকমে চুবাইয়া রীতিমত নাকাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। এই বিপদের সময় আমাদের দলের আর সকলে কে যে কোথায় পালাইল, তাহার আর কিনারাই করা গেল না। সব চাইতে আশ্চর্য এই যে, ইহার মধ্যে পালোয়ান যে কখন নিরুদ্দেশ হইল,—তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া আমাদের গলা ফাটিয়া গেল, তবু তাহার সাড়া পাইলাম না।

সোমবার স্কুলে আসিয়াই আমরা সবাই মিলিয়া পালোয়ানকে গাল দিতে লাগিলাম। কিন্তু সে যে কিছুমাত্র লজ্জিত হইয়াছে, এমন বোধ হইল না। সে বলিল—"তোরা যে এমন আনাড়ি, তা জানলে কি আমি তোদের সঙ্গে যাই? আচ্ছা, গোব্‌রা যখন তোর টুঁটি চেপে ধরল, তখন আমি যে 'ডানপট্‌কান দে' ব'লে এত চেঁচালাম—কৈ, তুই তো তার কিছুই করলি না। আর ঐ গুপেটা, ওকে আমি এতবার বলেছি যে ল্যাংমুচ্‌কি মারতে হ'লে পাল্টা রোখ্ সামলে চলিস—তা তো ও শুনবে না! এরকম করলে আমি কি করব বল্? ওসব দেখে আমার একেবারে ঘেন্না ধ'রে গেল—তাই বিরক্ত হয়ে চ'লে এলুম। তারপর ভুতোটা, ওটা কি করল বল্ দেখি! আরে, দেখছিস যখন দোরোখা প্যাঁচ্ মারছে, তখন বাপু আহ্লাদ ক'রে কাৎ হ'য়ে পড়তে গেলি কেন?"—ভুতো এতক্ষণ কিছু বলে নাই, কিন্তু পালোয়ানের এই টিপ্পনী কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত তাহার মেজাজের উপর ছ্যাঁক্ করিয়া লাগিল। সে গলায় ঝাঁকড়া দিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "তুমি বাপু কানকাটা কুকুরের মত পলাইছিলা ক্যান্?" সর্বনাশ! পালোয়ানকে "কানকাটা কুকুর" বলা! আমরা ভাবিলাম "দেখ, বাঙাল মরে বুঝি এবার!" পালোয়ান খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ্ বাঙাল! বেশী চালাকি করিস তো চর্‌কী প্যাঁচ লাগিয়ে একেবারে তুর্কী নাচন নাচিয়ে দেব!" ভুতো বলিল, "তুমি নাচলে বান্দর নাচবা।" রাগে পালোয়ানের মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল। সে বেঞ্চি ডিঙাইয়া একেবারে বাঙালের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। তারপর দুইজনে কেবল হুড়াহুড়ি আর গড়াগড়ি। আশ্চর্য এই, পালোয়ান এত যে কায়দা আর এত যে প্যাঁচ্ আমাদের উপর খাটাইত, নিজের বেলায় তার একটিও তাহার কাজে আসিল না। ঠিক আমাদেরই মত হাত-পা ছুঁড়িয়া সে খামচা-খামচি করিতে লাগিল। তারপর বাঙাল যখন তাহার বুকের উপর চড়িয়া দুই হাতে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল, তখন আমরা সকলে মিলিয়া দুজনকে ছাড়াইয়া দিলাম। পালোয়ান হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেঞ্চে বসিয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিল, "গত বছর এই ডান হাতের কব্জিটা জখম হয়েছিল—তাই বড় বড় প্যাঁচ্‌গুলো দিতে ভরসা হয় না—যদি আবার মচ্‌কে ফচ্‌কে যায়! তা নৈলে ওকে একবার দেখে নিতুম।" ভুতো এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, তাহার নাকের সামনে একবার বেশ করিয়া "কাঁচকলা" দেখাইয়া লইল।

ভুতো ছেলেটি দেখিতে যেমন রোগা এবং বেঁটে, তার হাত-পাগুলিও তেমনি লট্‌পটে, পালোয়ানের পালোয়ানী সম্বন্ধে অনেকের যে আশ্চর্য ধারণা ছিল, সেই দিনই তাহা ঘুচিয়া গেল। কিন্তু পালোয়ান নামটি আর কিছুতেই ঘুচিল না, সেটি শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

হাসির গল্প

আমাদের পোস্টাপিসের বড়বাবুর বেজায় গল্প করিবার সখ। যেখানে সেখানে সভায় আসরে নিমন্ত্রণে, তিনি তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার খুলিয়া বসেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর ভাণ্ডার অতি সামান্য—কতগুলি বাঁধা গল্প, তাহাই তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া সব জায়গায় চালাইয়া দেন। কিন্তু একই গল্প বারবার শুনিতে লোকের ভাল লাগিবে কেন? বড়বাবুর গল্প শুনিয়া আর লোকের হাসি পায় না। কিন্তু তবু বড়বাবুর উৎসাহও তাহাতে কিছুমাত্র কমে না।

সেদিন হঠাৎ তিনি কোথা হইতে একটা নূতন গল্প সংগ্রহ করিয়া, মুখুজ্জেদের মজ্‌লিসে শুনাইয়া দিলেন। গল্পটা অতি সামান্য কিন্তু তবু বড়বাবুকে খাতির করিয়া সকলেই হাসিল। বড়বাবু তাহা বুঝিলেন না, তিনি ভাবিলেন গল্পটা খুব লাগসই হইয়াছে। সুতরাং, তার দুদিন বাদে যদু মল্লিকের বাড়ি নিমন্ত্রণে বসিয়া, তিনি খুব আড়ম্বর করিয়া আবার সেই গল্প শুনাইলেন। দু একজন, যাহারা আগে শোনে নাই, তাহারা শুনিয়া বেশ একটু হাসিল। বড়বাবু ভাবিলেন গল্পটা জমিয়াছে ভাল।

তারপর ডাক্তারবাবুর ছেলের ভাতে তিনি আবার সেই গল্পই খুব উৎসাহ করিয়া শুনাইলেন। এবারে ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কেহ গল্প শুনিয়া হাসিল না, কিন্তু বড়বাবু নিজেই হাসিয়া কুটি কুটি।

তারপরেও যখন তিনি আরও দু তিন জায়গায় সেই একই গল্প চালাইয়াদিলেন, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষম চটিয়া গেল। বিশু বলিল, "না হে, আর ত সহ্য হয় না। বড়বাবু ব'লে আমরা এতদিন সয়ে আছি—কিন্তু ওঁর গল্পের উৎসাহটা একটু না কমালে চলছে না।"

দুদিন বাদে, আমরা দশবারোজনে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় বড়বাবুর নাদুস্‌নুদুস্‌ মূর্তিখানা দেখা দিল। আমরা বলিলাম, "আজ খবরদার! ওঁর গল্প শুনে কেউ হাসতে পাবে না! দেখি উনি কি করেন।" বড়বাবু বসিতেই বিশু বলিয়া উঠিল, "নাঃ, বড়বাবু আজকাল যেন কেমন হ'য়ে গেছেন। আগে কেমন মজার মজার সব গল্প বলতেন। আজকাল, কৈ? কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন।" বড়বাবু একথায় ভারি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁর গল্প আর আগের মত জমে না, একথাটি তাঁহার একটুও ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "বটে? আচ্ছা রোস। আজ তোমাদের এমন গল্প শোনাব, হাস্‌তে হাস্‌তে তোমাদের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই মামুলি পুঁজি হইতে একটা গল্প আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গল্প বলিলে কি হইবে? আমরা কেহ হাসিতে রাজি নহি—সকলেই কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম। বিশু বলিল, "নাঃ, এ গল্পটা জুৎসই হল না।" তখন বড়বাবু তাঁহার সেই পুঁজি হইতে একে একে পাঁচ সাতটি গল্প শুনাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের মুখ পেঁচার মত আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল! তখন বড়বাবু ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "যাও যাও! তোমরা হাস্‌তে জান না—গল্পের কদর বোঝ না—আবার গল্প শুনতে

চাও! এই গল্প শুনে সেদিন ইন্‌স্পেক্টার সাহেব পর্যন্ত হেসে গড়াগড়ি—তোমরা এসব বুঝবে কি?'' তখন আমাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, ''সে কি বড়বাবু? আমরা হাস্‌তে জানিনে? বলেন কি! আপনার গল্প শুনে কতবার কত হেসেছি, ভেবে দেখুন ত'। আজকাল আপনার গল্পগুলো তেমন খোলে না—তা হাস্‌ব কোত্থেকে? এই ত, বিশুদা যখন গল্প বলে তখন কি আমরা হাসিনে? কি বলেন?''

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন, ''বিশু? ও আবার গল্প জানে নাকি? আরে, এক সঙ্গে দুটো কথা বলতে ওর মুখে আট্‌কায়, ও আবার গল্প বলবে কি?'' বিশু বলিল, ''বিলক্ষণ! আমার গল্প শোনেন নি বুঝি?'' আমরা সকলে উৎসাহ করিয়া বলিলাম— ''হাঁ, হাঁ, একটা শুনিয়ে দাও ত।'' বিশু তখন গম্ভীর হইয়া বলিল, ''এক ছিল রাজা''—শুনিয়া আমাদের চারু পাঁচজন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, ''আরে রাজার গল্প রে রাজার গল্প!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।''

বিশু বলিল, ''রাজার তিনটা ধাড়ি ধাড়ি ছেলে''—

শুনিবামাত্র আমরা একসঙ্গে প্রাণপণে এমন সশব্দে হাসিয়া উঠিলাম যে, বিশু নিজেই চম্‌কাইয়া উঠিল। সকলে হাসিতে হাসিতে, এ উহার গায়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম—কেহ বলিল, ''দোহাই বিশুদা, আর হাসিও না''—কেহ বলিল, ''বিশু-বাবু রক্ষে করুন, ঢের হয়েছে।'' কেহ কেহ এমন ভাব দেখাইল, যেন হাসিতে হাসিতে তাহাদের পেটে খিল ধরিয়া গিয়াছে।

বড়বাবু কিন্তু বিষম চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, ''এসব ঐ বিশুর কারসাজি। ওই আগে থেকে সব শিখিয়ে এনেছে। নইলে, ও যা বললে তাতে হাস্‌বার মত কি আছে বাপু?'' এই বলিয়া তিনি রাগে গজ্‌গজ্ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন।

সেই সময় হইতে বড়বাবুর গল্প বলার সখটা বেশ একটু কমিয়াছে। এখন আর তিনি যখন তখন কথায় কথায় হাসির গল্প ফাঁদিয়া বসেন না।

সত্যি



ইনি কে জানো না বুঝি? ইনি নিধিরাম পাটকেল।

কোন নিধিরাম? যার মিঠায়ের দোকান আছে?

আরে দুৎ! তা কেন? নিধিরাম ময়রা নয়—প্র-ফে-সার্ নিধিরাম!

ইনি কি করেন?

কি করেন আবার কি? আবিষ্কার করেন!

ও বুঝেছি! ঐ যে উত্তর মেরুতে যায়, যেখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা—মানুষজন সব মরে যায়—

দূর মুখ্যু! আবিষ্কার বললেই বুঝি উত্তর মেরু বুঝতে হবে, বা দেশ বিদেশে ঘুরতে হবে? তাছাড়া বুঝি আবিষ্কার হয় না?

ও! তাহলে?

মানে, বিজ্ঞান শিখে নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে নতুন নতুন কথা শিখছেন, নতুন নতুন জিনিস বানাচ্ছেন। ইনি আজ পর্যন্ত কত কী আবিষ্কার করেছেন তোমরা তার খবর রাখ কি? ওঁর তৈরি সেই গন্ধবিকট তেলের কথা শোননি? সেই তেলের আশ্চর্য গুণ! আমি নিজে মাখিনি বা খাইনি কিন্তু আমাদের বাড়িওয়ালার কে যেন বলেছেন যে সে ভয়ংকর তেল। সে তেল খেলে পরে পিলের ওষুধ, মাখলে পরে ঘায়ের মলম, আর গোঁফে লাগালে দেড় দিনে আধহাত লম্বা গোঁফ বেরোয়।

সে কী মশাই! তাও কি হয়?

আলবাৎ হয়! বললে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু নন্দলাল ডাক্তার বলেছে ভুলু মিত্তিরের খোকাকে ওই তেল মাখিয়ে তার এয়া মোটা গোঁফ হয়ে গেছিল।

কি আবোল তাবোল বকছেন মশাই!

বিশ্বেস করতে না চাও তা বিশ্বেস করো না, কিন্তু চোখে যা দেখছ তা বিশ্বেস করবে ত? কী কাণ্ড হচ্ছে দেখছ তো? ঐ দেখ নিধিরাম পাটকেলের নতুন কামান তৈরি হচ্ছে। নতুন কামান, নতুন গোলা, নতুন সব। একি সহজ কথা ভেবেছ? ওই রকম আর গোটা পঞ্চাশ কামান আর হাজার দশেক গোলা তৈরি হলেই উনি লড়াই করতে বেরুবেন।

সব নতুন রকম হচ্ছে বুঝি?

নতুন না তো কি? নতুন, অথচ সস্তা! ওই দেখ কামান আর ওই দেখ গোলা। কামানে কি আছে? নল আছে আর বাতাস ভরা হাপর আছে। নলের মধ্যে গোলা ভরে খুব খানিক দম নিয়ে ভ—শ্ করে যেমনি হাপর চেপে ধরবে অমনি হুশ্ করে গোলা গিয়ে ছিট্‌কে পড়বে আর ফট্ করে ফেটে যাবে।

তারপরে?

তার পরেই তো হচ্ছে আসল মজা। গোলার মধ্যে কি আছে জান? বিছুটির আরক আছে, লঙ্কার ধোঁয়া আছে, ছারপোকার আতর আছে, গাঁদালের রস আছে, পচা মুলোর একস্ট্রাকট আছে, আরও যে কত কি আছে, তার নামও আমি জানি না। যত রকম উৎকট বিশ্রী গন্ধ আছে, যত রকম ঝাঁঝালো তেজাল বিটকেল জিনিস আছে, আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে সব তিনি মিশিয়েছেন ঐ গোলার মধ্যে। সেদিন ছোট একটা গোলা ওঁর হাত থেকে প'ড়ে ফেটে গিয়েছিল শুনেছ তো?

তাই নাকি? তারপর হল কি?

যেমনি গোলা ফাটল অমনি তিনি চট্ করে একটা ধামা চাপা দিয়েছিলেন, নইলে কি হত কে জানে। তবু দেখছ ওষুধের গন্ধে আর ঝাঁঝে প্রফেসারের চেহারা কেমন হয়ে গেছে। তার আগে ওঁর চেহারা ছিল ঠিক কার্তিকের মত; মাথাভরা কোঁকড়া চুল আর এক হাত লম্বা দাড়ি! সত্যি!

সত্যি নাকি?

সত্যি না তো কি?

ঠুকে-মারি আর মুখে-মারি

মুখে-মারি পালোয়ানের বেজায় নাম,—তার মত পালোয়ান নাকি আর নাই। ঠুকে-মারি সত্যিকারের মস্ত পালোয়ান, মুখে-মারির নাম শুনে সে হিংসায় আর বাঁচে না। শেষে একদিন ঠুকে-মারি আর থাকতে না পেরে, কম্বলে নব্বুই মন আটা বেঁধে নিয়ে, সেই কম্বল কাঁধে ফেলে মুখে-মারির বাড়ি রওয়ানা হ'লো।

পথে এক জায়গায় বড্ড পিপাসা আর ক্ষিদে পাওয়ায় ঠুকে-মারি কম্বলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা ডোবার ধারে বিশ্রাম করতে বসল। তারপর চোঁ-চোঁ করে এক বিষম লম্বা চুমুক দিয়ে ডোবার অর্ধেক জল খেয়ে বাকি অর্ধেকটায় সেই আটা মেখে নিয়ে সেটাও সে খেয়ে ফেলল। শেষে মাটিতে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

সেই ডোবাতে একটা হাতী রোজ জল খেতে আসত। সেদিনও সে জল খেতে এল; ডোবা খালি দেখে তার ভারি রাগ হ'লো। পাশেই একটা মানুষ শুয়ে আছে দেখে সে তার মাথায় দিল গোদা পায়ের এক লাথি! ঠুকে-মারি বলল, "ওরে, মাথা

টিপেই দিবি যদি, একটু ভাল করে দে' না বাপু!'' হাতীর তখন আরো বেশী রাগ হ'লো। সে শুঁড়ে করে ঠুকে-মারিকে তুলে আছাড় মারতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ঠুকে-মারি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে হাতী মশাইকে থলের মধ্যে পুরে রওয়ানা হ'লো।

খানিক দূর গিয়ে সে মুখে-মারির বাড়িতে এসে হাজির হ'লো আর বাইরে থেকে চেঁচাতে লাগল, ''কই হে মুখে-মারি! ভারি নাকি পালোয়ান তুমি! সাহস থাকে তো লড় না এসে!'' শুনে মুখে-মারি তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছনে এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মুখে-মারির বৌ বলল, ''কর্তা আজ বাড়ি নেই। কোথায় যেন পাহাড় ঠেলতে গিয়েছেন।'' ঠুকে-মারি বলল, ''এটা তাকে দিয়ে ব'লো যে এর মালিক তার সঙ্গে লড়তে চায়।'' এই বলে সে হাতীটাকে ছুঁড়ে তাদের উঠানে ফেলে দিল।

ব্যাপার দেখে বাড়ির লোকের চক্ষুস্থির! কিন্তু মুখে-মারির সেয়ানা খোকা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ''ও মা গো! দুষ্টু লোকটা আমার দিকে একটা ইঁদুর ফেলেছে! কি করি বল তো?'' তার মা বলল, ''কিছু ভয় নেই। তোমার বাবা এসে ওকে উচিত শিক্ষা দেবেন। এখন ইঁদুরটাকে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।''

এই কথা বলা মাত্র ঝাঁটার ঝট্‌পট্ শব্দ হ'লো আর ছেলেটা বলল, ''ঐ যা! ইঁদুরটা নর্দমায় পড়ে গেল।'' ঠুকে-মারি ভাবল, ''যার খোকা এরকম, সে নিশ্চয়ই আমার উপযুক্ত জুড়ি হবে।''

বাড়ির সামনে একটা তাল গাছ ছিল, সেইটা উপড়ে নিয়ে ঠুকে-মারি হেঁকে বলল, ''ওরে খোকা, তোর বাবাকে বলিস্ যে আমার একটা ছড়ির দরকার ছিল, তাই এটা নিয়ে চল্‌লাম।'' খোকা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, ''ওমা দেখেছ? ঐ দুষ্টু লোকটা বাবার খড়্‌কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।'' খড়্‌কে কাঠি শুনে ঠুকে-মারির চোখ দুটো আলুর মত বড় হয়ে উঠল। সে ভাবল, ''দরকার নেই বাপু, ওসব লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে!'' সে তখনই হন্ হন্ করে সে গ্রাম ছেড়ে নিজের গ্রামে পালিয়ে গেল।

মুখে-মারি বাড়িতে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, ''কিরে! লোকটা গেল কই?'' খোকা বলল, ''সে ঐ তাল গাছটা নিয়ে পালিয়ে গেল।'' ''তুই তাকে কিছু বললি না?'' ''নিয়ে গেল, তা আমি আর তাকে বলব কি?'' এই কথা শুনে মুখে-মারি ভয়ানক রেগে বলল, ''হতভাগা! তুই আমার ছেলে হয়ে আমার নাম ডোবালি? দরকার হলে দুটো কথা বলতে পারিস্‌নে? যা! আজই তোকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব।'' এই বলে সে অপদার্থ ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দিতে চলল।

কিন্তু গঙ্গা তো গ্রামের কাছে নয়—সে অনেক দূর। মুখে-মারি হাঁটছে হাঁটছে আর ভাবছে, ছেলেটা যখন কান্নাকাটি করবে, তখন তাকে বলবে, ''আচ্ছা, এবার তোকে ছেড়ে দিলাম।'' কিন্তু ছেলেটা কাঁদেও না, কিছু বলেও না, সে বেশ আরামে কাঁধে চড়ে 'গঙ্গায়' চলেছে। তখন মুখে-মারি তাকে ভয় দেখিয়ে বলল, ''আর দেরী নেই, এই গঙ্গা এসে পড়ল বলে।'' ছেলেটা চট্ করে বলে উঠল, ''হ্যাঁ বাবা! বড্ড জলের ছিটা লাগছে।'' শুনে মুখে-মারির চক্ষুস্থির! সে তখনই ছেলেকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, ''শিগ্‌গির বল, সত্যি করে, লোকটাকে তুই কিছু বলেছিস কিনা?'' ছেলে বলল, ''ওকে তো আমি কিছু বলিনি। আমি মাকে চেঁচিয়ে বললাম, দুষ্টু লোকটা বাবার খড়্‌কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।'' মুখে-মারি এক গাল হেসে তার পিঠ থাব্‌ড়ে বলল, ''সাবাস্ ছেলে! বাপ্‌কা বেটা!''

বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়

বিষ্ণুবাহন খাসা ছেলে। তাহার নামটি যেমন জমকালো, তার কথাবার্তা চাল-চলনও তেমনি। বড় বড় গম্ভীর কথা তাহার মুখে যেমন শোনাইত, এমন আর কাহারও মুখে শুনি নাই। সে যখন টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া 'দুঃশাসনের রক্তপান' অভিনয় করিত, তখন আমরা সবাই উৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিতাম. কেবল দু-একজন হিংসুটে ছেলে নাক সিঁট্‌কাইয়া বলিত, ''ওরকম ঢের ঢের দেখা আছে।'' ভূতো এই হিংসুটে দলের সর্দার. সে বিষ্ণুবাহনকে ডাকিত 'খগা'। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, ''বিষ্ণুবাহন মানে গরুড়, আর গরুড় হচ্ছেন খগরাজ—খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল—তাই বিষ্ণুবাহন হলেন খগা।'' বিষ্ণুবাহন বলিল, ''ওরা আমার নামটাকে পর্যন্ত হিংসে করে।''

বিষ্ণুবাহনের কে এক মামা 'চন্দ্রদ্বীপের দিগ্বিজয়' ব'লে একখানা নতুন নাটক লিখিয়াছেন। বিষ্ণুবাহন একদিন সেটা আমাদের পড়িয়া শোনাইল। শুনিয়া আমরা সকলেই বলিলাম, ''চমৎকার!'' বিশেষত, যে জায়গায় চন্দ্রদ্বীপ ''আয় আয় কাপুরুষ আয় শত্রু আয় রে'' বলিয়া নিষাদরাজার সিংহদরজায় তলোয়ার মারিতেছেন, সেই জায়গাটা পড়িতে পড়িতে বিষ্ণুবাহন যখন হঠাৎ ''আয় শত্রু আয়'' বলিয়া ভূতোর ঘাড়ে ছাতার বাড়ি মারিল, তখন আমাদের এমন উৎসাহ হইয়াছিল যে আর একটু হইলেই একটা মারামারি বাধিয়া যাইত। আমরা তখনই ঠিক করিলাম যে ওটা 'অ্যাক্‌টিং' করিতে হইবে।

ছুটির দিনে আমাদের অভিনয় হইবে, তাহার জন্য ভিতরে ভিতরে সব আয়োজন চলিতে লাগিল। রোজ টিফিনের সময় আর ছুটির পরে আমাদের তর্জন-গর্জনে পাড়াশুদ্ধ লোক বুঝিতে পারিত যে, একটা কিছু কান্ড হইতেছে। বিষ্ণুবাহন চন্দ্রদ্বীপ সাজিবে, সেই আমাদের কথাবার্তা শিখাইত আর অঙ্গভঙ্গী লম্ফ ঝম্ফ সব নিজে করিয়া দেখাইত। ভূতোর দল প্রথমটা খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল, কিন্তু যেদিন বিষ্ণুবাহন কোথা হইতে এক রাশ নকল গোঁফ-দাড়ি, কতকগুলা তীর ধনুক, আর রুপালি কাগজে মোড়া কাঠের তলোয়ার আনিয়া হাজির করিল, সেইদিন তাহারা হঠাৎ কেমন মুষ্‌ড়াইয়া গেল। ভূতোর কথাবার্তা ও ব্যবহার বদলাইয়া আশ্চর্যরকম নরম হইয়া আসিল এবং বিষ্ণুবাহনের সঙ্গে ভাব পাতাইবার জন্য সে হঠাৎ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়া রহিলাম। তার পরদিনই টিফিনের সময় সে একটি ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, 'দূত হোক, পেয়াদা হোক, তাহাকে যাহা কিছু সাজিতে দেওয়া যাইবে, সে তাহাই সাজিতে রাজী আছে।' শেষ দৃশ্যে রণস্থলে মৃতদেহ দেখিয়া নিষাদরাজের কাঁদিবার কথা—আমরা কেহ কেহ বলিলাম, ''আচ্ছা, ওকে মৃতদেহ সাজতে দাও।'' বিষ্ণুবাহন কিন্তু রাজী হইল না। সে ছেলেটাকে বলিল, ''জিজ্ঞাসা করে আয়, সে তামাক সাজতে পারে কিনা।'' শুনিয়া আমরা হো হো করিয়া খুব হাসিলাম, আর বলিলাম, ''এইবার ভূতোর মুখে জুতো।''

তারপর একদিন আমরা হরিদাসকে দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন লেখাইলাম। হরিদাস

ছবি আঁকিতে জানে, তার হাতের লেখাও খুব ভাল; সে বড় বড় অক্ষরে একটা সাইন-বোর্ড লিখিয়া দিল—

"চন্দ্রদ্বীপের দিগ্বিজয়"

১৪ই আশ্বিন, সন্ধ্যা ৬৷৷ ঘটিকা

আমরা মহা উৎসাহ করিয়া সেইটা স্কুলের বড় বারান্দায় টাঙ্গাইয়া দিলাম। কিন্তু পরের দিন আসিয়া দেখি কে যেন 'চন্দ্রদ্বীপ' কথাটাকে কাটিয়া মোটা মোটা অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—"বিষ্ণুবাহন"—বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়! ইহার উপর ভূতো আবার গায়ে পড়িয়া বিষ্ণুবাহনকে শুনাইয়া গেল "কিরে খগা, খুব দিগ্বিজয় করছিস যে!"

এমনি করিয়া শেষে ছুটির দিন আসিয়া পড়িল। সেদিন আমাদের উৎসাহ যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, আমরা পর্দা ঘেরিয়া তক্তা ফেলিয়া মস্ত স্টেজ বাঁধিয়া ফেলিলাম। অভিনয় দেখিবার জন্য দুনিয়াশুদ্ধ লোককে খবর দেওয়া হইয়াছে, ছয়টা না বাজিতেই লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা সকলে তাড়াহুড়া করিয়া পোশাক পরিতেছি, বিষ্ণুবাহন ছুটাছুটি করিয়া ধমক-ধামক দিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া উপদেশ দিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত যখন ঠিকঠাক হইল, তারপর ঘণ্টা দিতেই স্টেজের পর্দা সর্‌সর্ করিয়া উঠিয়া গেল, আর চারিদিকে খুব হাততালি পড়িতে লাগিল।

প্রথম দৃশ্যেই আছে, চন্দ্রদ্বীপ তাহার ভাই বজ্রদ্বীপের খোঁজে আসিয়া নিষাদ-রাজার দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং খুব আড়ম্বর করিয়া নিষাদরাজাকে "আয় শত্রু আয়" বলিয়া যুদ্ধে ডাকিতেছেন। যখন তলোয়ার দিয়া দরজায় মারা হইবে তখন নিষাদের দল হুংকার দিয়া বাহির হইবে, আর, একটা ভয়ানক যুদ্ধ বাধিবে। দুঃখের বিষয়, বিষ্ণুবাহনের বক্তৃতাটা আরম্ভ না হইতেই সে অতিরিক্ত উৎসাহে ভুলিয়া খটাং করিয়া দরজায় হঠাৎ এক ঘা মারিয়া বসিল। আর কোথা যায়! অমনি নিষাদের দল "মার মার" করিয়া আমাদের এমন ভীষণ আক্রমণ করিল যে, নাটকে যদিও আমাদের জিতিবার কথা, তবু আমরা বক্তৃতা-টক্তৃতা ভুলিয়া যে যার মত পিট্‌টান দিলাম। বাহিরে আসিয়া বিষ্ণুবাহন রাগে গজ্‌রাইতে লাগিল। আমরা বলিলাম, "আসল নাটকে কি আছে কেউ ত তা জানে না—না হয়, চন্দ্রদ্বীপ হেরেই গেল।" কিন্তু বিষ্ণুবাহন কি সে কথা শোনে? সে লাফাইয়া ধমকাইয়া হাত পা নাড়িয়া শেষটায় নাটকের বইয়ের উপর এক কালির বোতল উল্টাইয়া ফেলিল, এবং তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া কালি মুছিতে লাগিল। ততক্ষণে এদিকে দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘণ্টা পড়িয়াছে।

বিষ্ণুবাহন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আবার আসরে নামিতে গিয়াই পা হড়্‌কাইয়া প্রকাণ্ড এক আছাড় খাইল। দেখিয়া লোকেরা কেহ হাসিল, কেহ 'আহা আহা' করিল, আর সব গোলমালের উপর সকলের চাইতে পরিষ্কার শোনা গেল ভূতোর চড়া গলার চীৎকার—"বাহবা বিষ্ণুবাহন।" বিষ্ণুবাহন বেচারা এমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল যে সেখানে যাহা বলিবার তাহা বেমালুম ভুলিয়া "সেনাপতি! এই কি সে রত্নগিরিপুর" বলিয়া একেবারে চতুর্থ দৃশ্যের কথা আরম্ভ করিল। আমি কানে কানে বলিলাম, "ওটা নয়," তাহাতে সে আরো ঘাবড়াইয়া গেল। তাহার মুখে দরদর করিয়া ঘাম দেখা দিল, সে কয়েকবার ঢোক গিলিয়া, তারপর রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে লাগিল। রুমালটি আগে হইতেই কালিমাখা হইয়াছিল, সুতরাং তাহার মুখখানার চেহারা এমন অপরূপ হইল যে আমাদেরই হাসি চাপিয়া রাখা মুস্কিল হইল। ইহার উপর সে যখন ঐ চেহারা লইয়া, ভাঙা ভাঙা গলায় "কোথায় পালাবে তারা শৃগালের প্রায়" বলিয়া

বিকট আস্ফালন করিতে লাগিল, তখন ঘরশুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াগড়ি দিবার জোগাড় করিল। বিষ্ণুবাহন বেচারা কিছুই জানে না, সে ভাবিল, শ্রোতাদের কোথাও একটা কিছু ঘটিয়াছে, তাই সকলে হাসিতেছে। সুতরাং সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আরও উৎসাহে হাত-পা ছুঁড়িয়া ভীষণ রকম তর্জন-গর্জন করিয়া স্টেজের উপর ঘুরিতে লাগিল। ইহাতেও হাসি ক্রমাগতই বাড়িতেছে দেখিয়া তাহার মনে কি যেন সন্দেহ হইল, সে হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া দেখে আমরাও প্রাণপণে হাসিতেছি—এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসিতেছি! তখন রাগে একেবারে দিগ্বিদিক ভুলিয়া সে তাহার 'তলোয়ার' দিয়া বিশুর পিঠে সপাং করিয়া এক বাড়ি মারিল। বিশু চন্দ্রদ্বীপের মন্ত্রী, তাহার মার খাইবার কথাই নয়, সুতরাং সে ছাড়িবে কেন? সে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া বিষ্ণুবাহনের গালে দুই চড় বসাইয়া দিল। তখন সেই স্টেজের উপরেই সকলের সামনে দুজনের মধ্যে একটা ভয়ানক হুড়োহুড়ি কিলাকিলি বাধিয়া গেল। প্রথমে, প্রায় সকলেই ভাবিয়াছিল ওটা অভিনয়ের লড়াই; সুতরাং অনেকে খুব হাততালি দিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল। কিন্তু বিষ্ণুবাহন যখন দস্তুরমত মার খাইয়া ''দেখুন দেখি সার্, মিছামিছি মারছে কেন'' বলিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে নালিশ জানাইতে লাগিল, তখন ব্যাপারখানা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

ইহার পর, সে দিন যে আর অভিনয় হইতেই পারে নাই, একথা বুঝাইয়া বলিবার আর দরকার নাই। ছুটি হইবার তিনদিন পরেই বিষ্ণুবাহন তাহার মামার বাড়ি চলিয়া গেল। ঐ তিনদিন সে বাড়ি হইতে বাহির হয় নাই, কারণ তাহাকে দেখিলেই ছেলেরা চেঁচায় ''বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়!'' স্কুলের গায়ে রাস্তার ধারে প্ল্যাকার্ড মারা ''বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়''—এমনকি বিষ্ণুবাহনের বাড়ির দরজায় খড়ি দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা— '**বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়**''।

বাজে গল্প ১

দুই বন্ধু ছিল। একজন অন্ধ আর একজন কালা। দুইজনে বেজায় ভাব। কালা বিজ্ঞাপনে পড়িল, আর অন্ধ লোকমুখে শুনিল, কোথায় যেন যাত্রা হইবে, সেখানে সঙেরা নাচগান করিবে। কালা বলিল, ''অন্ধ ভাই, চল, যাত্রায় গিয়া দেখি।'' অন্ধ হাত নাড়িয়া গলা খেলাইয়া কালাকে বুঝাইয়া দিল, ''কালা-ভাই, চল, যাত্রায় নাচ গান শুনিয়া আসি।''

দুইজনে যাত্রার আসরে গিয়া বসিল। রাত দুপুর পর্যন্ত নাচ গান চলিল, তারপর অন্ধ বলিল, ''বন্ধু, গান শুনিলে কেমন?'' কালা বলিল, ''আজকে ত নাচ দেখিলাম—গানটা বোধহয় কাল হইবে।'' অন্ধ ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিল, ''মূর্খ তুমি! আজ হইল গান—নৃত্যটাই বোধহয় কাল হইবে।''

কালা চলিয়া গেল। সে বলিল "চোখে দেখ না, তুমি নাচের মর্ম জানিবে কি?" অন্ধ তাহার কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বলিল, ''কানে শোন না, গানের তুমি কাঁচকলা বুঝিবে কি?'' কালা চিৎকার করিয়া বলিল, ''আজকে নাচ, কালকে গান,'' অন্ধ গলা ঝাঁকড়াইয়া আর ঠ্যাং নাচাইয়া বলিল, ''আজকে গান, কালকে নাচ।''

সেই হইতে দুজনের ছাড়াছাড়ি। কালা বলে, "অন্ধটা এমন জুয়াচোর—সে দিনকে রাত করিতে পারে।" অন্ধ বলে, "কালাটা যদি নিজের কথা শুনিতে পাইত, তবে বুঝিত সে কত বড় মিথ্যাবাদী।"

বাজে গল্প ২



কলকেতার সাহেব বাড়ি থেকে গোষ্ঠবাবুর ছবি এসেছে। বাড়িতে তাই হুলুস্থুল। চাকর বামুন ধোপা নাপিত দারোগা পেয়াদা সবাই বলে, "দৌড়ে চল, দৌড়ে চল।"

যে আসে সেই বলে, "কি চমৎকার ছবি! সাহেবের আঁকা।" বুড়ো যে সরকার মশাই তিনি বললেন, "সব চাইতে সুন্দর হয়েছে বাবুর মুখের হাসিটুকু—ঠিক তাঁরই মতন ঠাণ্ডা হাসি!" শুনে অবাক হয়ে সবাই বললে "যা হোক! সাহেব হাসিটুকু ধরেছে খাসা।"

বাবুর যে বিষ্টুখুড়ো তিনি বললেন, "চোখ দুটো যা এঁকেছে, ওরই দাম হাজার টাকা—চোখ দেখলে, গোষ্ঠর ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে।" শুনে একুশজন একবাক্যে হাঁ হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল।

রেধো ধোপা তার কাপড়ের পোঁটলা নামিয়ে বললে, "তোফা ছবি। কাপড়খানার ইস্ত্রি যেন রেধো ধোপার নিজের হাতে করা।" নাপিত তার ক্ষুরের থলি দুলিয়ে

বললে, "আমি উনিশ বছর বাবুর চুল ছাঁট্‌ছি—আমি ঐ চুলের কেতা দেখেই বুঝ্‌তে পারি, একখান ছবির মতন ছবি। আমি যখনই চুল ছাঁটি, বাবু আয়না দেখে ঐ রকম খুশী হন।"

বাবুর আহ্লাদী চাকর কেনারাম বললে, "বল্‌ব কি ভাই, এমন জলজ্যান্ত ছবি—আমি ত ঘরে ঢুকেই এক পেনাম ঠুকে চেয়ে দেখি, বাবু ত নয়—ছবি!" সবাই বললে, "তা ভুল হবারই কথা—আশ্চর্য ছবি যা হোক।"

তারপর সবাই মিলে ছবির নাক মুখ গোঁফ দাড়ি সমস্ত জিনিষের খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনা ক'রে প্রমাণ করলেন যে সব বিষয়েই বাবুর সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিলে যাচ্ছে—সাহেবের বাহাদুরী বটে! এমন সময় বাবু এসে ছবির পাশে দাঁড়ালেন।

বাবু বললেন, "একটা বড় ভুল হ'য়ে গেছে। কলকেতা থেকে ওরা লিখ্‌ছে যে ভুলে আমার ছবি পাঠাতে কার যেন ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। ওটা ফেরৎ দিতে হবে।"

শুনে সরকার মশাই মাথা নেড়ে বললেন, "দেখেছ! ওরা ভেবেছে আমায় ঠকাবে! আমি দেখেই ভাবছি অমন ভিরকুটি দেওয়া প্যাখ্‌না হাসি—এ আবার কার ছবি!" খুড়ো বললেন, "দেখ না! চোখ দুটো যেন উলটে আসছে—যেন গঙ্গাযাত্রার জ্যান্ত মড়া!" রেধো ধোপা সেও বলল, "একটা কাপড় পরেছে যেন চাষার মত। ওর সাতজন্মে কেউ যেন পোষাক পরতে শেখেনি।" নাপিত ভায়া মুচকি হেসে মুখ বাঁকিয়ে বলল, "চুল কেটেছে দেখ না—যেন মাথার উপর কাস্তে চালিয়েছে।" কেনারাম ভীষণ ক্ষেপে চেঁচিয়ে বললে, "আমি সকাল বেলায় ঘরে ঢুকেই চোর ভেবে চমকে উঠেছি। আরেকটু হ'লেই মেরেছিলাম আর কি! আবার এরা বলছিল, ওটা নাকি বাবুর ছবি। আমার সামনে ও কথা বললে মুখ থুড়ে দিতুম না।"

তখন সবাই মিলে এক বাক্যে বললে যে, সবাই টের পেয়েছিল, এটা বাবুর ছবি নয়। বাবুর নাক কি অমন চ্যাটাল? বাবুর কি হাঁসের পায়ের মত কান? ও কি বসেছে, না ভালুক নাচছে?

বাজে গল্প ৩

কতগুলো ছেলে ছাতের উপর হুড়োহুড়ি করে খেলা করছে—এমন সময়ে একটা মারামারির শব্দ শোনা গেল। তারপরেই হঠাৎ গোলমাল থেমে গিয়ে সবাই মিলে "হারু পড়ে গেছে" বলে কাঁদতে কাঁদতে নীচে চলল।

খানিক বাদেই শুনি একতলা থেকে কান্নাকাটির শব্দ উঠছে। বাইরের ঘরে যদুর বাবা গণেশবাবু ছিলেন—তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?" শুনতে পেলেন ছেলেরা কাঁদছে "হারু পড়ে গিয়েছে।" বাবু তখন দৌড়ে গেলেন ডাক্তার ডাকতে।

পাঁচ মিনিটে ডাক্তার এসে হাজির—কিন্তু হারু কোথায়? বাবু বললেন, "এদিকে ত পড়েনি. ভেতর বাড়িতে পড়েছে বোধহয়।" কিন্তু ভেতর বাড়িতে মেয়েরা বললেন, "এখানে ত পড়েনি—আমরা ত ভাবছি বার-বাড়িতে পড়েছে বুঝি।" বাইরেও নেই, ভেতরেও নেই, তবে কি ছেলে উড়ে গেল? তখন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল "কোথায় রে? কোথায় হারু?" তারা বললে, "ছাতের উপর।" সেখানে গিয়ে তারা দেখে হারুবাবু অভিমান করে বসে বসে কাঁদ্‌ছেন! হারু বড় আদুরে ছেলে, মারামারিতে সে প'ড়ে গেছে দেখেই আর সকলে মার খাবার ভয়ে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে।

"হারু পড়ে গেছে" বলে এত যে কান্না, তার অর্থ, সকলকে জানান হচ্ছে যে "হারুকে আমরা ফেলে দিইনি—সে পড়ে গেছে ব'লে আমাদের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।"

হারু তখন সকলের নামে বাবার কাছে নালিশ করবার জন্য মনে মনে অভিমান জমিয়ে তুলছিল—হঠাৎ তার বাবাকে লোকজন আর ডাক্তার শুদ্ধু এগিয়ে আসতে দেখে, ভয়ে তার আর নালিশ করাই হ'ল না। যা হোক, হারুকে আস্ত দেখে সবাই এমন খুশি হ'ল যে, শাসন-টাসনের কথা কারও মনেই এল না।

সবচেয়ে বেশি জোরে কেঁদেছিলেন হারুর ঠাকুরমা। তিনি আবার কানে শোনেন কিছু কম। তাঁকে সবাই জিজ্ঞেস করল, "আপনি এত কাঁদ্‌ছিলেন কেন?" তিনি বললেন, "আমি কি অত জানি? দেখ্‌লুম ঝিয়েরা কাঁদ্‌ছে, বৌমা কাঁদ্‌ছেন, তাই আমিও কাঁদ্‌তে লাগলুম—ভাবলুম একটা কিছু হয়ে থাক্‌বে।"

কুকুরের মালিক

ভজহরি আর রামচরণের মধ্যে ভারি ভাব। অন্তত, দুই সপ্তাহ আগেও তাহাদের মধ্যে খুবই বন্ধুতা দেখা যাইত।

সেদিন বাঁশপুকুরের মেলায় গিয়া তাহারা দুইজন মিলিয়া একটা কুকুরছানা কিনিয়াছে। চমৎকার বিলাতি কুকুর—তার আড়াই টাকা দাম। ভজুর পাঁচসিকা আর রামার পাঁচসিকা—দুইজনের পয়সা মিলাইয়া কুকুর কেনা হইল। সুতরাং দুইজনেই কুকুরের মালিক।

কুকুরটাকে বাড়িতে আনিয়াই ভজু বলিল, "অর্ধেকটা কুকুর আমার, অর্ধেকটা তোর।" রামা বলিল, "বেশ কথা! মাথার দিকটা আমার, ল্যাজের দিকটা তোর।" ভজু একটু ভাবিয়া দেখিল, মন্দ কি! মাথার দিকটা যার সেই তো কুকুরকে খাওয়াইবে, যত হাঙ্গাম সব তার। তাছাড়া কুকুর যদি কাউকে কামড়ায়, তবে মাথার দিকের মালিকই দায়ী, ল্যাজের মালিকের কোন দোষ দেওয়া চলিবে না। সুতরাং সে বলিল, "আচ্ছা, ল্যাজের দিকটাই নিলাম।"

দুইজনে দুপুর বেলায় বসিয়া কুকুরটার পিঠে হাত বুলাইয়া তোয়াজ করিত। রামা বলিত, "দেখিস, আমার দিকে হাত বোলাসনে।" ভজু বলিত, "খবরদার, এদিকে হাত আনিসনে।" দুইজনে খুব সাবধানে নিজের নিজের ভাগ বাঁচাইয়া চলিত। যখন ভজুর দিকের পা তুলিয়া কুকুরটা রামার দিকে কান চুলকাইত, তখন ভজু খুব উৎসাহ করিয়া বলিত, "খুব দে—আচ্ছা করে খাম্‌চিয়ে দে।" আবার ভজুর দিকে মাছি বসিলে রামার দিকের মুখটা যখন সেখানে কামড়াইতে যাইত, তখন রামা আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিত, "দে কামড়িয়ে! একেবারে দাঁত বসিয়ে দে।"

একদিন একটা মস্ত লাল পিঁপড়ে কুকুরের পিঠে কামড়াইয়া ধরিল। কুকুরটা গা ঝাড়া দিল, পিঠে জিভ লাগাইবার চেষ্টা করিল, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া পিঠটাকে দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর কিছুতেই কৃতকার্য না হইয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন দুইজনে বিষম তর্ক উঠিল, কার ভাগে কামড় পড়িয়াছে। এ বলে, "তোর দিকে পিঁপড়ে লেগেছে—তুই ফেলবি," ও বলে, "আমার বয়ে গেছে পিঁপড়ে ফেলতে—তোর দিকে কাঁদছে, সে তুই বুঝবি।" সেদিন দুইজনে প্রায় কথা-বার্তা বন্ধ হইবার জোগাড়।

তারপর একদিন কুকুরের কী খেয়াল চাপিল; সে তাহার নিজের ল্যাজটা লইয়া খেলা আরম্ভ করিল। নেহাৎ 'কুকুরে' খেলা—তার না আছে অর্থ, না আছে কিছু। সে ধনুকের মত একপাশে বাঁকা হইয়া ল্যাজটার দিকে তাকাইয়া দেখে আর একটু একটু ল্যাজ নাড়ে। সেটা যে তার নিজের ল্যাজ, সে খেয়াল বোধহয় তার থাকে না—তাই হঠাৎ অতর্কিতে ল্যাজ ধরিবার জন্য সে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটাও নড়িয়া যায়, কাজেই ল্যাজটা আর ধরা হয় না। ভজু আর রামা এই ব্যাপার দেখিয়া উৎসাহে চিৎকার করিতে লাগিল। রামার মহা স্ফূর্তি যে ভজুর ল্যাজকে তাড়া করা হইতেছে, আর ভজুর ভারি উৎসাহ যে তার ল্যাজ রামার মুখকে ফাঁকি দিয়া নাকাল করিতেছে।

দুইজনের চিৎকারের জন্যই হোক কী নিজের ঢ্যাঁটামির জন্যই হোক কুকুরটার জেদ চড়িয়া গেল। সমস্তদিন সে থাকিয়া থাকিয়া চর্কীবাজির মত নিজের ল্যাজকে তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল। এইরকমে খামখা পাক দিতে দিতে কুকুরটা যখন হয়রান হইয়া হাঁপাইতে লাগিল, তখন রামা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ভজু বলিল, "আমার দিকটাই জিতিয়াছে।"

কিন্তু কুকুরটা এমন বেহায়া, পাঁচমিনিট যাইতে না যাইতেই সে আবার ল্যাজ তাড়ান শুরু করিল। তখন রামা রাগিয়া বলিল, "এইয়ো! তোমার ল্যাজ সামলাও। দেখছ না কুকুরটা হাঁপিয়ে পড়ছে?" ভজু বলিল, "সামলাতে হয় তোমার দিক সামলাও—ল্যাজের দিকে তো আর হাঁপাচ্ছে না!" রামা ততক্ষণে রীতিমত চটিয়াছে। সে কুকুরের পিছন পিছন গিয়া ধাঁই করিয়া এক লাথি লাগাইয়া দিল। ভজু বলিল, "তবে রে! আমার দিকে লাথি মারলি কেন রে?" এই বলিয়াই সে কুকুরের মাথায় ঘাড়ে কানে চটাপট কয়েকটা চাঁটি লাগাইয়া দিল। দুই দিক হইতেই রেষারেষির চোটে কুকুরটা ছুটিয়া পালাইল। তখন দুইজনে বেশ একচোট হাতাহাতি হইয়া গেল।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই রামা দেখে, কুকুরটা আবার ল্যাজ তাড়া করিতেছে। তখন সে কোথা হইতে একখানা দা' আনিয়া এক কোপে ক্যাঁচ্ করিয়া ল্যাজের খানিকটা এমন পরিপাটি উড়াইয়া দিল যে কুকুরটার আর্তনাদে ভজু ঘুমের মধ্যে লাফ দিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়াই দেখিল কুকুরের ল্যাজ কাটা, রামার হাতে দা'। ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

তখন সে রামাকে মারিতে মারিতে মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর কুকুর লেলাইয়া দিল। কুকুরটা ল্যাজ কাটার দরুণ রামার উপর একটুও খুশী হয় নাই—সে নিমকহারাম হইয়া 'রামার দিক' দিয়াই রামার ঠ্যাঙে কামড়াইয়া দিল।

এখন দুইজনেই চায় থানায় নালিশ করিতে। রামা বলে ল্যাজটা ভারি বেয়াড়া, বারবার মুখের সঙ্গে ঝগড়া লাগাইতে চায়—তাই সে ল্যাজ কাটিয়াছে। ল্যাজ না কাটিলে কুকুর পাগল হইয়া যাইত, না হয় সর্দিগর্মি হইয়া মরিত। মারা গেলে ত' সমস্ত কুকুরই মারা যাইত, সুতরাং ল্যাজ কাটার দরুণ গোটা কুকুরটারই উপকার হইয়াছে। মুখও বাঁচিয়াছে, ল্যাজও বাঁচিয়াছে; তাতে রামারও ভাল, ভজুরও ভাল। কিন্তু ভজুর এতবড় আস্পর্ধা যে সে রামার দিকের কুকুরকে রামার উপরে লেলাইয়া দিল। মুখের দিকে ভজুর কোন দাবিদাওয়া নাই, সে দিকটা সম্পূর্ণভাবেই রামার—সুতরাং রামার অনুমতি ছাড়া ভজু কোন্ সাহসে এবং কোন্ শাস্ত্র বা আইন মতে তাহা লইয়া পরের ধনে পোদ্দারি করিতে যায়? ইহাতে অনধিকারচর্চা চুরি তছরূপ—সব রকম নালিশ চলে।

ভজহু কিন্তু বলে অন্যরকম। সে বলে রামার দিকের কুকুর রামাকে কামড়াইয়াছে, তাতে ভজহুর কি দোষ? ভজহু কেবল 'লে লে লে' বলিয়াছিল; তাহাতে কুকুর যদি রামাকে কামড়ায়, তবে সেটা তার শিক্ষার দোষ—রামা তাহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দেয় নাই কেন? তাছাড়া ভজহুর ল্যাজ খেলা করিতে চায়, রামার হিংসুটে মুখটা তাহাতে আপত্তি করে কেন? ভজহুর ল্যাজকে কামড়াইতে যাইবার তাহার কি অধিকার আছে? আর, রামা তার কুকুরের চোখ বাঁধিয়া কিংবা মুখোস আঁটিয়া দিলেই পারিত—সে ল্যাজ কাটিতে গেল কাহার হুকুমে? একবার নালিশটি করিলে রামচরণ "বাপ বাপ" বলিয়া ছয়টি মাস জেল খাটিয়া আসিবেন—তা নইলে ভজহুর নাম ভজহরিই নয়।

এখন এ তর্কের আর মীমাংসাই হয় না। আমাদের হরিশখুড়ো বলিয়াছিলেন, "এক কাজ কর্, কুকুরটার নাকের ডগা থেকে ল্যাজের আগা পর্যন্ত দাঁড়ি টেনে তার ডান দিকটা তুই নে, বাঁ দিকটা ওকে দে—তা হ'লেই ঠিকমত ভাগ হবে।" কিন্তু তাহারা ওরকম "ছিল্‌কা কুকুরের" মালিক হইতে রাজী নয়। কেউ কেউ বলিল, "তা কেন? ভাগাভাগির দরকার কি? গোটা কুকুরটাই রামার, আবার গোটা কুকুরটাই ভজহুর।" কিন্তু এ কথায়ও তাহাদের খুব আপত্তি। একটা বই কুকুর নাই, তার গোটা কুকুরটাই যদি রামার হয় তবে ভজহুর আবার কুকুর আসে কোথা হইতে? আর রামার গোটা কুকুরটাই যদি ভজহুর হয়, তবে রামার আর থাকিল কি? কুকুর থেকে কুকুর বাদ, বাকি রইল শূন্যি!

এখন তোমরা যদি ইহার মীমাংসা করিয়া দাও।

টাকার আপদ

বুড়ো মুচী রাতদিনই কাজ করছে আর গুণ্ গুণ্ গান করছে। তার মেজাজ বড় খুশি, স্বাস্থ্যও খুব ভাল। খেটে খায়; স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়।

তার বাড়ির ধারে এক ধনী বেনে থাকে। বিস্তর টাকা তার; মস্ত বাড়ি, অনেক চাকর-বাকর। মনে কিন্তু তার সুখ নাই, স্বাস্থ্যও তার ভাল নয়। মুচীর বাড়ির সামনে দিয়ে সে রোজ যাতায়াত করে আর ভাবে, 'এ লোকটা এত গরীব হয়েও রাতদিনই আনন্দে গান করছে, আর আমার এত টাকাকড়ি, আমার একটুও আনন্দ হয় না মনে,—গাওয়া তো দূরের কথা। ইচ্ছা হলে তো টাকা দিয়ে রাজ্যের বড় বড় ওস্তাদ আনিয়ে বাড়িতে গাওয়াতে পারি—নিজেও গাইতে পারি,—কিন্তু সে ইচ্ছা হয় কই?' শেষটায় একদিন সে মনে মনে ঠিক করল যে এবার যখন মুচীর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবে তখন তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলবে।

পরদিন সকালেই সে গিয়ে মুচীকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হে মুচী ভায়া, বড় যে ফুর্তিতে গান কর, বছরে কত রোজগার কর তুমি?"

মুচী বলল, "সত্যি বলছি মশাই, সেটা আমি কখনও হিসাব করি নি। আমার কাজেরও কোনদিন অভাব হয় নি, খাওয়া পরাও বেশ চলে যাচ্ছে। কাজেই, টাকার কোন হিসাব রাখবারও দরকার হয় নি কোনদিন।"

বেনে বলল, "আচ্ছা, প্রতিদিন কত কাজ করতে পার তুমি?"

মুচী বলল, "তারও কিছু ঠিক নেই। কখনও বেশি করি, কখনও কম করি।"

মুচীর সাদাসিধে কথাবার্তায় বেনে বড় খুশি হল, তারপর, একটা টাকার থলে নিয়ে সে মুচীকে বলল, "এই নাও হে;—তোমাকে এই একশো টাকা দিলাম। এটা রেখে দাও, বিপদ-আপদ অসুখ-বিসুখের সময় কাজে লাগবে।"

মুচীর তো ভারি আনন্দ; সে সেই টাকার থলেটা নিয়ে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখে দিল। তার জীবনে সে কখনও একসঙ্গে এতগুলি টাকা চোখে দেখে নি।

কিন্তু, আস্তে আস্তে তার ভাবনা আরম্ভ হল। দিনের বেলা বেশ ছিল; রাত্তির হতেই তার মনে হতে লাগল, "ঐ বুঝি চোর আসছে!" বেড়ালে ম্যাও করতেই সে মনে করল, "ঐ রে! আমার টাকা নিতে এসেছে!" শেষটায় আর তার সহ্য হল না। টাকার থলিটা নিয়ে সে ছুটে বেনের বাড়ি গিয়ে বলল, "এই রইল তোমার টাকা! এর চেয়ে আমার গান আর ঘুম ঢের ভাল!"

রাজার অসুখ

এক ছিল রাজা। রাজার ভারি অসুখ। ডাক্তার বদ্যি হাকিম কবিরাজ সব দলে দলে আসে আর দলে দলে ফিরে যায়। অসুখটা যে কী তা কেউ বলতে পারে না, অসুখ সারাতেও পারে না।

সারাবে কী করে? অসুখ তো আর সত্যিকারের নয়। রাজা মশাই কেবলই বলেন 'ভারি অসুখ', কিন্তু কোথায় যে অসুখ তা আর কেউ খুঁজে পায় না! কত রকমের কত ওষুধ রাজা মশাই খেয়ে দেখলেন, কিছুতেই কিছু হল না। মাথায় বরফ দেওয়া হল, পেটে সেঁক দেওয়া হ'ল, পায়ে জোঁক লাগান হ'ল, হাতে মাদুলি বাধা হ'ল, কিন্তু অসুখের কোন কিনারাই হ'ল না।

তখন রাজামশাই গেলেন ক্ষেপে। তিনি বললেন, দূর করে দাও এই অপদার্থগুলোকে, আর ওদের পুঁথিপত্র যা আছে সব কিছু কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দাও।" এমনি করে চিকিৎসকেরা বিদায় হলেন। ভয়ে আর কেউ রাজার বাড়ির দিকেও যায় না। তখন সকলের ভাবনা হ'ল, তাই তো, শেষটায় কী রাজা মশাই বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন?

এমন সময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে বলল, "অসুখ সারাবার উপায় আমি জানি, কিন্তু সে ভারি শক্ত। তোমরা কী সে সব করতে পারবে?" মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সবাই বলল—"কেন পারব না? খুব পারব। জান্ দিতে হয় জান্ দেব!" তখন সন্ন্যাসী বলল, "প্রথমে এমন একটি লোক খুঁজে আন যার মনে কোন ভাবনা নেই, যার মুখে হাসি লেগেই আছে, যে সব সময়ে, সব অবস্থাতেই খুশি থাকে।" সবাই বলল, "তারপর?" সন্ন্যাসী বলল, "তারপর সেই লোকের গায়ের জামা যদি রাজা মশাই একটা দিন পরে থাকেন, আর সেই লোকের তোষকে যদি এক রাত্রি ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলেই সব অসুখ সেরে উঠবে।" সবাই শুনে বলল, "এ তো চমৎকার কথা!"

তাড়াতাড়ি রাজা মশাইয়ের কাছে খবর গেল। তিনি শুনে বললেন, "আরে, এই সহজ উপায়টা থাকতে এতদিন সবাই মিলে করছিল কী? এইটা কারো মাথায় আসেনি?

যাও, এখনি খোঁজ করে সেই হাসি-ওয়ালা লোকটার জামা আর তোষক নিয়ে এস।"

চারদিকে লোক ছুটল, রাজ্যময় 'খোঁজ-খোঁজ' রব পড়ে গেল, কিন্তু সে লোকের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। যে যায় সেই ফিরে আসে আর বলে, "যার দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, সর্বদাই হাসিমুখ, সর্বদাই খুশি মেজাজ, কই, তেমন লোকের তো দেখা পাওয়া গেল না!" সবার মুখে এই একই কথা। তখন মন্ত্রীমশাই রেগে বললেন, "এদের দিয়ে কী কোন কাজ হয়? এ মূর্খেরা খুঁজতেই জানে না।" এই বলে তিনি নিজেই বেরোলেন সেই অজানা লোকের খোঁজ করতে।

বাজারের কাছে মস্ত এক দালানের সামনে তিনি দেখলেন, মেলা লোক জমে গিয়েছে আর এক বুড়ো শেঠজি হাসিমুখে তাদের চাল, ডাল, পয়সা আর কাপড় দান করছে। মন্ত্রী ভাবলেন বাঃ এই লোকটাকে তো বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছে, ওর তো অনেক টাকা পয়সাও আছে দেখছি। তাহলে আর ওর দুঃখই বা কিসের, ভাবনাই বা কিসের? ওরই একটা জামা আর তোষক চেয়ে নেওয়া যাক।

মন্ত্রীমশাই এই রকম ভাবছেন, ঠিক সেই সময়ে একটা ভিখারী করেছে কি, ভিক্ষা নিয়ে শেঠজিকে সেলাম না করেই চলে যাচ্ছে। আর শেঠজির রাগ দেখে কে! তিনি ভিখারীকে গাল দিয়ে, জুতো মেরে, তার ভিক্ষা কেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। ব্যাপার দেখে মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

তারপর নদীর ধারে এক জায়গায় তিনি দেখলেন, একটা লোক ভারি মজার ভঙ্গি করে নানারকম হাসির গান করছে আর তাই শুনে চারদিকের লোকেরা হো হো করে হাসছে। মানুষ যে এত রকম হাসির ভঙ্গি করতে পারে তা মন্ত্রীমশায়ের জানা ছিল না। তিনি লোকটার গান শুনে আর তামাসা দেখে একেবারে হেসে অস্থির হয়ে উঠলেন আর ভাবলেন, এমন আমুদে লোকটা থাকতে কিনা আমার লোকগুলো সব হতাশ হয়ে ফিরে যায়! তিনি পাশের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই লোকটা কে হে?" সে বলল, "ও হচ্ছে গোব্‌রা মাতাল। এখন দেখছেন কেমন খোস মেজাজে আছে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ওর মাতলামি, চেঁচামেচি আর উৎপাত শুরু হয়। ওর ভয়ে পাড়ার লোক তিষ্ঠোতে পারে না।" শুনে মন্ত্রীমশাই গম্ভীর হয়ে আবার চললেন সেই লোকটির সন্ধানে।

সারাদিন খুঁজে খুঁজে মন্ত্রীমশাই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরলেন, কিন্তু সে লোকের সন্ধান কোথাও মিলল না। এমনি করে দিনের পর দিন তিনি খোঁজ করেন আর দিনের পর দিন হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন। তাঁর উৎসাহ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক গাছতলায় তিনি একটা পাগলা গোছের বুড়ো লোকের দেখা পেলেন।

লোকটার মাথাভরা চুল, মুখভরা দাড়ি, সমস্ত শরীর যেন শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়েছে। সে একা একা বসে বসে আপন মনে কেবলই হাসছে, কেবলই হাসছে। মন্ত্রী বললেন, "তুমি এত হাসছ কেন?" সে বলল, "হাসব না? পৃথিবী বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে, গাছের পাতা সরে সরে যাচ্ছে, মাঠে মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, রোদ উঠছে, বৃষ্টি পড়ছে, পাখিরা গাছে এসে বসছে, আবার সব উড়ে যাচ্ছে। এসব চোখের সামনে দেখছি আর হাসি পাচ্ছে।"

মন্ত্রী বললেন, "তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু শুধু বসে বসে হাসলে তো আর মানুষের দিন চলে না। তোমার কী আর কোন কাজকর্ম নেই?"

ফকির বলল, "তা কেন থাকবে না? সকাল বেলায় নদীতে যাই, সেখানে স্নান-টান সেরে, লোকজনের যাওয়া-আসা কথাবার্তা এই সব তামাসা দেখে, আবার গাছতলায় এসে

বসি। তারপর, যেদিন খাওয়া জোটে খাই, যেদিন জোটে না খাই না। যখন বেড়াতে ইচ্ছা হয় বেড়াই, যখন ঘুম পায় তখন ঘুমাই। কোনও ভাবনা চিন্তা, হট্টগোল কিছুই নেই। ভারি মজা!"

মন্ত্রী খানিক মাথা চুলকিয়ে বললেন, ''যেদিন খাওয়া পাও না সেদিন কি কর?''

ফকির বলল, ''সেদিন তো কোন ল্যাঠাই নেই! চুপচাপ পড়ে থাকি আর এই সব তামাসা দেখি। বরং যেদিন খাওয়া হয়, সেদিনই হাঙ্গামা বেশি। ভাত মাখরে, গ্রাস তোলরে, মুখের মধ্যে ঢোকাওরে, চিবোওরে, গেলোরে,—তারপর জল খাওরে, আঁচাওরে, হাত মুখ মোছরে! কত রকম কান্ড!"

মন্ত্রী দেখলেন, এতদিনে ঠিক মতন লোক পাওয়া গিয়েছে। তিনি বললেন, "তোমার গায়ের এক-আধখানা জামা দিতে পার? তার জন্য তুমি যত ইচ্ছা দাম নাও, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।'' শুনে লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল, বলল, ''আমার আবার জামা। এই সেদিন একটা লোক একটা শাল দিয়েছিল, তাও তো ছাই ভিখারীকে দিয়ে ফেললাম। জামা-টামার ধারই ধারি না কোনদিন।''

মন্ত্রী বললেন, "তাহলে তো মহা মুশকিল! যদি বা একটা লোক পাওয়া গেল, তারও আবার জামা নেই। আচ্ছা, তোমার বিছানার তোষকখানা দিতে পার? কত দাম চাও বল, আমরা টাকা ঢেলে দিচ্ছি।"

এবারে ফকির হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার হাসি আর থামেই না। অনেকক্ষণ হেসে তারপর সে বলল, ''চল্লিশ বছর বিছানাই চোখে দেখলাম না, তা আবার তোষক আর গদি!"

মন্ত্রীমশাই বড় বড় চোখ করে বললেন, "জামাও গায়ে দাও না, লেপ-কম্বল-বিছানাও সঙ্গে রাখ না, তোমার কি অসুখও করে না ছাই?"

ফকির বলল, "অসুখ আবার কি? অসুখ-টসুখ ওসব আমি বিশ্বাস করি না। যারা কেবল অসুখ-অসুখ ভাবে, তাদেরই খালি অসুখ করে।'' এই বলে ফকির আবার গাছে হেলান দিয়ে ঠ্যাং মেলে খুব হাসতে লাগল।

মন্ত্রীমশাই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। রাজার কাছে খবর গেল। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, তার কাছে সব কথা শুনলেন, শুনে মন্ত্রীমশাইকে বিদায় দিলেন।

আবার সবাই ভাবতে বসল, এখন উপায় কী হবে? চিকিৎসাও হল না, অনেক কষ্টে যা একটা উপায় পাওয়া গেল, সেটাও গেল ফস্‌কে! সবাই বসে বসে এ ওর মুখ চায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর বলে—''নাঃ, আর তো বাঁচাবার উপায় দেখছি না।'' ওদিকে রাজামশাই ভাবতে বসেছেন, ''আমি থাকি রাজার হালে, ভাল ভাল জিনিস খাই, কোন কিছুর অভাব নেই, লোকেরা সব সময়ে তোয়াজ করছেই—আমার হল অসুখ! আর ঐ হতভাগা ফকির, যার চাল-চুলো কিচ্ছু নেই, জামা নেই, কম্বল নেই, গাছতলায় পড়ে থাকে, যা পায় তাই খায়—সে কিনা বলে অসুখ-টসুখ কিছু মানেই না! সে ফকির হয়ে অসুখ উড়িয়ে দিতে পারল, আর আমি রাজা হয়ে পারব না?"

তার পরদিনই রাজা ঘুম থেকে উঠে পাত্র মিত্র সবাইকে ডেকে বললেন, ''যা হতভাগা মুখ্যুগুলো সব, সভায় বসগে যা! তোরা কেউ কিছু করতে পারলি না, এখন এই দেখ আমার অসুখ আমি নিজেই সারিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে আবার সভায় গিয়ে বসব। আর যে টুঁ শব্দটি করবে তার মাথা উড়িয়ে দেব!''

দানের হিসাব

এক ছিল রাজা। রাজা জাঁকজমকে পোশাক পরিচ্ছদে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেন, কিন্তু দানের বেলায় তাঁর হাত খোলে না। রাজার সভায় হোমরা-চোমরা পাত্র-মিত্র সবাই আসে, কিন্তু গরিব-দুঃখী পণ্ডিত-সজ্জন এরা কেউ আসে না। কারণ সেখানে গুণীর আদর নাই, একটি পয়সা ভিক্ষা পাবার আশা নাই।

রাজার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ লাগল, পূর্ব সীমানার লোকেরা অনাহারে মরতে বসল। রাজার কাছে খবর এল, রাজা বললেন, "এ সমস্ত দৈবে ঘটায়, এর উপর আমার কোন হাত নেই।" লোকেরা বলল, "রাজভাণ্ডার থেকে সাহায্য করতে হুকুম হোক, আমরা দূর থেকে চাল কিনে এনে এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাই।" রাজা বললেন, "আজ তোমাদের দুর্ভিক্ষ, কাল শুনব আর এক জায়গায় ভূমিকম্প, পরশু শুনব অমুক লোকেরা ভারি গরিব, দুবেলা খেতে পায় না। সবাইকে সাহায্য করতে হলে রাজভাণ্ডার উজাড় করে রাজাকে ফতুর হতে হয়!" শুনে সবাই নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

ওদিকে দুর্ভিক্ষ বেড়েই চলেছে। দলে দলে লোক অনাহারে মরতে লেগেছে। আবার দূত এসে রাজার কাছে হাজির। সে রাজসভায় হত্যা দিয়ে পড়ে বলল, "দোহাই মহারাজ, আর বেশি কিছু চাই না, দশটি হাজার টাকা দিলে লোকগুলো আধপেটা খেয়ে বাঁচে।" রাজা বললেন, "অত কষ্ট করে বেঁচেই বা লাভ কি? আর দশটি হাজার টাকা বুঝি বড় সহজ মনে করেছ?" দূত বলল, "দেবতার কৃপায় কত কোটি টাকা রাজভাণ্ডারে মজুত রয়েছে, যেন টাকার সমুদ্র! তার থেকে এক-আধ ঘটি তুললেই বা মহারাজের ক্ষতি কি?" রাজা বললেন, "দেদার থাকলেই কি দেদার খরচ করতে হবে?" দূত বলল, "প্রতিদিন আতরে, সুগন্ধে, পোশাকে, আমোদে, আর প্রাসাদের সাজসজ্জায় যে টাকা বেরিয়ে যায়, তারই খানিকটা পেলে লোকগুলো প্রাণে বাঁচে।" শুনে রাজা রেগে বললেন, "ভিখারি হয়ে আবার উপদেশ শোনাতে এসেছ? মানে সরে পড়।" দূত বেগতিক দেখে সরে পড়ল।

রাজা হেসে বললেন, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দুশ' পাঁচশ' হত, তবু না হয় বুঝতাম; দারোয়ানগুলোর খোরাক থেকে দু চারদিন কিছু কেটে রাখলেই টাকাটা উঠে যেত। কিন্তু তাতে ত' ওদের পেট ভরবে না, একবারে দশ হাজার টাকা হেঁকে বসল! ছোটলোকের একশেষ!" শুনে পাত্রমিত্র সবাই মুখে 'হুঁ-হুঁ' করল, কিন্তু মনে মনে সবাই বলল—"ছি, ছি কাজটা অতি খারাপ হল!"

দিন দুই বাদে কোথা থেকে বুড়ো সন্ন্যাসী এসে রাজসভায় হাজির। সন্ন্যাসী এসেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "দাতাকর্ণ মহারাজ! ফকিরের ভিক্ষা পূর্ণ করতে হবে!" রাজা বললেন, "ভিক্ষার বহরটা আগে শুনি। কিছু কমসম করে বললে হয়ত বা পেতেও পারেন।" সন্ন্যাসী বললেন, "আমি ফকির মানুষ, আমার বেশি দিয়ে দরকার কি? আমি অতি যৎকিঞ্চিৎ সামান্য ভিক্ষা একটি মাস ধরে প্রতিদিন রাজভাণ্ডারে

পেতে চাই। আমার ভিক্ষা নেবার নিয়ম এই—প্রথম দিন যা নিই, দ্বিতীয় দিন নিই তার দ্বিগুণ, তৃতীয় দিনে তারও দ্বিগুণ আবার চতুর্থ দিনে তৃতীয় দিনের দ্বিগুণ। এমনি করে প্রতিদিন দ্বিগুণ করে নিই. এই আমার ভিক্ষার রীতি।'' রাজা বললেন, ''তা ত' বেশ বুঝলাম। কিন্তু প্রথম দিন কত চান সেইটাই হল আসল কথা। দু' চার টাকায় পেট ভরে ত' ভাল কথা, নইলে একেবারে বিশ পঞ্চাশ হেঁকে বসলে সে যে অনেক টাকার মামলায় গিয়ে পড়তে হয়!''

সন্ন্যাসী একগাল হেসে বললেন, "মহারাজ, ফকিরের কি লোভ থাকে? আমি বিশ পঞ্চাশও চাইনে, দু' চার টাকাও চাইনে। আজ আমায় একটি পয়সা দিন, তারপর ঊনত্রিশ দিন দ্বিগুণ করে দেবার হুকুম দিন।'' শুনে রাজা মন্ত্রী পাত্রমিত্র সবাই প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তখন চটপট হুকুম হয়ে গেল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের হিসাব মত রাজভাণ্ডার থেকে এক মাস তাঁকে ভিক্ষা দেওয়া হোক। সন্ন্যাসী ঠাকুর মহারাজের জয়-জয়কার করে বাড়ি ফিরলেন।

রাজার হুকুমমত রাজ-ভাণ্ডারী প্রতিদিন হিসাব করে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেয়। এমনি করে দুদিন যায়, দশদিন যায়। দু' সপ্তাহ ভিক্ষা দেবার পর ভাণ্ডারী হিসাব করে দেখল ভিক্ষাতে অনেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখে তার মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। রাজামশাই ত' কখনো এত টাকা দান করেন না! সে গিয়ে মন্ত্রীকে খবর দিল।

মন্ত্রী বললেন, ''তাইতো হে, এটা তো আগে খেয়াল হয় নি। তা এখন তো আর উপায় নাই, মহারাজের হুকুম নড়চড় হতে পারে না!"

তারপর আবার কয়েকদিন গেল। ভাণ্ডারী আবার মহাব্যস্ত হয়ে মন্ত্রীর কাছে হিসাব শোনাতে চলল। হিসাব শুনে মন্ত্রীমশায়ের মুখের তালু শুকিয়ে গেল। তিনি ঘাম মুছে, মাথা চুলকিয়ে, দাড়ি হাতড়িয়ে বললেন, ''বল কি হে! এখন এত? তাহলে মাসের শেষে কত দাঁড়াবে?'' ভাণ্ডারী বলল, ''আজ্ঞে তা তো হিসাব করা হয় নি!'' মন্ত্রী বললেন, ''দৌড়ে যাও, এখনি খাজাঞ্চিকে দিয়ে একটা পুরো হিসাব করিয়ে আন।'' ভাণ্ডারী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলল; মন্ত্রীমশাই মাথায় বরফ জলের পট্টি দিয়ে ঘন ঘন হাওয়া খেতে লাগলেন।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই ভাণ্ডারী কাঁপতে কাঁপতে হিসাব নিয়ে এসে হাজির। মন্ত্রী বললেন, ''সবশুদ্ধ কত হয়?'' ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বলল, ''আজ্ঞে, এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো পনের টাকা পনের আনা তিন পয়সা—'' মন্ত্রী চটে গিয়ে বললেন, ''তামাসা করছ নাকি?'' ভাণ্ডারী বলল, ''আজ্ঞে তামাসা করব কেন? আপনিই হিসাবটা দেখে নিন!''—এই বলে সে হিসাবের কাগজখানা মন্ত্রীর হাতে দিল। মন্ত্রীমশাই হিসাব পড়ে, চোখ উলটিয়ে মূর্ছা যান আর কি! সবাই ধরাধরি করে অনেক কষ্টে তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে হাজির করল।

রাজা বললেন, "ব্যাপার কি?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, রাজকোষের প্রায় দু' কোটি টাকা লোকসান হতে যাচ্ছে!" রাজা বললেন, "সে কি রকম?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে যে ভিক্ষা দেবার হুকুম দিয়েছেন, এখন দেখছি তাতে ঠাকুর রাজভাণ্ডারের প্রায় দু কোটি টাকা বের করে নেবার ফিকির করেছে!'' রাজা বললেন, ''এত টাকা দেবার তো হুকুম হয় নি! তবে এ রকম বে-হুকুম কাজ করছে কেন? বোলাও ভাণ্ডারীকে—!'' মন্ত্রী বললেন, ''আজ্ঞে, সমস্তই হুকুমমত হয়েছে! এই দেখুন না দানের হিসাব।''

রাজামশাই একবার দেখলেন, দুবার দেখলেন, তারপর ধড়ফড় করে অজ্ঞান হয়ে

পড়লেন! তারপর অনেক কষ্টে তাঁর জ্ঞান হলে পর লোকজন ছুটে গিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ডেকে আনল।

১ম	দিন	—	৻৫ এক পয়সা
২য়	দিন	—	৻১০
৩য়	দিন	—	/০
৪র্থ	দিন	—	৵০
৫ম	দিন	—	।০
৬ষ্ঠ	দিন	—	॥০
৭ম	দিন	—	১৲
৮ম	দিন	—	২৲
৯ম	দিন	—	৪৲
১০ম	দিন	—	৮৲
১১শ	দিন	—	১৬৲
১২শ	দিন	—	৩২৲
১৩শ	দিন	—	৬৪৲
১৪শ	দিন	—	১২৮৲
১৫শ	দিন	—	২৫৬৲
১৬শ	দিন	—	৫১২৲
১৭শ	দিন	—	১০২৪৲
১৮শ	দিন	—	২০৪৮৲
১৯শ	দিন	—	৪০৯৬৲
২০শ	দিন	—	৮১৯২৲
২১শ	দিন	—	১৬,৩৮৪৲
২২শ	দিন	—	৩২,৭৬৮৲
২৩শ	দিন	—	৬৫,৫৩৬৲
২৪শ	দিন	—	১৩১০৭২৲
২৫শ	দিন	—	২৬২১৪৪৲
২৬শ	দিন	—	৫২৪২৮৮৲
২৭শ	দিন	—	১০৪৮৫৭৬৲
২৮শ	দিন	—	২০৯৭১৫২৲
২৯শ	দিন	—	৪১৯৪৩০৪৲
৩০শ	দিন	—	৮৩৮৮৬০৮৲
	মোট		১,৬৭,৭৭,২১৫৸৶১৫

ঠাকুর আসতেই রাজামশাই কেঁদে তাঁর পায়ে পড়লেন। বললেন, "দোহাই ঠাকুর, আমায় ধনে-প্রাণে মারবেন না। যা হয় একটা রফা করে আমার কথা আমায় ফিরিয়ে নিতে দিন।" সন্ন্যাসী ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাজ্যের লোক দুর্ভিক্ষে মরে, তাদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। সেই টাকা নগদ হাতে হাতে পেলে আমার ভিক্ষা পূর্ণ হয়েছে মনে করব।" রাজা বললেন, "সেদিন একজন এসেছিল, সে বলেছিল দশ হাজার টাকা হলেই চলবে!" সন্ন্যাসী বললেন, "আজ আমি বলছি পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম হলেও চলবে না!" রাজা কাঁদলেন, মন্ত্রী কাঁদলেন, উজির-নাজির সবাই কাঁদল। চোখের জলে ঘর ভেসে গেল, কিন্তু ঠাকুরের কথা যেমন ছিল তেমনি রইল। শেষে অগত্যা রাজভাণ্ডার থেকে পঞ্চাশটি হাজার টাকা গুণে ঠাকুরের সঙ্গে দিয়ে রাজামশায় নিষ্কৃতি পেলেন।

দেশময় রটে গেল, দুর্ভিক্ষে রাজকোষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করা হয়েছে। সবাই বললে, "দাতাকর্ণ মহারাজ!"

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী

(প্রফেসর হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারি রাগ করেছেন। আমরা সন্দেশে সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানা কথা ছাপিয়েছি; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার কাহিনীর কোনও উল্লেখ করিনি। সত্যি, এ আমাদের ভারি অন্যায়। আমরা সে সব কাহিনী কিছুই জানতাম না, কিন্তু প্রফেসর হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরী থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এসব সত্যি কী মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিও।)

২৬শে জুন ১৯২২—কারাকোরম্, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন—আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দুজন শিকারী (ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি চন্দ্রখাই আর শিকারী দুজন সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ, আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিস। দু ঘণ্টা পথ চলে আমরা এক জায়গায় এলাম; সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুত রকম। বড় বড় গাছ, তার একটারও



হেশোরাম হুঁশিয়ার ও দলবল

নাম আমরা জানি না। একটা গাছে প্রকাণ্ড বেলের মতো মস্ত মস্ত লাল রঙের ফল ঝুলছে; একটা ফুলের গাছ দেখলাম—তাতে হলদে সাদা ফুল হয়েছে—এক-একটা দেড় হাত লম্বা। আর-একটা গাছে ঝিঙের মতো কী-সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপ্‌হাপ্ গুব্‌গাপ্ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

আমি আর শিকারী দুজন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ওইটে তার একটা মস্ত দোষ; খাওয়া পেলে তার আর বিপদ-আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকবার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখতে পেল হাতির চাইতেও বড় কী একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। প্রথমে দেখে মনে হল একটা প্রকাণ্ড মানুষ, তারপর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর, তারপর দেখি, মানুষও নয়, বাঁদরও নয়—একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মতো করে হাসছে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল সে টপাটপ্ খেয়ে শেষ করল। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেললাম। তারপর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আস্‌ল। জন্তুটা মহা খুশী হয়ে এক গ্রাসে আস্ত একখানা পাঁউরুটি আর প্রায় আধ সের গুড় শেষ করে, তারপর পাঁচ-সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলাসুদ্ধ কড়্মড়িয়ে খেয়ে ফেলল। একটা টিনে করে গুড় দেওয়া হয়েছিল, সেই টিনটাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রী মুখ করে সে কান্নার সুরে গাঁও গাঁও শব্দে বিকট চিৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি হ্যাংলাথেরিয়াম।

২৪শে জুলাই, ১৯২২—বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তর। এখানে এত দেখবার জিনিস আছে, নতুন নতুন এত সব গাছপালা জীবজন্তু যে তারই সন্ধান করতে আর নমুনা সংগ্রহ করতে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দুশো রকম পোকা আর প্রজাপতি, আর পাঁচশো রকম গাছপালা ফুলফল সংগ্রহ করেছি; আর ছবি যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোন জ্যান্ত জানোয়ার ধরে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক কতদূর কী হয়। সেবার যখন কটক্ টৌডন্ আমায় তাড়া করেছিল, তখন সে কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয়নি। সেদিন জরিপের যন্ত্র দিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই পাহাড়টাকে মেপে দেখলাম। আমার হিসাবে হল ষোল হাজার ফুট কিন্তু চন্দ্রখাই হিসাব করল বেয়াল্লিশ হাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দুজনে মিলে মেপে দেখলাম, এবার হল মোটে দু' হাজার সাতশো ফুট। বোধহয় আমাদের যন্ত্রে কোনও দোষ হয়ে থাকবে। যা হোক, এটা নিশ্চয়ই যে এ পর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চুড়োয় আর কেউ ওঠেনি। এ এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ, কোথাও জনমানুষের চিহ্নমাত্র নাই, নিজেদের ম্যাপ নিজেরা তৈরি করে পথ চলতে হয়।

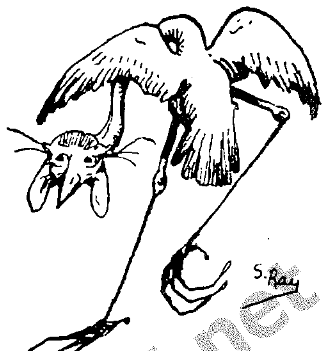
আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত-পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছট্ফট্ করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং



হ্যাংলাথেরিয়াম

'ভাইয়া রে, ভাইয়া' বলে কেঁদে অস্থির। যা হোক, মিনিট দশেক ঐ রকম হাত-পা ছুঁড়ে লক্কড় সিং একটু ঠাণ্ডা হয়ে উঠে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে হয় যে, সংসারে তার কোনও সুখ নেই, এসব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি গোম্‌রাথেরিয়াম। এমন খিট্‌খিটে খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের জন্তু আমরা আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমরা তাকে তোয়াজ-টোয়াজ করে খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রীমতো মুখ করে, ফোঁস্ ফোঁস্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে তারপর একটুখানি পেয়ারার জেলি মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

১৪ই আগস্ট বন্দাকুশ পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর।—ট্যাপ্ ট্যাপ্ থ্যাপ্ থ্যাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্।—সকালবেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এইরকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতন বড় একটা অদ্ভুত রকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন্ দিকে চলবে তার কিছুই যেন ঠিক-ঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় তো, বাঁ পা ওদিকে; সামনে চলবে তো পিছনবাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে। তার বোধহয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভালো করে দেখে, কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়্‌কে গেল যে তক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে হুড়্‌মুড়্ করে পড়ে গেল। তারপর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলেদুলে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, "ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।" তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে। আমি ছক্কড় সিংকে বললাম, "তুমি বন্দুকের আওয়াজ কর, তাহলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার পাঁচজন তাকে চেপে ধরব।" ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতে সাহস হল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজী লোক, সে দৌড়ে গিয়ে



ল্যাগব্যাগর্নিস্

পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর লক্কড় সিংয়ের দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখিটার মাথাটা থেঁৎলে দেবার আয়োজন করেছিল। কিন্তু সে আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিঙের বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই ভাইয়ে এমন মারামারি বেধে উঠল যে আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দুজনের তেজ কী তখন! আমি আর দুজন কুলি লক্কড় সিঙের জামা ধরে টেনে রাখছি; সে আমাদের সুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুঁষি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমত ভারিক্কে মানুষ; সে ছক্কড় সিঙের কোমর ধরে লট্‌কে আছে, ছক্কড় সিং তাই সুদ্ধ মাটি থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্‌বন্‌ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কিনা। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা যে কখন পালাল তা আমরা টেরই পেলাম না। যা হোক, এই ল্যাগ্‌ব্যাগ্‌ পাখি বা ল্যাগ্‌ব্যাগর্নিসের কতগুলো পালক আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।

১লা সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে—আমাদের খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তরিতরকারি যা ছিল, তা তো আগেই ফুরিয়েছে। টাটকা জিনিসের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস আর মুরগী আছে, তারা রোজ কয়েকটা করে ডিম দেয়, তাছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাছ আর মাংস, এইসব কয়েক সপ্তাহের মতো আছে, সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে। আমরা এইসব জিনিস গুনছি আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বলল যে লক্কড় সিং ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। আমরা বললাম, "ব্যস্ত কেন, সে আসবে এখন। যাবে আবার কোথায়?" কিন্তু তার পরেও দুই-তিন ঘণ্টা গেল অথচ লক্কড় সিঙের দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজতে বেরোবার পরামর্শ করছি এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠছে নামছে আর মাতালের মতো টলছে। দেখেই আমরা সুড়্‌সুড়্‌ করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বলছে, "পালিও না, পালিও না, ও কিছু বলবে না।" তার পরের মুহূর্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগড়ির কাপড় দিয়ে সে ঐ অতবড় জানোয়ার-টাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বলল যে, সে সকালবেলা কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখেই জন্তুটা মাটিতে শুয়ে 'কোঁ কোঁ' শব্দ করতে লাগল। সে দেখল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে বেশ করে ধুয়ে নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে তাকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে।



গোম্‌রাথেরিয়াম

আমরা সবাই বললাম, ''তাহলে ওটা ওই রকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।'' জন্তুটার নাম রাখা গেল ল্যাংড়াথেরিয়াম।

সকালে তো এই কাণ্ড হল; বিকেলবেলা আর-এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। তখন আমরা সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। অনেকগুলো চিল আর প্যাঁচা একসঙ্গে চেঁচালে যে রকম আওয়াজ হয়, কতকটা সেইরকম। ল্যাংড়াথেরিয়ামটা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে একটা গাছের লম্বা লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল; চিৎকার শুনবামাত্র সে, ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেই রকম ধরনের একটা বিকট শব্দ করে, বাঁধন-টাধন ছিঁড়ে, কতক লাফিয়ে, কতক দৌড়িয়ে, এক মুহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড জন্তু—সেটা কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিনটেরই কিছু কিছু আদল আছে। সে এক হাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে; আর একটা ছোট নিরীহ-গোছের কী যেন জানোয়ার হাত-পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে করলাম যে এইবার বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চিৎকারই চলতে লাগল; খাবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বলল, "আমি ওটাকে গুলি করি।" আমি বললাম, "কাজ নেই, গুলি যদি ঠিকমতো না লাগে, তাহলে জন্তুটা খেপে গিয়ে কী জানি করে বসবে, তা কে জানে?" এই বলতে বলতেই ধেড়ে জন্তুটা চিৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বলল, ''জন্তুটার নাম দেওয়া থাক চিল্লানোসোরাস।'' ছক্কড় সিং বলল, "উ বাচ্চাকো নাম দেও বেচারাথেরিয়াম।"

৭ই সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে।—নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পড়েছি। আর কোনদিকে এগোবার জো নেই। দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড়; সোজা দুশো-তিনশো হাত নীচে সমতল জমি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই এরকম। নীচের যে সমতল জমি সে একেবারে মরুভূমির মতো; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এইসব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নীচেই কী যেন একটা ধড়্‌ফড়্ করে উঠল। দেখলাম, বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমি মাছের মতো মস্ত কী একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নীচু করে ঘুমোচ্ছে। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরো পাঁচ সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনটা ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কোনটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কী যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এইরকম দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কট কটাং-কট



বেচারাথেরিয়াম ও চিল্লানোসোরাস



ল্যাংড়াথেরিয়াম

শব্দ করে প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পাগুলো গুটিয়ে আসতে লাগল। এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার, তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপরে এসে পড়ল। তারপর যে কী হল আমার ভালো করে মনে নাই—খালি একটু একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব বিট্‌কেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানা ঝাপটান আর জন্তুটার ভয়ানক কটকটাং আওয়াজ। একটুখানি ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল, তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার যোগাড় করেছিল। অন্য সকলের অবস্থাও সেইরকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলেরই গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিঙের একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে; লক্কড় সিঙের বাঁ হাতটা এমন মচ্‌কে গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে; আমারও সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আর-এক হাতে এক মুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনই আর বেশি আলোচনা না করে জিনিসপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।

প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরী এইখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরও খবর জানবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, 'এর কাছেই সব খবর পাবে।' চন্দ্রখাইয়ের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই:

আমরা। আপনারা যে-সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সে-সব কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়?

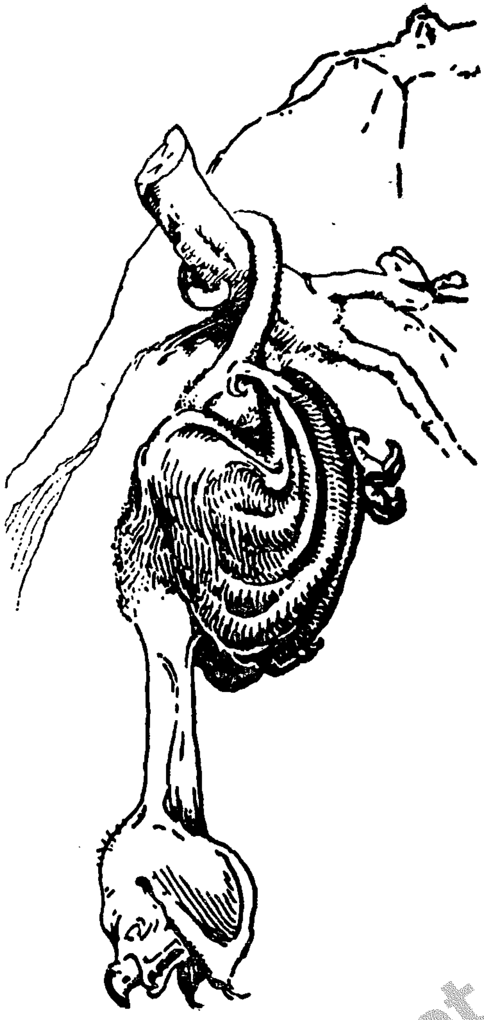
চন্দ্র সে-সব হারিয়ে গেছে।

আমরা। বলেন কি! হারিয়ে গেল? এমন এমন জিনিস সব হারিয়ে ফেললেন?

চন্দ্র। হ্যাঁ, প্রাণটুকু যে হারায়নি তাই যথেষ্ট। সে দেশের ঝড় ত আপনারা দেখেননি। তার এক-এক ঝাপটায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড় বড় তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মতো হুশ্ করে উড়িয়ে নেয়। আমাকেই ত পাঁচ-সাতবার উড়িয়ে নিয়েছিল। একবার ত ভাবলাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল সে ত আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ! কাঁটা-কম্পাস, প্ল্যান ম্যাপ, খাতাপত্র—কিছুই আর বাকী রাখেনি। কী করে যে ফিরলাম তা শুনলে আপনার ওই চুলদাড়ি সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠবে। আধপেটা খেয়ে, কোনদিন না খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হতে আমাদের পুরো তিনমাস লেগেছিল।

আমরা। তাহলে আপনার প্রমাণ-টমাণ যা-কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে?

চন্দ্র। এই তো আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কী প্রমাণ চাই? আর এই আপনাদের 'সন্দেশে'র জন্য কতকগুলো ছবি এঁকে এনেছি; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।



তিমি মাছের মত মস্ত কী জন্তু

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, "আপনি কোন্ থেরিয়াম?" আর-একজন বলল, "উনি হচ্ছেন গপ্প-থেরিয়াম—বসে বসে গপ্প মারছেন।" শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে একমুঠো চীনেবাদাম আর গোটা আষ্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজ্‌গজ্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার ত এই। এখন তোমরা কেউ যদি আরো জানতে চাও, তাহলে আমাদের ঠিকানায় প্রফেসার হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখলে আমরা তার জবাব আনিয়ে দিতে পারি।)

ওয়াসিলিসা

ওয়াসিলিসা এক সওদাগরের মেয়ে। তার মা ছিল না, কেউ ছিল না—ছিল খালি এক দুষ্টু সৎমা আর ছিল সেই সৎমার দুটো ডাইনীর মত মেয়ে।

ওয়াসিলিসার মা যখন মারা যান, তখন তিনি তাকে একটা কাঠের পুতুল দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, "একে কখন ছেড়ো না, সর্বদা কাছে কাছে রেখো, আর যখন তোমার বিপদ-আপদ ঘটবে, একে চারটি কিছু খেতে দিও। তবেই দেখবে, এ মানুষের মত তোমার সঙ্গে কথা বলবে; তখন এর পরামর্শমতো চ'লো।" তারপরে এতদিনে ওয়াসিলিসা বড় হয়ে উঠেছে।

সৎমা তার মেয়েদের সঙ্গে মিলে কেবল ওয়াসিলিসার অনিষ্ট চেষ্টা করত। ওয়াসিলিসা দেখতে যেমন সুন্দর, তার কথাবার্তা তেমনি মিষ্টি। গ্রামের যত লোক সবাই তাকে ভালবাসে। আর সেই সৎমার যে দুটো মেয়ে—তাদের দাঁত যেমন উঁচু, চোখ তেমনি টেরা, নাক তার চেয়েও বাঁকা,—আর তার উপরে তারা এমনি দুষ্টু আর হিংসুকে আর ঝগড়াটে, তাদের কে ভালবাসবে? তাই তারা হিংসায় ওয়াসিলিসাকে ধরে মারত। গ্রামের এক কিনারায় ওয়াসিলিসাদের বাড়ি আর বাড়ির পাশেই প্রকাণ্ড বন। সেই বনের মধ্যে সবুজ মাঠের উপরে ডাইনীবুড়ি বাবায়াগার বাড়ি। সে বুড়ি মানুষ খায়,—সুন্দর মেয়েদের ধরতে পেলে ত খুব উৎসাহ করেই খায়।

একদিন রাত্রে দুষ্টু সৎমা তার মেয়েদের বলল, "এক কাজ কর্। ঘরের আগুনটা নিবিয়ে দে ত। তা হলেই ওয়াসিলিসাকে আবার আগুন আনবার জন্য সেই সবুজ মাঠে বাবায়াগার বাড়িতে পাঠানো যাবে; আর বাবায়াগা তাকে ধরে গিলে ফেলবে। কেমন মজা!" যেই এ কথা বলা, অমনি বড় মেয়েটা উঠে ইচ্ছে করে ছাইমাটি চাপা দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিল। আর সকলে চেঁচাতে লাগল, "ঐ যা! আগুন তো নিবে গেল! ওয়াসিলিসা, ওয়াসিলিসা, শিগ্গীর ওঠ। বনের মধ্যে সবুজ মাঠ আছে, তার মধ্যে বাবায়াগার বাড়ি, তার বাড়ির আগুন নাকি কখনও নিবে যায় না। শিগ্গীর যাও, দৌড়ে যাও, সেই আগুন খানিকটা নিয়ে এস।"

এই না ব'লে তারা ওয়াসিলিসার চুল ধরে হিড়্‌হিড়্ ক'রে টেনে তাকে বাড়ির বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে, ঘরের খিল এঁটে দিল। ওয়াসিলিয়া বাইরে বসে কাঁদছে, এমন সময় তার সেই ছোট কাঠের পুতুলের কথা মনে হল। তখন সে তাড়াতাড়ি তার কাপড়ের মধ্যে থেকে পুতুলটাকে বের করে তার মুখে একটু খাবার দিয়ে বলতে লাগল, "কাঠের পুতুল, খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" অমনি কাঠের পুতুলের চোখদুটো জ্বলে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল—তারপর সে বলতে লাগল—

"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়, ওয়াসিলিসার কিসের ভয়? তুমি ভয় পেও না, বাবায়াগার বাড়ি সোজা চলে যাও।"

ওয়াসিলিসা চলতে লাগল। রাত গেল, সকাল গেল, দুপুর গেল, তখন দেখা গেল সবুজ মাঠ, তার ঠিক মধ্যখানে ভাঙাচোরা সাদা বাড়ি, তার গায়ে সারি সারি মড়ার খুলি, তার দরজা জানালা ফটক কবাট আস্ত আস্ত হাড়ের তৈরী। হুড়্‌কো কব্‌জা

কাঁটা পেরেক কোথাও কিছু নেই—কিছু দিয়ে বাঁধা নেই, জোড়া নেই, অথচ বাড়িখানা চারটে পাখির ঠ্যাঙের উপর ঠিক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওয়াসিলিসা অবাক হয়ে দেখছে, এমন সময় হঠাৎ একটা সাদা লোক ঝক্‌ঝকে সাদা পোশাক পরে, সাদা ঘোড়ায় চড়ে সাঁই সাঁই করে কোথা থেকে ছুটে এল। এসেই, সোজা বাড়ির ফটকের উপরে ছুটে পড়ল আর ধাঁ করে বাড়ির সঙ্গে মিশে গেল। ওয়াসিলিসা চেয়ে দেখল, তখন বিকেল হয়ে এসেছে, রোদ পড়ে আসছে।

তারপর একজন লোক এল, রাঙা সূর্যের মত লাল তার রং—তার পোশাক, তার ঘোড়া, সবই লাল। সেও তেমনি ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে মিশে গেল। ওয়াসিলিসা দেখল, সন্ধ্যে হয়েছে, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে।

তারপর একজন এল অন্ধকারের মতো কালো—কালো পোশাক, কালো ঘোড়া। সে যেই বাড়ির মধ্যে মিশে গেল আর চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবল সেই বাড়ির গায়ে মড়ার খুলিগুলো আপনা থেকে ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে উঠল—আর দাঁত বের করে চারদিকে আলো ছড়াতে লাগল।

তারপরে একটা প্রকাণ্ড হামানদিস্তা হাঁকিয়ে বাবায়াগা নিজে এসে হাজির। সে এসেই ত' ওয়াসিলিসার গন্ধ পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেল। ওয়াসিলিসা আগুন নিতে এসেছে শুনেই সে বলল, "বটে! আগুনের বুঝি দাম লাগে না? তিন দিন আমার বাড়িতে কাজ কর—যদি ভাল কাজ করতে পারিস আগুন পাবি; আর, তা যদি না পারিস তোকে আমি ঝোল রেঁধে খাব। আচ্ছা, এখন আমার খাবারগুলো উনুন থেকে নামিয়ে আমায় দে ত'!"

ওয়াসিলিসা খাবার এনে দিল। বুড়ি চেটেপুটে খেয়ে বলল, "কাল সকালে আমি বেরিয়ে যাব। সন্ধ্যার সময় এসে যেন দেখতে পাই—আমার ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়েছে, আমার রান্না ঠিকমত করা হয়েছে, আর ঐ কোণে এক ঝুড়ি সোনার ধান দেখবি তার মধ্যে অনেক কাঁকর, অনেক খুদ, আর তার চাইতেও বেশি কালো ধান মেশানো আছে—সমস্ত ঝেড়ে বেছে রাখিস। খবরদার, কিছু ভুল হয় না যেন।"

ওয়াসিলিসা বসে বসে কাঁদতে লাগল। তখন তার কাঠের পুতুলের কথা মনে হ'ল। সে পুতুলের মুখে একটু খাবার দিয়ে বলতে লাগল, "কাঠের পুতুল! খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" কাঠের পুতুলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, সে বলতে লাগল—"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়, ওয়াসিলিসার কিসের ভয়! তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও গিয়ে।"

ওয়াসিলিসা ঘুমাতে গেল। সকালবেলায় বাবায়াগা তার হামানদিস্তায় চড়ে বেরিয়ে গেল। আর কি আশ্চর্য! ঘরদোর সব আপনা থেকে ঝাঁট হয়ে গেল। খাবারগুলো উনুনে চড়ে আপনা থেকে সিদ্ধ হতে লাগল। ওয়াসিলিসা অবাক হয়ে সেই ধানগুলো দেখতে গিয়ে দেখে তার কাঠের পুতুল সমস্ত ধান বেছে সোনার ধান, কালো ধান, কাঁকর আর খুদ সব আলগা করে ফেলেছে!

বিকেলবেলা সাদা লোকটা ফিরে এল, সন্ধ্যার সময় লাল লোকটা ফিরে এল আর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রে কালো লোকটা ফিরে এল,—তারপর ঝম্‌ঝম্ খট্‌খটাং করে হামানদিস্তা হাঁকিয়ে বাবায়াগা ঘরে এল। এসেই সে হামানদিস্তার বাঁটটা দিয়ে ঘরের সব জায়গায় ধাঁই ধাঁই ক'রে মেরে দেখতে লাগল, কোনখান থেকে ধুলো পড়ে কিনা! তারপর যখন সে দেখল ঝাঁট দেওয়াও ঠিক হয়েছে, খাবারও রান্না হয়েছে, ধানও বাছা হয়েছে, তখন সে রেগে চিৎকার করে বলতে লাগল, "হতভাগী মেয়ে, কে তোকে

বাঁচিয়েছে—শিগ্‌গীর আমায় বল্‌।'' ওয়াসিলিসা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ''আমার মা মারা যাবার সময় আমায় যা আশীর্বাদ করেছিলেন, তাতেই আমি বেঁচেছি।" এই না শুনে ডাইনী বুড়ি ভয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওরে বাবারে! কার আশীর্বাদ নিয়ে আমার বাড়ি এসেছে রে! আমার সর্বনাশ করবে রে! এই নে তোর আগুন নে—আমার বাড়ি থেকে শিগ্‌গীর বেরো।" এই ব'লে সে ওয়াসিলিসাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, আর একটি মড়ার খুলি তাকে ছুঁড়ে দিল।

ওয়াসিলিসা একটা লাঠির আগায় খুলিটাকে চড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গেল। কিন্তু বাড়িতে নিলে কি হবে? তার যে সেই সৎমা আর তার দুটো দুষ্টু মেয়ে, তাদের ত' কেউ কোনদিন আশীর্বাদ করেনি—তারা মহা খুশী হয়ে যেই আগুনটা নিতে গিয়েছে অমনি তাদের গায়ে আগুন ধরে গিয়ে তারা ত' মরলই, বাড়িঘর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওয়াসিলিসা আবার বসে কাঁদতে লাগল। তখন তার কাঠের পুতুলের কথা মনে হল। পুতুলের মুখে খাবার দিয়ে বলল; "কাঠের পুতুল, খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" কাঠের পুতুল জেগে উঠে বলল—"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়—ওয়াসিলিসার কিসের ভয়! তুমি রাজার কাছে যাও তিনি তোমায় সুখী করবেন।"

ওয়াসিলিসা তখন রাজার বাড়ি চলল। এমন সুন্দর মেয়ে, এমন মিষ্টি কথা বলে, কেউ তাকে বারণ করল না, কেউ তাকে বাধা দিল না। ওয়াসিলিসা একেবারে রাজসভায় রাজার সামনে গিয়ে উপস্থিত।

রাজা এমন চমৎকার মেয়ে কখনো কোথাও দেখেননি—তিনি তার কথা শুনবেন কি—তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে উঠে পড়লেন, বললেন, ''আহা কি সুন্দর মেয়েটি গো! তুমি কার মেয়ে? কি তোমার দুঃখ? তুমি আমায় বিয়ে কর—আমার রাজ্যের রানী হয়ে থাক—আমি তোমার সব দুঃখ দূর করব।''

এমনি করে ওয়াসিলিসা রানী হলেন—আর সেই কাঠের পুতুল সোনার খাটে, মখমলের গদিতে, রেশমের চাদরের উপর ঝক্‌ঝকে পোশাক পরে শুয়ে থাকত।

দেবতার সাজা

থর্‌ নরওয়ে দেশের যুদ্ধ দেবতা।

যুদ্ধের দেবতা কিনা, তাই তাঁর গায়ে অসাধারণ জোর। তাঁর অস্ত্র একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি। সেই সর্বনেশে হাতুড়ির এক ঘা খেলে পাহাড় পর্যন্ত গুঁড়ো হ'য়ে যায়, কাজেই সে হাতুড়ির সামনে আর কেউ এগুতে সাহস পায় না। তার উপরে থরের একটা কোমর-বন্ধ ছিল, সেটাকে কোমরে বেঁধে নিলে তাঁর গায়ের জোর দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

থরের মনে ভারি অহঙ্কার, তাঁর সমান বীর আর তাঁর সমান পালোয়ান পৃথিবীতে বা স্বর্গে আর কেউ নেই।

একদিন থর্‌ দেখলেন, একটা পাহাড়ের পাশে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য ঘুমিয়ে আছে আর সে এমন নাক ডাকাচ্ছে যে গাছপালা পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। থর্‌ বললেন,

''এইও বেয়াদব, নাক ডাকাচ্ছিস্ যে?'' বলেই হাতুড়ি দিয়ে ধাঁই ধাঁই ক'রে, তার মাথায় তিন ঘা লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য ওই হাতুড়ির অমন ঘা খেয়েও দৈত্যের কিছুই হল না, সে খালি একটু মাথা চুলকিয়ে বলল ''পাখিতে কি ফেলল?''

থর্ আশ্চর্য হ'য়ে বললেন, ''তুমি ত খুব বাহাদুর হে, আমার এ হাতুড়ির ঘা সহ্য করতে পারে, এমন লোক যে কেউ আছে, তা আমি জানতাম না।''

দৈত্য বলল, ''তা জানবেন কোত্থেকে, আমাদের দেশে ত যান নি কখন। সেখানে আমার চেয়েও বড়, আমার চেয়েও ষণ্ডা ঢের ঢের দৈত্য আছে।" থর্ বললেন, "বটে? তবে ত আমার একবার সেখানে যেতে হচ্ছে।"

দৈত্য তাঁকে দৈত্যপুরীর পথ দেখিয়ে দিল আর বলল, ''দেখবেন, সেখানে গিয়ে বেশি বড়াই টড়াই করবেন না কারণ আপনি যত বড়ই দেবতা হন না কেন, সে দেশে বাহাদুরি করতে গেলে শেষে লজ্জা পেতে হবে।"

দৈত্যপুরীর চারদিকে প্রকাণ্ড বরফের দেয়াল—সে এত বড় যে তার নীচে দাঁড়ালে চুড়ো দেখা যায় না। সেই দেয়ালের এক জায়গায় বড় বড় গরাদ দেওয়া আকাশের মত উঁচু ফটক।

থর্ দেখলেন সে ফটক খোলা তার সাধ্য নয়, তাই তিনি দুটো গরাদের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। দেওয়াল-ঘেরা দৈত্যপুরীর রাজসভায় বসে বসে পাহাড়ের মত বড় বড় দৈত্যরা সব গল্প করছে; তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় যে, সেই হ'চ্ছে দৈত্যের রাজা।

দৈত্যেরা থর্কে দেখেও যেন দেখেনি এমনিভাবে গল্প করতে লাগল। খানিক পরে দৈত্যরাজ থরের দিকে তাকিয়ে, বড় বড় চোখ ক'রে, যেন কতই আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কেও? আরে, আরে, থর্ নাকি? আপনিই কি সেই দেবতা, যাঁর গায়ে ভয়ানক জোর। তা হবেও বা, শুধু শরীর বড় হ'লেই ত আর গায়ে জোর হয় না? আচ্ছা, আপনার সম্বন্ধে যে সকল ভয়ানক গল্প শুনি সে সব কি সত্যি?"

থর্ বললেন, "সত্যি কিনা, এখনি বুঝবে। ওরে কে আছিস, আমায় একটু জল দে ত, এক চুমুকে কতখানি খাওয়া যায় তোদের একবার দেখিয়ে দি।"

তখন রাজার হুকুমে একটা শিঙায় ক'রে ঠাণ্ডা জল এনে থর্কে দেওয়া হল। রাজা বললেন, "আমাদের মধ্যে বড় বড় পালোয়ান ছাড়া, কেউ ওটাকে এক চুমুকে খালি করতে পারে না। সাধারণ দৈত্যেরা দুই চুমুকে শেষ করে। তবে যারা নেহাৎ আনাড়ি, তাদের তিন চুমুক লাগে।''

থর্ তাড়াতাড়ি শিঙাটা নিয়ে চোঁ চোঁ চোঁ ক'রে এমন টান দিলেন যে, মনে হল শিঙা নিশ্চয়ই খালি হ'য়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! শিঙা যেমন ভর্তি প্রায় তেমনই রইল। থর্ ভারি লজ্জিত হ'য়ে আবার জল খেতে লাগলেন—ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্, তবু জল ফুরাল না।

রাজা হো হো ক'রে হেসে বললেন, "তাইত, অনেকটা যে বাকী রাখলেন।"

থর্ তখন রেগে খুব একটা দম নিয়ে আবার চুমুক দিলেন; খাওয়া আর থামে না—পেট ঢাক হ'য়ে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হ'য়ে এল, কিন্তু জল তবু ফুরাতে চায় না। তখন থর্ আর কি করে?

তিনি বললেন, ''না, জল খাওয়াতে আর বেশি বাহাদুরী কি? পেটুকের মত খানিকটা জল গিললেই ত আর গায়ের জোর প্রমাণ হয় না। দেখি ত আমার মত ভারী জিনিস কে তুলতে পারে।"

দৈত্যরাজ বললেন, ''তা বেশ ত। একটা সহজ পরীক্ষা দিয়েই আরম্ভ করা যাক্‌— ওরে, আমার বেড়ালটাকে নিয়ে আয় ত।" বলতেই ছেয়ে রঙের বেড়াল ঘরের মধ্যে ঢুকল। থর্‌ তাড়াতাড়ি বেড়ালটাকে ঘাড়ে ধ'রে ছুঁড়ে ফেলতে গেলেন। কিন্তু বেড়ালটা এমনি শক্ত ক'রে মাটি আঁকড়ে রইল যে অনেক টানাটানির পর তার একটি পা মাটি থেকে মাত্র এক আঙুল উঠান গেল!

দৈত্যরাজ বললেন, ''না, আমারই অন্যায় হয়েছে। এতটুকু লোক, সে কি ওই ধাড়ি বেড়ালটাকে তুলতে পারে?''

থর্‌ তখন ভয়ানক চটে গিয়ে বললেন, ''বটে! এতটুকু হই আর যাই হই—দেখি ত, কে আমার সঙ্গে কুস্তিতে পারে?''

দৈত্য বলল, "তবেই ত মুস্কিলে ফেললেন! আপনার সঙ্গে লড়াই করবার লোক এখন আমি কোথায় পাই? আচ্ছা দেখি—ওরে বুড়ী ঝিটাকে ডেকে আনত।''

মান্ধাতার আমলের এক বুড়ী, তার চুল সব শাদা, তার মুখে দাঁত নেই, গাল-টাল সব তুবড়ে গিয়েছে—সে এল কুস্তি করতে! থর্‌ ত চটেই লাল! বললেন, "একি, তামাসা পেয়েছ?" দৈত্যরা তাতে আরো হাসতে লাগল। বলল, "ও বুড়ি, থাক্‌ থাক্‌, ওকে মারিসনে—ও ভয় পেয়েছে।" থর্‌ তখন তেড়ে গিয়ে বুড়িকে এক ধাক্কা দিলেন। তাতে বুড়ী তাঁকে ঘাড় ধ'রে মাটিতে বসিয়ে দিল!

থর্‌ তখন আর কি করেন? লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গেল। সারারাত্রি সে অপমানের কথা ভেবে তাঁর ঘুম হল না। পরদিন সকালবেলাই তিনি বাড়ি চললেন। দৈত্যরাজ খুব খাতির করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুরীর ফটক পর্যন্ত এলেন। ফটকের কাছে এসে দৈত্যরাজ হেসে বললেন, ''আপনাকে একটা কথা বলছি, কারণ সেটা না বললে অন্যায় হয়। কাল কিন্তু সত্যিই আপনার হার হয় নি। আপনার অহঙ্কার ভাঙবার জন্যই আমরা আপনাকে একটু ফাঁকি দিয়েছি। ঐ যে শিঙাটা দেখলেন, ওটা সমুদ্রের শিঙা। সমস্ত সমুদ্রের জল না ফুরালে ওর জল ফুরায় না। আপনি যে তিন চুমুক দিয়েছিলেন, তাতে কতক জায়গায় সমুদ্রের ধারে চড়া পড়ে গিয়েছে।

"আর ঐ বেড়ালটা কি জানেন? ও হ'চ্ছে 'স্কাইমিড্‌'—যে সাপের মত হয়ে সমস্ত পাহাড় নদী সমুদ্র শুদ্ধ পৃথিবীটাকে শক্ত করে বেঁধে রাখে! আপনার টানে পৃথিবীটা প্রায় দশখানা হয়ে ফাটবার জোগাড় করে ছিল।

"আর ঐ বুড়ী ঝি হ'চ্ছে জরা, অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়স। বুড়ো বয়সে কা'কে না কাবু করে? আর, কাল সকালে আপনি যে দৈত্যের মাথায় হাতুড়ি মেরেছিলেন আমিই সেই দৈত্য। সে হাতুড়ি আমার মাথায় একটুও লাগে নি। আমি আগে থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য এক মায়া পাহাড়ের আড়াল দিয়েছিলাম—ওই দেখুন আপনার হাতুড়িতে তার কি দুর্দশা হয়েছে।"

থর্‌ যখন এসব ফাঁকির কথা শুনলেন—তখন তিনি রেগে কাঁপতে লাগলেন। হাতুড়িটাকে মাথার উপরে তুলে বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরিয়ে তিনি যেই সেটা ছুঁড়তে যাবেন, অমনি দেখেন—কোথায় দৈত্য, কোথায় পুরী,—চারিদিকে কোথাও কিছু নাই!

মনের রাগ মনে মনেই হজম ক'রে থর্‌ সেদিন বাড়ি ফিরলেন।

পাজি পিটার

শহরের কোণে মাঠের ধারে এক পুরানো বাড়িতে পিটার থাকত। তার আর কেউ ছিল না, খালি এক বোন ছিল। পিটারকে সবাই বলত 'পাজি পিটার'—কারণ পিটার কোন কাজকর্ম করে না—কেবল একে ওকে ঠকিয়ে খায়। পিটার একদিন ভাবল ঢের লোক ঠকিয়েছি—একবার রাজাকে ঠকানো যাক। এই ভেবে সে রাজবাড়িতে গেল।

রাজা বললেন, "তুমি কে হে? মতলবখানা কি?"

পিটার বলল, "আজ্ঞে, আমি পিটার—ঠকাবার জন্য লোক খুঁজছি।"

রাজা বললেন, "তাই নাকি? লোক খুঁজবার দরকার কি? আমাকেই একবার ঠকিয়ে দেখাও না।" পিটার মাথা চুল্‌কাতে লাগল—বলল, "তাই ত', আমার সরঞ্জাম সব বাড়িতে ফেলে এসেছি।" রাজা বললেন, "বেশ ত', তোমার সরঞ্জাম সব নিয়ে এস!" পিটার তাই শুনে ভয়ানক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল, আর বলল, "দোহাই মহারাজ, অত হাঁটাহাঁটি করলে আমি মরেই যাব।" রাজা বললেন, "তবে এই ঘোড়াটায় চড়ে যা—দেরী করিস নে।" পিটার চিৎকার করতে লাগল, "ও ঘোড়ায় আমি চড়ব না—ঘোড়া আমায় ফেলে দেবে।" কিন্তু সে কথা কেউ শুনল না, তাকে জোর করে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হল। পিটার ঘোড়াটাকে আস্তে আস্তে মোড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে—যেই একটু আড়াল পেয়েছে, অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে শহরের বাইরে উপস্থিত। সেখানে সাজ-সরঞ্জামশুদ্ধ ঘোড়াটাকে বিক্রি করে, সে পকেটভরা টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরল। এদিকে রাজা উজীর পাত্রমিত্র সভায় বসে—পিটার আসে না, আসে না—এলই না—রাজা মশাই বাইরে খুব হাসলেন—বললেন, "ছেলেটা বেজায় চালাক"—কিন্তু মনে মনে ভারি চটলেন।

একদিন পিটার দেখতে পেল মাঠের উপর দিয়ে জমকালো পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে কে যেন আসছে। পিটার বলল, "এই মাটি করেছে! রাজা আসছে।" পিটার দৌড়ে তার বোনকে বলল—"ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চড়িয়ে দাও—ফুট্‌তে থাকুক।" এই বলে সে একখানা ভাঙা শিলের উপর হিজিবিজি কি সব লিখতে বসল। তারপর যেই রাজা মশাই তার বাড়ির সামনে এসেছেন, অমনি সে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটাকে সেই শিলের উপর বসিয়ে বিড়্‌ বিড়্‌ করে কি সব বলতে বলতে ভাতটাকে কাঠি দিয়ে নাড়তে লাগল। রাজা মশাই বললেন—"এ আবার কি?" পিটার বলল, "আজ্ঞে, ভাত রাঁধছি।" রাজা বললেন, "সে কি রে? তোর আগুন কৈ?" পিটার জোড়হাতে বলল, "মহারাজ, আমরা গরীব মানুষ, আগুন-টাগুন কোথায় পাব? সন্ন্যাসী ঠাকুর এই পাথরখানা দিয়েছেন, আর দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, তাতেই আমাদের রান্না চলে যায়।"

রাজা বললেন, "দে, ওটা আমায় দে—তোকে আমি মাপ করে দিচ্ছি।" পিটার কাঁদতে লাগল, দেখাদেখি তার দুষ্টু বোনটাও কাঁদতে লাগল। রাজা বললেন, "অত কান্নাকাটির দরকার কি? আমি ত' কেড়ে নিচ্ছি না, দাম দিয়ে নিচ্ছি। এই নে!" বলে তিনি একমুঠো মোহর ফেলে দিলেন। তখন পিটার তাঁকে একটা যা-তা মন্ত্র শিখিয়ে

দিল।

রাজা মশাই সেই শিলখানা নিয়ে বাড়ি গেলেন। গিয়ে সকলকে বলে পাঠালেন, ''কাল সকালে তোমাদের এক আশ্চর্য ভোজ খাওয়াব।'' সকাল না হতেই মন্ত্রী উজির কোটাল সকলে আশ্চর্য ভোজ খাবার জন্য রাজবাড়িতে হাজির। রাজা মশাই সেই পাথরটিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে তার উপর প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি চাপালেন, আর পোলাওয়ের চাল, ঘি, মাংস, মশলা সব তার মধ্যে দিয়ে গম্ভীরভাবে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, পোলাও আর হল না। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। রাজামশাই রেগে ঘেমে লাল হয়ে উঠলেন। শেষটায় তিনি লাফিয়ে উঠে কাউকে কিছু না বলে এক তলোয়ার হাতে আবার ঘোড়ায় চড়ে পিটারের বাড়ি ছুটলেন। মনে মনে বললেন, ''এবারে আর পাজি পিটারকে আস্ত রাখছি নে।''

দূর থেকে রাজাকে দেখেই পিটার এক দৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। তার বোনকে সে আগে থেকেই সব শিখিয়ে রেখেছিল—সে করল কি একটা খরগোস কেটে তার রক্ত দিয়ে একটা থলি ভরে সেই থলিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

রাজা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, ''পিটার কৈ? তাকে শিগ্গীর ডাক।'' পিটারের বোন বলল, "দোহাই মহারাজ, পিটার এখন ঘুমুচ্ছে—সে ভয়ানক রাগী লোক, এখন জাগাতে গেলে আমায় মারবে।'' রাজা বললেন, ''কিছু ভয় নেই—আমি আছি।''

পিটারের বোন পিটারকে ডাকতে গেল। খানিক বাদেই একটা চিৎকার গর্জনের মত শোনা গেল, রাজা দৌড়ে গিয়েই দেখেন পিটার একটা ছুরি নিয়ে তার বোনকে মারল আর সে বেচারা ঠিক যেন মড়ার মত পড়ে গেল—রক্তে তার কাপড় লাল হয়ে গেল। রাজা বললেন, "তবে রে পাজি পিটার, তোর বোনটাকে শুধু শুধু মেরে ফেললি?'' পিটার বলল, ''মহারাজ, এক মিনিট সবুর করুন।'' এই বলে সে একটা ভাঙা শিঙের বাঁশী নিয়ে তার বোনের চোখে মুখে ফুঁ দিতে লাগল। এক মিনিটের মধ্যে মেয়েটা চোখ মেলে বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। রাজা ত' অবাক! তিনি বললেন, "এই শিঙেটা আমায় দিতে হবে।" পিটার কাঁদতে লাগল—বলল, "দোহাই মহারাজ, ওটা না হলে আমাদের চলবে কেমন করে?" দেখাদেখি বোনটাও কাঁদতে লাগল, ''এবার আমি মারা গেলে কি করে বাঁচাবে? দোহাই মহারাজ, পিটারের মেজাজ বড় ভয়ানক।'' রাজা বললেন, ''আমার মেজাজ তার চাইতেও ভয়ানক—তোদের যে মেরে ফেলি নি এই ঢের—এই নে—'' বলে একমুঠো মোহর ফেলে দিলেন।

রাজা বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলেন, ''এবার থেকে যার উপর রাগ করব—একেবারে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দেব।'' বাড়ি ফিরে দেখেন—নিমন্ত্রিত লোকেরা তখনও আশ্চর্য ভোজ খাবার আশায় বসে আছেন! মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আহারের অন্য বন্দোবস্ত করতে বলব কি?" রাজা বললেন, "কি? এতবড় কথা! আমি করছি একরকম বন্দোবস্ত, তুমি করবে অন্যরকম?" বলেই মন্ত্রীর মাথায় এক কোপ বসিয়ে দিলেন। উজীর নাজীর কোটাল সব হাঁ হাঁ করে উঠতেই রাজা ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ করে তাদেরও মাথা কেটে দিলেন। চারিদিকে হুলুস্থূল পড়ে গেল। রাজা বললেন, "ভয় নেই, তোমরা এখন মজা দেখ।'' বলে তিনি সেই শিঙেটা মন্ত্রীর মুখের কাছে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। কিন্তু ফুঁ দিলে হবে কি—মড়া মানুষ কি আর বাঁচে?

তখন রাজার হুকুমে পেয়াদা পুলিশ দৌড়ে গিয়ে পিটারকে ধরে আনল। একটা মজবুত বাক্সের মধ্যে তাকে বন্ধ করে সেই বাক্স মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। রাজা

বললেন, "পাজি পিটার—তোমার শাস্তি শোন—এই বাক্সে ভরে তিন দিন তিন রাত্রি তোমাকে ঐ পাহাড়ের উপর রাখা হবে। সেখানে রোদে পুড়ে হিমে ভিজে তুমি তোমার দুষ্টুমির কথা ভাববে—তারপর তোমাকে এই পাহাড় থেকে একেবারে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে।"

পিটার বললে, "আহা, মহারাজের দয়ার শরীর"—পাহাড়ের আগায় বাক্সের মধ্যে শুয়ে পিটার মনে মনে ভাবছে, 'এখন উপায়?' আর মুখে চিৎকার করে গান করছে—

"ধিন্ তাধিনা তাধেই ধেই—
স্বর্গে যাবার রাস্তা এই"—

এমনি করে দুদিন গেল। তিনদিনের দিন এক বুড়ো বিদেশী সওদাগর সেখানে এল। সে বেচারা তীর্থ করতে বেরিয়েছে, পিটারের গান শুনে ব্যাপারটা কি দেখতে এল। সওদাগর বলল, "তুমি কে ভাই? স্বর্গের রাস্তার কথা বলছি ন?" পিটার বলল, "আরে চুপ—কাউকে ব'লো না, তাহলে স্বর্গে যাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—মাঝে থেকে আমার স্বর্গে যাওয়া মাটি হবে।" সওদাগর বলল, "ভাই, তুমি একা যাবে কেন? আমায়ও একটু পথ বাতলে দাও না।" পিটার বলল, "সকলের কি তা সম্ভব হয়? এই বাক্সকে মন্ত্র পড়ে এখানে রাখা হয়েছে—যেমন তেমন বাক্স হলে হবে না; আজ রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত এসে আমায় নিয়ে যাবে। আবার যে সে দিন হবে না—এমনি তিথি, এমনি বার, এমনি মাস, এমনি নক্ষত্র সব মেলা চাই—এরকম সুযোগ হাজার বছরে একদিন হয়।" সওদাগর বলল, "ভাই, আমি বুড়ো হয়েছি, কবে মরে যাই তার ত' ঠিক নেই—আমার টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সব তোমায় লিখে দিচ্ছি। তুমি আমায় ও বাক্সটা দাও—আমি স্বর্গে যাই।" পিটার বলল, "খবরদার, আমি ছেলেমানুষ বলে আমায় টাকার লোভ দেখিও না।" বুড়ো কাঁদতে লাগল; অনেক মিনতি করে বলতে লাগল, "এই বুড়ো বয়সে তীর্থ ঘুরে কতটুকু আর পুণ্য হবে—এখন না হলে আর আমার স্বর্গে যাবার আশা নেই।" তখন পিটার রাজী হল।

বাক্স খুলে বুড়ো তার মধ্যে ঢুকল, পিটার তার কাছ থেকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বাক্সটা আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। যাবার সময় বলে গেল, "রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত আসবে, তখন কিন্তু টুঁ শব্দটি করবে না। তা হলেই আর স্বর্গে যাওয়া হবে না।"

রাত্রে রাজামশাই শান্ত্রী নিয়ে বাক্সটা নেড়েচেড়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। রাজা ভাবলেন 'আপদ গেল।' দুদিন বাদে রাজা বেড়াতে বেরিয়েছেন—এমন সময় পাজি পিটার জমকালো পোশাক পরে ধব্‌ধবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে এসে সেলাম করে বলল, "মহারাজ আমায় সমুদ্রে ফেলে বড়ই উপকার করেছেন। আহা! সমুদ্রের তলায় যে দেশ আছে—সে বড় চমৎকার জায়গা। আর লোকেরা যে কি ভাল; তা আর কি বলব—আমায় কি ছাড়তে চায়? আসবার সময় থলে ভরা কেবল হীরে মনি মুক্তো সঙ্গে দিল।" এই বলেই সে চম্পট দিল।

রাজামশাই হাঁ করে রইলেন। রাজামশাই জানতে চান সমুদ্রের তলাটার কথা। পাজি পিটার যা বলেছে তা সত্যি কিনা—তাহলে তিনি একবার দেখে আসেন।

টিয়াপাখীর বুদ্ধি

এক ফরাসি ভদ্রলোকের একটা কুকুর আর একটা টিয়াপাখি ছিল। কুকুরটাকে তিনি নানারকম খেলা আর কাজ শিখিয়ে ছিলেন, "বাইরে যাও", ''দোকানে যাও'', "খাবার আন" ব'লে তিনি যখন যেমন হুকুম করতেন, কুকুরটা ঠিক মতন তাঁর হুকুম তামিল করত। টিয়াপাখিটা কিন্তু কিছু কাজ করতে শেখে নি। সে কেবল সবসময় বকর্ বকর্ করে কথা বলত আর কুকুরটার উপর সর্দারি করত। কুকুর বেচারা হয়ত ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে হঠাৎ টিয়াপাখিটা চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, ''এইও বাইরে যাও''—কুকুরেরও হুকুম শুনে অভ্যাস—সে ভয়ে ভয়ে লেজ গুটিয়ে দরজার দিকে রওনা হত। তখন আবার টিয়াপাখিটা ঠিক তার মনিবের মত শিস্ দিয়ে তাকে ডেকে আনত।

সেই ভদ্রলোকটি কুকুরটাকে প্রায়ই রুটিওয়ালার দোকানে 'কেক্' আনবার জন্য পাঠাতেন। কুকুরটাকে সকলেই খুবই চিনত সুতরাং সে টুক্রি মুখে নিয়ে দোকানে আস্‌লেই রুটিওয়ালা টুক্রির মধ্যে কেক্ পুরে দিত আর তার মনিবের নামে হিসাব লিখে রাখত। একদিন ভদ্রলোকটি হিসাব করতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর হিসাবের সঙ্গে দোকানের হিসাব মিলছে না! তিনি যতবার কুকুরটাকে পাঠিয়েছেন—দোকানীর হিসাবে তার চাইতেও বেশি লেখা হয়েছে! কয়েক দিন পর্যন্ত এর কারণ কিছু বোঝা গেল না। তারপর তিনি একদিন দেখেন কি, কুকুরটা শুয়ে আছে এমন সময় টিয়াপাখিটা হঠাৎ ব'লে উঠল, ''টুক্রি আন।'' কুকুরটা একটু উঠে টুক্রি নিয়ে এল। টিয়াপাখি বলল, ''দোকানে যাও।'' কুকুর বেচারা ইতস্তত করতে লাগল, তাই দেখে সে আবার চীৎকার ক'রে বলল, ''এইও, দোকানে যাও।'' কুকুর বেচারা আর কি করে? সে দোকানে গিয়ে দু' মিনিটের মধ্যে খাবার এনে পাখিটার সামনে রেখে লেজ নাড়তে লাগল, ইচ্ছাটা সেও কিছু ভাগ পায়, কিন্তু টিয়াপাখি ''বাইরে যাও'' ব'লে এক ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে, নিজেই সবটা খাবার খেতে লাগল।

তখন ভদ্রলোকটি বুঝতে পারলেন যে দোকানীর হিসাবে কেন বেশি লেখা হয়।

খুকির লড়াই দেখা

একদল ইংরেজ সৈন্য মাঠের পাশ দিয়ে লড়ায়ের জায়গায় যাচ্ছে, এমন সময় তাদের একজন হঠাৎ দেখতে পেল, মাঠের কিনারায় একটা খুকী ঘুমাচ্ছে! আশেপাশে কোথাও লোকজন নাই, ঘর বাড়ি যা কিছু ছিল কোন কালে গোলা লেগে ছাতু হ'য়ে গেছে—এমন জায়গায় খুকী আস্‌ল কোথা থেকে? খুকীর বয়স বছর দুই, টুক্‌টুক্ ক'রে হেঁটে বেড়ায়, অতি মিষ্টি ক'রে দু' চারটি কথা বলে ফরাসী ভাষায়। সে যে কোথা থেকে এল তা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না। সৈন্যরা ঠিক করল, তাকে সঙ্গে

ক'রে নিয়ে যাওয়া যাক্, পরে খোঁজ ক'রে যা হয় একটা করা যাবে। লড়াইয়ের জায়গায় মাটির মধ্যে খাদ কেটে সৈন্যরা সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে বসে থাকে—কখন একদিন, কখন দুদিন, কখন বা সপ্তাহ ধ'রে এক একদলে সেই খাদের মধ্যে থাকতে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা খুকীকে নিয়েই আস্তে আস্তে খাদের মধ্যে ঢুকল।

সামনে জার্মানদের খাদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক গোলা ফাটার শব্দ হচ্ছে, কখন বা দুটো একটা বন্দুকের গুলি সোঁ ক'রে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খুকুমনির তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সৈন্যরা তার জন্য খড় দিয়ে আর বালির বস্তা দিয়ে সুন্দর বিছানা ক'রে দিয়েছে—তার মধ্যে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে! সকাল হতেই কামানের লড়াই আরম্ভ হল—প্রথমটা অল্প-সল্প—তারপরে ক্রমেই বেশি। খুকী তখন ঘুম থেকে উঠেছে, সে প্রথম প্রথম দুম্‌দাম্ শব্দে বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছিল—কিন্তু খানিকক্ষণ শুনে শুনে আপনা হতেই তার ভয় ভেঙে গেল। সে তখন খাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল, তাদের বন্দুক দূরবীণ অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে "এটা কি?" "ওটা কি?" জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

তারপর একদিন যায়, দুদিন যায়, সৈন্যরা তখনও সেখান থেকে বদলি হয় নি। তিন দিনের দিন জার্মানরা খাদের উপর প্রকাণ্ড এক বোমা ফেলল। বোমা ভয়ানক শব্দে ফাট্‌বামাত্র খাদের খানিকটা ধ'সে গিয়ে কতগুলো লোক চাপা পড়ল। অমনি সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আগে খুকীকে দেখ।" খুকী এক কোণে পুঁটুলি পাকিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। পরদিন সকালবেলা সকলে খাওয়া-দাওয়া করছে—এমন সময় একজন চেঁচিয়ে উঠল "দেখ, খুকীটা কোথায় গেল"; সকলে চেয়ে দেখে খুকীটা জার্মান খাদের দিকে খুট্‌খুট্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছে। জার্মানরা তো ব্যাপার দেখে অবাক্! খানিক বাদে তারা খুকীটাকে ডাকতে লাগল। খুকীও তাদের খাদে গিয়ে অনেক চকলেট লজঞ্চুস্ আদায় ক'রে ভারি খুশী হয়ে ফিরে এল। এম্নি ক'রে তারা এক সপ্তাহ কাটাল।

তারপর দু বছর কেটে গেছে—সেই খুকীর বাবা-মার কোন খবর পাওয়া যায় নি। সেই সৈন্যদলই এখনও তাকে খরচ দিয়ে খাইয়ে পাড়িয়ে মানুষ করছে। অবশ্য এখন সে আর লড়াইয়ের জায়গায় থাকে না—সে থাকে লণ্ডনে—সকলে তার নাম রেখেছে ফিলিস্।

ছয় বীর

সে প্রায় ছয়শত বৎসর আগেকার কথা—সে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীতে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত। দুই পক্ষেই বড় বড় বীর ছিলেন—তাঁহাদের আশ্চর্য বীরত্বের কাহিনী ইউরোপের দেশ বিদেশে লোকে অবাক হইয়া শুনিত।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড তখন খুব বড় সৈন্যদল লইয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে ছিলেন। ফ্রান্সের উত্তর দিকে সমুদ্রের উপকূলে ইংলণ্ডের খুব কাছাকাছি একটি শহর আছে, তাহার নাম 'ক্যালে' (Calais)। এই শহরটির উপর বহুকাল ধরিয়া ইংরাজদের চোখ ছিল—কারণ, এইটি দখল করিতে পারিলে, ফ্রান্সে যাওয়া-আসার খুবই সুবিধা হয়। এড্‌ওয়ার্ড জলস্থল দুইদিক হইতে এই শহরটিকে ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। 'ক্যালে' শহরে সৈন্য সামন্ত বেশী ছিল না, কিন্তু সেখানকার

দুর্গ বড় ভয়ানক। তার চারিদিক উঁচু দেয়াল ঘেরা—সেই দেয়ালের বাহিরে প্রকাণ্ড খাল—এক একটা ফটকের সামনে পোল—সেই পোল দুর্গের ভিতর হইতে গুটাইয়া ফেলা যায়। সে সময়ে কামান ছিল বটে—তাহার গোলাতে মানুষ মরে কিন্তু দুর্গ ভাঙে না। সুতরাং জোর করিয়া দুর্গ দখল করা বড় সহজ ছিল না। কিন্তু এড্ওয়ার্ড তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন না—তিনি শহরের পথঘাট আটকাইয়া, প্রকাণ্ড তাম্বু গাড়িয়া দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মতলবটা এই যে, যখন দুর্গের ভিতরের খাবার সব ফুরাইয়া আসিবে আর ভিতরের লোকজন ক্রমে কাহিল হইয়া পড়িবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই হার মানিবে; মিছামিছি লড়াই হাঙ্গামা করিবার দরকার হইবে না।

'ক্যালে'র লোকেরা যখন দেখিল, ইংরাজেরা চারিদিক হইতে পথঘাট ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তখন তাহারা শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং দুর্বল লোকদিগকে এবং স্ত্রীলোকদিগকে শহরের বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

তারপর কিছুদিন ধরিয়া ইংরাজ ও ফরাসিতে রেষারেষি চলিতে লাগিল। ফরাসীদের মতলব, বাহির হইতে দুর্গের ভিতরে খাবার পৌঁছাইবে—ইংরাজের চেষ্টা যে সেই খাবার কিছুতেই ভিতরে যাইতে দিবে না। ডাঙার পথে খাবার পৌঁছান একরূপ অসম্ভব ছিল—কারণ, সেদিকে ইংরাজদের খুব কড়াক্কড় পাহারা। সমুদ্রের দিকেও ইংরাজদের যুদ্ধ-জাহাজ সর্বদা ঘোরাঘুরি করিত কিন্তু অন্ধকার রাতে তাহাদের এড়াইয়া, ফরাসি নাবিকেরা মাঝে মাঝে রুটি, মাংস, শাক সব্জি প্রভৃতি শহরের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিত। মোঁরৎ ও মেস্ত্রিয়েল নামে দুইজন নাবিক এই কাজে আশ্চর্য সাহস ও বাহাদুরি দেখাইয়াছিল। একবার নয়, দুইবার নয়, তাহারা বহুদিন ধরিয়া এই রকমে সেই শহরে খাবার জোগাইয়াছিল। ইংরাজেরা তাহাদের ধরিবার জন্য কতবার কত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা ইংরাজ জাহাজগুলিকে ফাঁকি দিয়া পলাইত।

এইরকমে ছয়মাস কাটিয়া গেল, তবু দুর্গের লোকেরা দুর্গ ছাড়িয়া দিবার নাম পর্যন্ত করে না। তখন রাজা এড্ওয়ার্ড কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আরো লোকজন আনাইয়া সমুদ্রের তীরে দুর্গ বানাইলেন, সেখানে খুব জবরদস্ত্ পাহারা বসাইলেন, সমুদ্রের ধারে পাহাড়ে বড় বড় পাথর ছুঁড়িবার যন্ত্র বসাইলেন। নৌকার সাধ্য কি সেদিক দিয়া শহরে প্রবেশ করে! খাবার আসিবার পথ যখন বন্ধ হইতে চলিল, দুর্গের লোকদেরও তখন হইতে ক্ষুধার কষ্ট আরম্ভ হইল, তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ায় তাহাদের মধ্যে নানারকম রোগ দেখা দিতে লাগিল। তবু তাহারা মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া ইংরাজদের শিবির হইতে খাবার কাড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে যেটুকু খাওয়া জুটিত তাহা অতি সামান্য। দুর্গের সৈন্যেরা মাসের পর মাস ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিয়াও, আশ্চর্য তেজের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল—তাহাদের এক ভরসা এই যে, ফরাসি রাজা ফিলিপ নিশ্চয়ই সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে আসিবেন।

একদিন সত্য সত্যই দেখা গেল, শহর হইতে কিছু দূরে ফরাসি সৈন্যদল আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহাদের রঙিন নিশান আর সাদা তাম্বুগুলি দুর্গের লোকেরা যখন দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের আনন্দ দেখে কে! তাহারা ভাবিল, আমাদের এত দিনের ক্লেশ সার্থক হইল। যাহা হউক, ফিলিপ আসিয়াই ইংরাজেরা কোথায় কেমনভাবে আছে, তাহার খবর লইয়া দেখিলেন যে, এখান হইতে ইংরাজদের হটান বড় সহজ হইবে না। 'ক্যালে' ঢুকিবার পথ মাত্র দুইটি, একটি একেবারে সমুদ্রের ধারে—সেদিকে

ইংরাজের বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়। আর একটি পথে পোলের উপর দিয়া নদী পার হইতে হয়—সেই পোলের উপর ইংরাজেরা রীতিমত দখল জমাইয়া বসিয়াছে। পোলের মুখে দুর্গ বসাইয়া বড় বড় যোদ্ধারা তাহার মধ্যে তীরন্দাজ লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহারা প্রাণ থাকিতে কেহ পথ ছাড়িবে না। ইহা ছাড়া আর সব জলাভূমি, সেখান দিয়া সৈন্য সামন্ত পার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

ফিলিপ তখন ইংরাজ শিবিরে দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আইস! তোমরা একবার খোলা ময়দানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" এড্‌ওয়ার্ড উত্তর দিলেন, "আমি আজ বৎসরখানেক এইখানে অপেক্ষা করিয়া আছি, ইহাতে আমার খরচপত্র যথেষ্ট হইয়াছে। এতদিনে দুর্গের লোকেরা কাবু হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার খাতিরে আমি এমন সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত নই। তোমার রাস্তা তুমি খুঁজিয়া লও।"

তিন দিন ধরিয়া দুই দলে আপসের কথাবার্তা চলিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ মীমাংসা হইল না। তখন ফিলিপ অগত্যা তাঁহার সৈন্যদের লইয়া আবার বিনা যুদ্ধেই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া দুর্গবাসীদের মন একেবারে ভাঙিগয়া পড়িল। এতদিন তাহারা যে ভরসায় সকল কষ্ট ভুলিয়া ছিল, এখন সে ভরসাও আর রহিল না। তখন তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল।

এড্‌ওয়ার্ড বলিলেন, "সন্ধি করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমরা আমায় বড় ভোগাইয়াছ, আমার অনেক জাহাজ ডুবিয়াছে, টাকা ও সময় নষ্ট হইয়াছে, এবং অন্য নানারকমের ক্ষতি হইয়াছে। আমি ইহার ষোল-আনা শোধ না লইয়া ছাড়িব না। আমার সন্ধির শর্ত এই,—ক্যালের দুর্গ শহর টাকাকড়ি লোকজন সমস্ত আমার হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে—আমার যেমন ইচ্ছা ফাঁসি, কয়েদ, জরিমানা ইত্যাদি দণ্ডবিধান করিব এবং ইহাও জানিও যে, আমি যে শাস্তি দিব তাহা বড় সামান্য হইবে না।"

ইংরাজ দূত যখন ক্যালের লোকেদের এই কথা জানাইল, তাহারা এমন শর্তে সন্ধি করিতে রাজী হইল না। তাহারা বলিল, "রাজা এড্‌ওয়ার্ড স্বয়ং একজন বীরপুরুষ, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন, তিনি এমন অন্যায় দাবী কখনও করিবেন না।" ইংরাজ দলের ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন তাহাদের পক্ষ লইয়া রাজাকে অনেক বুঝাইলেন। ক্যালের লোকেরা কিরূপ সাহসের সহিত কত কষ্ট সহ্য করিয়া, বীরের মত দুর্গ রক্ষা করিয়াছে, সে সকল কথা তাঁহারা বার বার বলিলেন। এমন শত্রুকে যে সম্মান করা উচিত একথা এক বাক্যে সকলে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। অনেক বলা-কওয়ার পর, তিনি একটু নরম হইয়া এই হুকুম দিলেন—"ক্যালের লোকেরা যদি ক্ষমা চায় তবে তাহাদের ছয়জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিক—তাহারা দুর্গের চাবি লইয়া, খালি পায়ে খালি মাথায় গলায় দড়ি দিয়া আমার কাছে আসুক এবং সকলের হইয়া শাস্তি গ্রহণ করুক। তাহা হইলে আর সকলকে মাপ করিতে পারি, কিন্তু এই ছয়জনের আর রক্ষা নাই।"

ইংরাজ দূত আবার দুর্গে গিয়া এই হুকুম জানাইল। দুর্গের লোকেরা রাজার আদেশ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল—এই হুকুম শুনিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন ক্যালের সম্ভ্রান্ত ধনী বৃদ্ধ সেণ্ট পিয়ের বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, আমার জীবন দিয়া যদি তোমাদের বাঁচাইতে পারি, তবে ইহার চাইতে সুখের মৃত্যু আমি চাহি না। আমি ছয়জনের মধ্যে প্রথম প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইলাম।" এই কথায় চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল—অনেকে সেণ্ট পিয়েরের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচজন লোক অগ্রসর হইয়া, তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া

দাঁড়াইল এবং বলিল, ''আমরাও মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।'' এই দৃশ্য দেখিয়া ইংরাজ দূতের চক্ষে জল আসিল—তিনি বলিলেন, ''রাজা এড্ওয়ার্ড যাহাতে ইঁহাদের প্রতি সদয় হন, আমি সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।''

ছয়জন প্রতিনিধিকে রাজার সভায় উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা শান্তভাবে রাজার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। তারপর সেণ্ট পিয়ের ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ''আমাদের 'ক্যালে'বাসী বন্ধুগণ এতদিন অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের অযোগ্য প্রতিনিধি আমরা, আজ তাঁহাদের জীবন-রক্ষার জন্য দুর্গের চাবি আপনার কাছে দিতেছি। এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছা ও আদেশের অধীনে রহিলাম।''

সভাশুদ্ধ লোকে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ছয়জনের সকলেই বয়সে বৃদ্ধ; বহুদিন অনাহারে তাঁহাদের শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাদের গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে, এক একজন এত দুর্বল যে, চলিতে পা কাঁপে, অথচ তাঁহাদের মন এখনও তেজে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের দেখিয়া ইংরাজ যোদ্ধাগণের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, ''ইহাদের উপর শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ লওয়া কখনই উচিত নয়।'' যিনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, ''ইঁহাদের শাস্তি দিলে রাজা এড্ওয়ার্ডের কলঙ্ক হইবে—ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে।'' কিন্তু এড্ওয়ার্ডের মন গলিল না—তিনি জল্লাদ ডাকিতে হুকুম দিলেন। তখন ইংলণ্ডের রানী ফিলিপা বন্দীদের মধ্যে কাঁদিয়া পড়িলেন এবং দুই হাত তুলিয়া ভগবান যীশুর দোহাই দিয়া এড্ওয়ার্ডকে বলিলেন, ''ইহাদের তুমি ছাড়িয়া দাও।'' তখন এড্ওয়ার্ড আর 'না' বলিতে পারিলেন না।

ছয় বীরকে মুক্তি দিয়া রানী তাহাদিগকে তাঁহার নিজের বাড়িতে লইয়া, পরিতোষ-পূর্বক ভোজন করাইলেন এবং নানা উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। ইঁহাদের বীরত্বের কথা ফরাসীরা আজও ভোলেন নাই—ইংরাজও তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ভাঙা তারা

মাতারিকি আকাশের পরী। আকাশের পরী যারা, তাদের একটি ক'রে তারা থাকে। মাতারিকি তার তারাটিকে রোজ সকালে শিশির দিয়ে ধুয়ে মেজে এমনি চক্‌চক্ ক'রে সাজিয়ে রাখত যে, রাত্রিবেলা সবার আগে তার উপরেই লোকের চোখ পড়ত—আর সবাই বলত—''কী সুন্দর!'' তাই শুনে শুনে আর সব আকাশ-পরীদের ভারী হিংসা হ'ত।

তানে হচ্ছেন গাছের দেবতা। তিনি গাছে গাছে রস যোগাতেন, ডালে ডালে ফুল ফোটাতেন আর গাছের সবুজ তাজা পাতার দিকে অবাক হ'য়ে ভাবতেন—'এ জিনিস দেখলে পরে আর কিছুর পানে লোকে ফিরেও চাইবে না।' কিন্তু লোকেরা গাছের উপর দিয়ে বার বার কেবল মাতারিকির তারা দেখত, আর কেবল তার কথাই বলত। তানের বড় রাগ হ'ল। সে বলল, ''আচ্ছা, তারার আলো আর কতদিন? দুদিন বাদেই ঝাপসা হয়ে আসবে।'' কিন্তু যতদিন যায় তারা ততই উজ্জ্বল আর ততই সুন্দর

হয়, আর সবাই তার দিকে ততই বেশি ক'রে তাকায়। একদিন অন্ধকার রাত্রে যখন সবাই ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, তখন তানে চুপি চুপি দুজন আকাশ-পরীর কানে কানে বলল, ''এস ভাই, আমরা সবাই মিলে মাতারিকিকে মেরে তারাটাকে পেড়ে আনি।'' পরীরা বলল, ''চুপ, চুপ, মাতারিকি জেগে আছেন। পূর্ণিমার জোছনা রাতে আলোয় শুয়ে মাতারিকির চোখ যখন আপনা হ'তে ঢুলে আসবে, সেই সময়ে আবার এস।''

এসব কথা কেউ শুনল না, শুনল খালি জলের রাজার ছোট্ট একটি মেয়ে। রাজার মেয়ে রাত্রি হলেই, সেই তারাটির ছায়া নিয়ে খেলতে খেলতে জলের নীচে ঘুমিয়ে পড়ত আর মাতারিকির স্বপ্ন দেখত। দুষ্ট পরীর কথা শুনে তার দু' চোখ ভ'রে জল আসল।

এমন সময় দখিন হাওয়া আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে জলের ধারে এসে পড়ল। রাজার মেয়ে আস্তে আস্তে ডাকতে লাগল, ''দখিন হাওয়া শুনেছ? ওরা মাতারিকিকে মারতে চায়।'' শুনে দখিন হাওয়া 'হায়' 'হায়' ক'রে কেঁদে উঠল। রাজার মেয়ে বলল, ''চুপ চুপ, এখন উপায় কি বল ত?'' তখন তারা দুজনে পরামর্শ করল যে, মাতারিকিকে জানাতে হবে—সে যেন পূর্ণিমার রাতে জেগে থাকে।

ভোর না হ'তে দখিন হাওয়া রাজার মেয়ের ঘুম ভাঙিয়ে বলল, ''এখন যেতে হবে।'' সূর্য তখন স্নানটি সেরে সিঁদুর মেখে সোনার সাজে পুবের দিকে দেখা দিচ্ছেন। রাজার মেয়ে তার কাছে আবদার করল, ''আমি আকাশের দেশে বেড়াতে যাব।'' সূর্য তাঁর একখানি সোনালি কিরণ ছড়িয়ে দিলেন। সেই কিরণ বেয়ে বেয়ে রাজার মেয়ে উঠতে লাগল। সকাল বেলার কুয়াশা দিয়ে দক্ষিণ হাওয়া তাকে ঘিরে ঘিরে চারদিকেতে ঢেকে রাখল। এমনি ক'রে রাজার মেয়ে মাতারিকির বাড়িতে গিয়ে, সব খবর বলে আসল। মাতারিকি কি করবে? সে বলল, ''আমি আর কোথায় যাব? পূর্ণিমার রাতে এইখানেই পাহারা দিব—তারপর যা হয় হবে।''

রাজার মেয়ে ঝাপ্‌সা মেঘের আড়াল দিয়ে বৃষ্টি বেয়ে নেমে আসলেন।

তারপর পূর্ণিমার রাতে তানে আর সেই দুষ্টু পরীরা ছুটে বেরুল মাতারিকির তারা ধরতে। মাতারিকি দু'হাত দিয়ে তারাটিকে আঁকড়ে ধ'রে, প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। ছুট্, ছুট্, ছুট্! আকাশের আলোর নীচে, ছায়াপথের ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে ছুটাছুটি আর লুকোচুরি। দখিন হাওয়া স্তব্ধ হ'য়ে দেখতে লাগল, রাজার মেয়ে রাত্রি জেগে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। তারায় তারায় আকাশ-পরী, কিন্তু মাতারিকি যার কাছেই যায়, সেই তাকে দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দেয়।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে মাতারিকি হাঁপিয়ে পড়ল—আর সে ছুটতে পারে না। তখন তার মনে হ'ল, 'জলের দেশে রাজার মেয়ে আমায় বড় ভালবাসে—তার কাছে লুকিয়ে থাকি।' মাতারিকি ঝুপ্ ক'রে জলে পড়েই ডুব, ডুব, ডুব—একেবারে জলের তলায় ঠাণ্ডা কালো ছায়ার নীচে লুকিয়ে রইল। রাজার মেয়ে অমনি তাকে শেওলায় ঢেকে আড়াল করল।

সবাই তখন খুঁজে সারা—''কোথায় গেল, কোথায় গেল?'' একজন পরী ব'লে উঠল, ''ঐ ওখানে—জলের নীচে।'' তানে বললেন, ''বটে! মাতারিকিকে লুকিয়ে রেখেছ কে?'' রাজার মেয়ের বুকের মধ্যে দুর্ দুর্ ক'রে কেঁপে উঠল—কিন্তু সে কোন কথা বলল না। তখন তানে বলল, ''আচ্ছা দাঁড়াও। আমি এর উপায় করছি।'' তখন সে জলের ধারে নেমে এসে, হাজার গাছের শিকড় মেলে শোঁ শোঁ করে জল টানতে

লাগল।

তখন মাতারিকি জল ঝেড়ে উঠে আসল। জলের নীচে আরামে শুয়ে তার পরিশ্রম দূর হ'য়েছে, এখন তাকে ধরবে কে? আকাশময় ছুটে ছুটে কাহিল হ'য়ে সবাই বলছে, "আর হলো না।" তানে তখন রেগে বলল, "হতেই হবে।" এই ব'লে হঠাৎ সে পথের পাশের একটা মস্ত তারা কুড়িয়ে নিয়ে, মাতারিকির হাতের দিকে ছুড়ে মারল।

ঝন্ ঝন্ ক'রে শব্দ হল, মাতারিকি হায় হায় ক'রে কেঁদে উঠল, তার এতদিনের সাধের তারা সাত টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে পড়ল। তানে তখন দৌড়ে এসে সেগুলোকে দুহাতে ক'রে ছিটিয়ে দিলেন আর বললেন, "এখন থেকে দেখুক সবাই—আমার গাছের কত বাহার।" দুষ্টু পরীরা হো হো করে হাসতে লাগল।

এখনও যদি দখিন হাওয়ার দেশে যাও, দেখবে, সেই ভাঙা তারার সাতটি টুক্‌রো আকাশের একই জায়গায় ঝিকমিক করে জ্বলছে। ঘুমের আগে রাজার মেয়ে এখনও তার ছায়ার সঙ্গে খেলা করে। আর জোছনা রাতে দখিন হাওয়ায় মাতারিকির দীর্ঘ-নিশ্বাস শোনা যায়।

খৃষ্টবাহন

তার নাম অফেরো। অমন পাহাড়ের মত শরীর, অমন সিংহের মত বল, অমন আগুনের মত তেজ, সে ছাড়া আর কারও ছিল না। বুকে তার যেমন সাহস, মুখে তার তেমনি মিষ্টি কথা। কিন্তু যখন তার বয়স অল্প, তখনই সে তার সঙ্গীদের ছেড়ে গেল; যাবার সময় বলে গেল, "যদি রাজার মত রাজা পাই, তবে তার গোলাম হয়ে থাকব। আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে দিচ্ছে, তুমি আর কারও চাকরি করো না; যে রাজা সবার বড়, সংসারে যার ভয় নাই, তারই তুমি খোঁজ কর।" এই বলে অফেরো কোথায় জানি বেরিয়ে গেল।

পৃথিবীতে কত রাজা, তাদের কত জনের কত ভয়। প্রজার ভয়, শত্রুর ভয়, যুদ্ধের ভয়, বিদ্রোহের ভয়—ভয়ে কেউ আর নিশ্চিন্ত নেই। এরকম হাজার দেশ ছেড়ে ছেড়ে অফেরো এক রাজ্যে এল, সেখানে রাজার ভয়ে সবাই খাড়া! চোরে চুরি করতে সাহস পায় না, কেউ অন্যায় করলে ভয়ে কাঁপে। অস্ত্রেশস্ত্রে সৈন্যসামন্তে রাজার প্রতাপ দশদিক দাপিয়ে আছে। সবাই বলে, "রাজার মত রাজা।" তাই শুনে অফেরো তাঁর চাকর হয়ে রইল।

তারপর কতদিন গেল—এখন অফেরো না হ'লে রাজার আর চলে না—উঠতে বসতে তার ডাক পড়ে। রাজা যখন সভায় বসেন অফেরো তাঁর পাশে খাড়া। রাজার মুখের প্রত্যেকটি কথা সে আগ্রহ করে শোনে! রাজার চালচলন ধরনধারণ ভাবভঙ্গি—সব তার আশ্চর্য লাগে। আর রাজা যখন শাসন করেন, চড়া গলায় হুকুম দেন, অফেরো তখন অবাক হয়ে ভাবে, "যদি রাজার মত রাজা কেউ থাকে, তবে সে এই!"

তারপর একদিন রাজার সভায় কথায় কথায় কে যেন শয়তানের নাম করেছে। শুনে রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন। অফেরো চেয়ে দেখলে রাজার চোখে হাসি নেই, মুখখানি তাঁর ভাবনা ভরা। অফেরো তখন জোড়হাতে দাঁড়িয়ে বলল "মহারাজের ভাবনা কিসের? কি আছে তাঁর ভয়ের কথা?" রাজা হেসে বললেন, "এক আছে শয়তান আর

আছে মৃত্যু—এ ছাড়া আর কাকে ডরাই?" অফেরো বলল, "হায় হায়, আমি এ কার চাকরি করতে এলাম? এ যে শয়তানের কাছে খাটো হয়ে গেল। তবে যাই শয়তানের রাজ্যে; দেখি সে কেমন রাজা!" এই বলে সে শয়তানের খোঁজে বেরুল।

পথে কত লোক আসে যায়—শয়তানের খবর জিজ্ঞাসা করলে তারা বুকে হাত দেয় আর দেবতার নাম করে, আর সবাই বলে, "তার কথা ভাই বলো না, সে যে কোথায় আছে, কোথায় নেই কেউ কি তা বলতে পারে?" এমনি করে খুঁজে খুঁজে কতগুলো নিষ্কর্মা কুঁড়ের দলে শয়তানকে পাওয়া গেল। অফেরোকে পেয়ে শয়তানের ফুর্তি দেখে কে! এমন চেলা সে আর কখনও পায়নি।

শয়তান বলল, "এস এস, আমি তোমায় তামাসা দেখাই। দেখবে আমার শক্তি কত?" শয়তান তাকে ধনীর প্রাসাদে নিয়ে গেল, সেখানে টাকার নেশায় মত্ত হয়ে, লোকে শয়তানের কথায় ওঠে বসে; গরীবের ভাঙা কুঁড়ের ভিতরে গেল, সেখানে এক মুঠো খাবার লোভে পেটের দায়ে বেচারীরা পশুর মত শয়তানের দাসত্ব করে। লোকেরা সব চলছে ফিরছে, কে যে কখন ধরা পড়ছে, কেউ হয়ত জানতে পারে না; সবাই মিলে মারছে, কাটছে, কোলাহল করছে "শয়তানের জয়।"

সব দেখে শুনে অফেরোর মনটা যেন দমে গেল। সে ভাবল, "রাজার সেরা রাজা বটে, কিন্তু আমার ত কৈ এর কাজেতে মন লাগছে না।" শয়তান তখন মুচকি মুচকি হেসে বললে, "চল ত ভাই, একবারটি এই শহর ছেড়ে পাহাড়ে যাই। সেখানে এক ফকির আছেন, তিনি নাকি বেজায় সাধু। আমার তেজের সামনে তাঁর সাধুতার দৌড় কতখানি, তা' একবার দেখতে চাই।"

পাহাড়ের নীচে রাস্তার চৌমাথায় যখন তারা এসেছে, শয়তান তখন হঠাৎ কেমন ব্যস্ত হয়ে থমকিয়ে গেল—তারপর বাঁকা রাস্তা ঘুরে তড়্‌বড়্‌ করে চলতে লাগল। অফেরো বললে, "আরে মশাই, ব্যস্ত হন কেন?" শয়তান বললে, "দেখছ না ওটা কি?!" অফেরো দেখল, একটা ক্রুশের মত কাঠের গায়ে মানুষের মূর্তি আঁকা! মাথায় তার কাঁটার মুকুট—শরীরে তার রক্তধারা! সে কিছু বুঝতে পারল না। শয়তান আবার বললে, "দেখছ না ঐ মানুষকে—ও যে আমায় মানে না, মরতে ডরায় না,—বাবারে! ওর কাছে কি ঘেঁষতে আছে? ওকে দেখলেই তফাৎ হটি।" বলতে বলতে শয়তানের মুখখানা চামড়ার মত শুকিয়ে এল।

তখন অফেরো হাঁপ ছেড়ে বললে, "বাঁচালে ভাই! তোমার চাকরি আর আমায় করতে হল না। তোমায় মানে না, মরতেও ডরায় না, সেইজনকে যদি পাই তবে তারই গোলাম হয়ে থাকি।" এই বলে আবার সে খোঁজে বেরুল।

তারপর যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই সে জিজ্ঞাসা করে, "সেই ক্রুশের মানুষকে কোথায় পাব?"—সবাই বলে, খুঁজতে থাক, একদিন তবে পাবেই পাবে। তারপর একদিন চলতে চলতে সে এক যাত্রীদলের দেখা পেল। গায়ে তাদের পথের ধুলো, হাঁটতে হাঁটতে সবাই শ্রান্ত, কিন্তু তবু তাদের দুঃখ নাই—হাসতে হাসতে গান গেয়ে সবাই মিলে পথ চলছে। তাদের দেখে অফেরোর বড় ভাল লাগল—সে বললে, "তোমরা কে ভাই? কোথায় যাচ্ছ?" তারা বললে, "ক্রুশের মানুষ যীশু খৃষ্ট—আমরা সবাই তাঁরই দাস। যে পথে তিনি গেছেন, সেই পথের খোঁজ নিয়েছি।" শুনে অফেরো তাদের সঙ্গ নিল।

সে পথ গেছে অনেক দূর। কত রাত গেল দিন গেল, পথ তবু ফুরায় না—চলতে চলতে সবাই ভাবছে, বুঝি পথের শেষ নাই। এমন সময় সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় পথের

শেষ দেখা দিল। ওপারে স্বর্গ, এপারে পথ, মাঝে অন্ধকার নদী। নৌকা নাই, কূল নাই, মাঝে মাঝে ডাক আসে, "পার হয়ে এস।" অফেরো ভাবল, 'কি করে এরা সব পার হবে? কত অন্ধ, খঞ্জ, কত অক্ষম বৃদ্ধ, কত অসহায় শিশু—এরা সব পার হবে কি ক'রে?' যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁরা বললেন, "দূত আসবে। ডাক পড়বার সময় হলে, তখন তাঁর দূত আসবে।"

বলতে বলতে দূত এসে ডাক দিল। একটি ছোট মেয়ে ভুগে ভুগে রোগা হয়ে গেছে, সে নড়তে পারে না, বাইতে পারে না, দূত তাকে বলে গেল,—"তুমি এস, তোমার ডাক পড়েছে।" শুনে তার মুখ ফুটে হাসি বেরুল, সে উৎসাহে চোখ মেলে উঠে বসল। কিন্তু হায়! অন্ধকার নদী, অকূল তার কালো জল, স্রোতের টানে ফেনিয়ে উঠছে—সে নদী পার হবে কেমন করে? জলের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভিতরে দুর্ দুর্ করে উঠল। ভয়ে দু চোখ ঢেকে নদীর তীরে একলা দাঁড়িয়ে মেয়েটি তখন কাঁদতে লাগল। তাই দেখে সকলের চোখে জল এল, কিন্তু যেতেই যখন হবে তখন আর উপায় কি? মেয়েটির দুঃখে অফেরোর মন একেবারে গলে গেল। সে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, "ভয় নাই—আমি আছি।" কোথা হতে তার মনে ভরসা এল, শরীরে তার দশগুণ শক্তি এল—সে মেয়েটিকে মাথায় করে, স্রোত ঠেলে, আঁধার ঠেলে, বরফের মত ঠাণ্ডা নদী মনের আনন্দে পার হয়ে গেল। মেয়েটিকে ওপারে নামিয়ে সে বলল, "যদি সেই ক্রুশের মানুষের দেখা পাও, তাঁকে বলো, এ কাজ আমার বড় ভাল লেগেছে—যতদিন আমার ডাক না পড়ে, আমি তাঁর গোলাম হয়ে এই কাজেই লেগে থাকব।"

সেই থেকে তার কাজ হল নদী পারাপার করা। সে বড় কঠিন কাজ! কত ঝড়ের দিনে কত আঁধার রাতে যাত্রীরা সব পার হয়—সে অবিশ্রাম কেবলই তাদের পৌঁছে দেয় আর ফিরে আসে! তার নিজের ডাক যে কবে আসবে, তা ভাববার আর সময় নেই!

একদিন গভীর রাত্রে তুফান উঠল। আকাশ ভেঙে পৃথিবী ধুয়ে বৃষ্টির ধারা নেমে এল। ঝড়ের মুখে স্রোতের বেগে পথ ঘাট সব ভাসিয়ে দিল—হাওয়ার পাকে পাগল হয়ে নদীর জল ক্ষেপে উঠল। অফেরো সেদিন শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—সে ভেবেছে, এমন রাতে কেউ কি আর পার হতে চায়! এমন সময় ডাক শোনা গেল। অতি মিষ্টি কচি গলায় কে যেন বলছে, "আমি এখন পার হব।" অফেরো তাড়াতাড়ি উঠে দেখল, ছোট্ট একটি শিশু ঝড়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, আর বলছে, "আমার ডাক এসেছে, আমি এখন পার হব।" অফেরো বললে, "আচ্ছা! এমন দিনে তোমায় পার হতে হবে! ভাগ্যিস আমি শুনতে পেয়েছিলাম।" তারপর ছেলেটিকে কাঁধে নিয়ে "ভয় নাই", "ভয় নাই" বলতে বলতে সে দুরন্ত নদী পার হয়ে গেল।

কিন্তু এবারেই শেষ পার। ওপারে যেমনি যাওয়া অমনি তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে পড়ল, চোখ যেন ঝাপসা হয়ে গেল, গলার স্বর জড়িয়ে এল। তারপর যখন সে তাকাল তখন দেখল, ঝড় নেই আঁধার নেই, সেই ছোট শিশুটিও নেই—আছেন শুধু এক মহাপুরুষ, মাথায় তাঁর আলোর মুকুট। তিনি বললেন, "আমিই ক্রুশের মানুষ—আমিই আজ তোমায় ডাক দিয়েছি। এতদিন এত লোক পার করেছ, আজ আমায় পার করতে গিয়ে নিজেও পার হলে, আর তারি সঙ্গে শয়তানের পাপের বোঝা কত যে পার করেছ তা তুমিও জান না। আজ হতে তোমার অফেরো নাম ঘুচল; এখন তুমি Saint Christopher —সাধু খৃষ্টবাহন! যাও, স্বর্গের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সাধু, তাঁদের মধ্যে তুমি আনন্দে বাস কর।"

নাপিত পণ্ডিত

বাগদাদ শহরে এক ধনীর ছেলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—সে কাজীর মেয়েকে বিবাহ করিবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, কাজটা তত সহজ নয়—সুতরাং কিছুদিন চেষ্টা করিয়াই সে বেচারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। দিনে আহার নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই—তার কেবলই ঐ এক চিন্তা—কী করিয়া কাজীর মেয়েকে বিবাহ করা যায়।

বিবাহের সব চাইতে বড় বাধা কাজী সাহেব স্বয়ং। সকলেই বলে, "বাপু হে! কাজী সাহেব এ স্পর্ধার কথা জানতে পারলে তোমার একটি হাড় আস্ত রাখবেন না।" বেচারা কী করে? ক্রমাগত ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে রীতিমত জ্বর আনিয়া ফেলিল—বন্ধু-বান্ধব বলিতে লাগিল, "ছোকরা বাঁচলে হয়।" ইহার মধ্যে হঠাৎ একদিন এক বুড়ি আসিয়া খবর দিল, বিবাহের সমস্তই ঠিক। কাজী সাহেবকে না জানাইয়াই এখন চুপচাপ বিবাহটা হইয়া যাক—তারপর সুবিধামত তাঁহাকে খবর দেওয়া যাইবে; তখন তিনি গোল করিয়া করিবেন কি? সে আরও বলিল, "শুক্রবার সন্ধ্যার সময় কাজী সাহেব বাড়ি থাকবেন না—সেই সময় বিয়েটা সেরে ফেল—কিন্তু খবরদার! কাজীসাহেব যেন এসব কথার বিন্দুমাত্রও জানতে না পারেন।"

শুক্রবার দিন ভোর না হইতে বর বেচারা হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার আর সবুর সয় না। দুপুর না হইতেই সে চাকরকে বলিল, "একটা নাপিত ডেকে আন্। এখন থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকি।" চাকর তাড়াতাড়ি কোথা হইতে এক নাপিত আনিয়া হাজির করিল।

নাপিত আসিয়াই বরকে বলিল, "আপনাকে বড় কাহিল দেখছি—যদি অনুমতি করেন ত' ছুরি দিয়ে বাঁ হাতের একটুখানি রক্ত ছাড়িয়ে দিই—তা হলেই সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা বোধ করবেন।" বর বলিল, "না হে, তোমাকে চিকিৎসার জন্য ডাকি নাই—আমার দাড়িটা একটু চট্‌পট্ কামিয়ে দাও দেখি।" নাপিত তখন তাহার সর ঞ্জামের থলি খুলিয়া অনেকগুলা ক্ষুর বাহির করিল, তারপর প্রত্যেকটা ক্ষুর হাতে লইয়া বার বার করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সময় নষ্ট করিয়া সে একটা বাটির মত কী একটা বাহির করিল। বর ভাবিল, এইবার বাটিতে জল দিয়া কামান শুরু করিবে। কিন্তু নাপিত তাহার কিছুই করিল না; সে অদ্ভুত একটা কাঁটা-কম্পাসের মানযন্ত্র লইয়া ঘরের বাহিরে উঠানের মাঝখানে গিয়া, সূর্যের গতিবিধির কী সব হিসাব করিতে লাগিল। তারপর আবার গম্ভীরভাবে ঘরে আসিয়া বলিল, "মহাশয়, হিসাব ক'রে দেখলাম, এই বৎসর এই মাসে এই শুক্রবারের ঠিক এই সময়টি অতি চমৎকার শুভক্ষণ—দাড়ি কামাবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু আজ মঙ্গল বুধ গ্রহ-সংযোগ হওয়াতে আপনার কিছু বিপদের সম্ভাবনা দেখছি।"

কাজের সময় এরকম বক্‌বক্ করিলে কাহার না রাগ হয়? বিবাহার্থী ছোকরাটি রাগিয়া বলিল, "বাপু হে, তোমাকে কি বক্তৃতা শোনাবার জন্য অথবা জ্যোতিষ গণনার জন্য ডাকা হয়েছে? কামাতে এসেছ, কামিয়ে যাও।" কিন্তু নাপিত ছাড়িবার পাত্রই নয়, সে অভিমান করিয়া বলিল, "মশাই, এ রকম অন্যায় রাগ আপনার শোভা পায় না।

আপনি জানেন আমি কে? আপনি কি জানেন যে বাগদাদ শহরে আমার মত দ্বিতীয় আর কেউ নাই? আমার গুণের কথা শুনবেন? আমি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক, রসায়ন শাস্ত্রে আমার অসাধারণ দখল, আমার জ্যোতিষ গণনা একেবারে নির্ভুল, নীতিশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্র তর্কশাস্ত্র, এ সমস্তই আমার কণ্ঠস্থ, জ্যামিতি থেকে শুরু ক'রে বীজগণিত পাটিগণিত পর্যন্ত গণিতশাস্ত্রের কোন তত্ত্বই জানতে বাকি রাখি নি। তার উপর আবার আমি একজন পাকা দার্শনিক পণ্ডিত, আর আমি যে সকল কবিতা রচনা করি, সমঝদার লোকের মুখে তার সুখ্যাতি আর ধরে না।''—নাপিতের এই বক্তৃতার দৌড় দেখিয়া ছোকরাটি ভীষণ রাগের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। সে বলিল, ''তোমার বক্তৃতা শুনবার ফুরসৎ আমার নাই—তুমি কামান শেষ করবে কি না বল, না কর চলে যাও।'' নাপিত বলিল, ''এই কি আপনার উপযুক্ত কথা হল? আমি কি আপনাকে ডাকতে এসেছিলাম, না আপনি নিজেই লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়েছিলেন? এখন আমি আপনাকে না কামিয়ে গেলে, আমার মান সম্ভ্রম থাকে কি ক'রে? আপনি সেদিনকার ছেলে, আপনি এসবের কদর বুঝবেন কি? আপনার বাবা যদি আজ থাকতেন, তবে আমাকে ধন্য ধন্য বলতেন—কারণ তাঁর কাছে কোন দিনই আমার সম্মানের ত্রুটি হয় নি। আমার এ সকল অমূল্য উপদেশ শুনবার সৌভাগ্য সকলে পায় না—তিনি তা বেশ বুঝতেন। আহা, তিনি কী চমৎকার লোকই ছিলেন! আমার কথাগুলি কত আগ্রহ ক'রে তিনি শুনতেন! আর কত খাতির, কত তোয়াজ ক'রে কত অজস্র বকশিস্ দিয়ে তিনি আমায় খুসি রাখতেন। আপনি ত' সে সব খবর রাখেন না।'' এই রকম বক্তৃতায় সে আরও আধঘণ্টা সময় কাটাইয়া দিল। এদিকে বেলাও বাড়িতেছে, বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; কাজেই বর একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিল, ''যাও! যাও! তোমায় কামাতে হবে না।''

নাপিত তখন তাড়াতাড়ি ক্ষুর লইয়া কামাইতে শুরু করিল। কিন্তু ক্ষুরের দুই চার টান দিয়াই সে আবার থামিয়া বলিল, ''মশাই! ওরকম রাগ করা ভাল নয়। ভেবে দেখুন, জ্ঞানে গুণে বয়সে সব বিষয়েই আপনি ছেলেমানুষ। তবে অবশ্যি, আপনার যে রকম তাড়া দেখছি, তাতে বোধহয় আপনি আজকে একটু বিশেষ ব্যস্ত আছেন। এ রকম ব্যস্ততার কারণটা কী জানতে পারলে, আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ঠিক ভালমত ব্যবস্থা করতে পারি।'' এই বলিয়াই সে আবার তাহার মানযন্ত্র লইয়া হিসাব করিতে লাগিল। যতই তাড়া দেওয়া যায়, ততই সে বলে, ''এই, হিসাবটা হল ব'লে।'' তখন বেগতিক দেখিয়া বর বলিল, ''আরে, ব্যাপারটা কিছু নয়—আজ রাত্রে আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে—তাই, বড় তাড়াতাড়ি।''

এই কথা শুনিবা মাত্র নাপিত একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে বলিল, ''ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলেন! আমার বাড়িতেও যে আজ ছয়জন লোককে নেমন্তন্ন করে এসেছি! তাদের জন্য ত' কোনরকম বন্দোবস্ত ক'রে আসি নি। এখন, মনে করুন, মাংস কিনতে হবে, রাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে, মিঠাই আনতে হবে;— কখন বা এসব করি, আর কখনই বা আপনাকে কামাই।'' বর দেখিল আবার বেগতিক, সে নিরুপায় হইয়া বলিল, ''দোহাই তোমার। আর আমায় ঘাঁটিও না—আমার চাকরকে বলে দিচ্ছি—তোমার যা কিছু চাই আমার ভাঁড়ার থেকে সমস্তই সে বা'র ক'রে দেবে—তার জন্য তুমি মিথ্যে ভেব না।'' নাপিত বলিল, ''এ অতি চমৎকার কথা। দেখুন, হামামের মালিশওয়ালা জান্তোৎ—আর ঐ যে কড়াইশুঁটি বিক্রী করে, সালি— আর ঐ শিম বেচে, সালোৎ—আর আখের শা তরকারিওয়ালা আর আবু মেকারেজ

ভিস্তি আর পাহারাদার কাশেম—এরা সবাই ঠিক আমার মত আমুদে—এরা কখনও মুখ হাঁড়ি করে থাকে না; তাই এদের আমি নেমন্তন্ন করেছি। আর এদের একটা বিশেষ গুণ যে, এরা ঠিক আমারই মত চুপচাপ থাকে—বেশী বক্‌বক্ করতে ভাল বাসে না। এক একজন লোক থাকে তারা সব সময়েই বকর্ বকর্ করছে—আমি তাদের দু চক্ষে দেখতে পারি নে। এরা কেউ সে রকম নয়; তবে নাচতে আর গাইতে এরা সবাই ওস্তাদ। জান্তোৎ কি রকম ক'রে নাচে দেখবেন? ঠিক এই রকম''—এই বলিয়া সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য ও বিকট সুরে গান করিতে লাগিল। কেবল তাহাই নয়, ঐ ছয়জন বন্ধুর মধ্যে প্রত্যেকে কি রকম করিয়া নাচে ও গায়, তাহার নকল দেখাইয়া তবে সে ছাড়িল। তারপর, হঠাৎ সে ক্ষুরটুর ফেলিয়া ভাঁড়ার ঘরে চাকরের কাছে তাহার নিমন্ত্রণের ফর্দ দিতে ছুটিল। বর ততক্ষণে আধ কামান অবস্থায় ক্ষেপিয়া পাগলের মত হইয়াছে, কিন্তু নাপিত তাহার কথায় কানও দেয় না। সে গম্ভীর-ভাবে ঘরের হাঁস মুরগী তরিতরকারি হালুয়া মিঠাই সব বাছিয়া বাছিয়া পছন্দ করিতে লাগিল। তারপর আরও অনেক গল্প আর অনেক উপদেশ শুনাইয়া অতি ধীর মেজাজে সাড়ে চার ঘণ্টায় সে তাহার কামান শেষ করিল। আবার যাইবার সময় বলিয়া গেল, ''দেখুন, আমার মত এমন বিজ্ঞ, এমন শান্ত, এমন অল্পভাষী হিতৈষী বন্ধু আপনি পেয়েছেন, সেটা কেবল আপনার বাবার পুণ্যে। আজ হ'তে আমি আপনার কেনা হয়ে রইলুম।''

নাপিতের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া বর দেখিল, আর সময় নাই। সে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিতে বাহির হইল। লোকজন সঙ্গে লইল না, এবং কাহাকেও খবর দিল না; পাছে কথাটা কোন গতিকে কাজী সাহেবের কাছে ফাঁস হইয়া যায়।

এদিকে নাপিতও কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকে নাই। সে কেবল ভাবিতেছে, ''না জানি সে কি রকম নেমন্তন্ন, যার জন্য সে এমন ব্যস্ত, যে আমার ভাল ভাল কথাগুলো পর্যন্ত শুনতে চায় না। ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।'' সুতরাং বর যখন সন্ধ্যার সময় বাহির হইল, নাপিতও তাহার পিছন পিছন লুকাইয়া চলিল।

বর সাবধানে কাজীর বাড়ি হাজির হইয়া খবর লইল যে কাজীসাহেব বাড়িতে নাই; এদিকে সব আয়োজন প্রস্তুত—তাড়াতাড়ি বিবাহ সারিতে হইবে। দৈবাৎ যদি কাজীসাহেব আসিয়া পড়েন, তাহার জন্য ছাতের উপর পাহারা বসান হইল, তাঁহাকে আসিতে দেখিলেই সে চিৎকার করিয়া সঙ্কেত করিবে এবং বরকে খিড়কী দরজা দিয়া পলাইতে হইবে। এদিকে কিন্তু হতভাগা নাপিতটা বাড়ির বাহিরে থাকিয়া যে আসে তাহাকেই বলে, ''তোমরা সাবধানে থেক—আমাদের মনিবটি কেন জানি এই কাজীর বাড়িতে ঢুকেছেন—তাঁর জন্য আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।''

বিবাহ আরম্ভ না হইতেই মুখে মুখে এই খবর রটিয়া বাড়ির চারিদিকে ভীড় জমিয়া গেল—তাহা দেখিয়া ছাতের উপরে সেই পাহারাদার ব্যস্তভাবে ডাক দিয়া উঠিল। আর কোথা যায়! তাহার গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র ''কে আছিস রে, আমার মনিবকে মেরে ফেললে রে" বলিয়া নাপিত "হায় হায়" শব্দে আপনার চুল দাড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। তাহার বিকট আর্তনাদে চারিদিকে এমন হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, স্বয়ং কাজীসাহেব পর্যন্ত গোলমাল শুনিয়া বাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই বলে ব্যাপার কি? নাপিত বলিল, ''আর ব্যাপার কী! ঐ লক্ষ্মীছাড়া কাজী নিশ্চয়ই আমার মনিবকে মেরে ফেলেছে।'' তখন মার মার করিয়া সকলে কাজীর বাড়িতে ঢুকিল। বর বেচারা পলাইবার পথ না পাইয়া, ভয়ে ও লজ্জায় একটা সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া ছিল, নাপিত সেই

হাজার লোকের মাঝখানে সিন্দুকের ভিতর হইতে "এই যে আমার মনিব" বলিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল। সে বেচারা এই অপমানে লজ্জিত হইয়া যতই সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইতে যায়, নাপিত ততই তাহার পিছন পিছন ছুটিতে থাকে আর বলে, "আরে মশাই, পালান কেন? কাজীসাহেবকে ভয় কিসের? আরে মশাই, থামুন না।" ব্যাপার দেখিয়া চারিদিকে লোকজন হাসাহাসি ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। কাজীর মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়া, বিবাহ ত' হইলই না, মাঝে হইতে প্রাণপণে দৌড়াইতে গিয়া, হোঁচট খাইয়া বরের একটা ঠ্যাং খোঁড়া হইয়া গেল। এখানেও তাহার দুর্দশার শেষ নয়, নাপিতটা সহরের হাটে বাজারে সর্বত্র বাহাদুরি করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখেছ? ওকে কি রকম বাঁচিয়ে দিলাম। সেদিন আমি না থাকলে কি কাণ্ডই না হ'ত। কাজীসাহেব যে রকম খ্যাপা মেজাজের লোক, কখন কী ক'রে বসত কে জানে। যা হোক, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি।" যে আসে তাহার কাছেই সে এই গল্প জুড়িয়া দেয়।

ক্রমে ছোকরাটির অবস্থা এমন হইল যে, সে কাহাকেও আর মুখ দেখাইতে পারে না—যাহার সঙ্গে দেখা হয় সেই জিজ্ঞাসা করে, "ভাই, কাজীর বাড়িতে তোমার কি হয়েছিল? শুনলাম ঐ নাপিত না থাকলে তুমি নাকি ভারি বিপদে পড়তে।" শেষটায় একদিন অন্ধকার রাত্রে বেচারা বাড়িঘর ছাড়িয়া বাগদাদ সহর হইতে পালাইল, এবং যাইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, "এমন দূর দেশে পলাইব, যেখানে ঐ হতভাগা নাপিতের মুখ দেখিবার আর কোন সম্ভাবনা না থাকে।"

বুদ্ধিমানের সাজা

আলি শাকালের মত ওস্তাদ আর ধূর্ত নাপিত সে সময়ে মেলাই ভার ছিল। বাগদাদের যত বড় লোক তাকে দিয়ে খেউরী করাতেন, গরিবকে সে গ্রাহ্যই করত না।

একদিন এক গরীব কাঠুরে ঐ নাপিতের কাছে গাধা বোঝাই ক'রে কাঠ বিক্রী করতে এল। আলি শাকাল কাঠুরেকে বলল, "তোমার গাধার পিঠে যত কাঠ আছে সব আমাকে দাও; তোমাকে এক টাকা দেব।" কাঠুরে তাতেই রাজী হয়ে গাধার পিঠের কাঠ নামিয়ে দিল। তখন নাপিত বলল, "সব কাঠ তো দাও নি; গাধার পিঠের 'গদি'টা কাঠের তৈরী; ওটাও দিতে হবে।" কাঠুরে তো কিছুতেই রাজী হলো না; কিন্তু নাপিত তার আপত্তি গ্রাহ্য না ক'রে গদিটা জবরদস্তি ক'রে কেড়ে নিয়ে, কাঠুরেকে এক টাকা দিয়ে বিদায় করে দিল।

কাঠুরে বেচারা আর কি করে? সে গিয়ে খালিফের কাছে তার নালিশ জানাল। খালিফ বললেন, "তুমি তো 'গাধার পিঠের সমস্ত কাঠ' দিতে রাজী ছিলে; তবে আর এখন আপত্তি করছ কেন? কথামতই তো কাজ হয়েছে।" তারপর কাঠুরের কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি জানি বললেন; কাঠুরেও মুচ্‌কি হেসে, "যো হুকুম" বলে সেলাম ঠুকে চলে গেল।

কিছুদিন বাদে কাঠুরে আবার নাপিতের কাছে এসে বলল, "নাপিত সাহেব, আমি আর আমার সঙ্গীকে খেউরী করার জন্য তোমাকে ১০ টাকা দেব, তোমার মত ওস্তাদের হাতে অনেক বেশি টাকা দিয়েও খেউরী হ'তে পারলে জন্ম সার্থক হয়। তুমি কি

রাজী আছ?'' নাপিত তো খোসামোদে ভুলে, কাঠুরেকে কামিয়ে চট্‌পট্ দিল; তারপর তাকে বলল, 'কৈ হে তোমার সঙ্গী?'' কাঠুরে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তার গাধাটি এনে হাজির করল। নাপিত তো বেজায় চটে গিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, ঘুঁষি বাগিয়ে বলল, ''এত বড় বেয়াদবি আমার সঙ্গে! সুলতান, খালিফ, আগা, বেগ যার হাতে খেউরী হবার জন্য সর্বদাই খোসামোদ করে, সে কিনা গাধাকে কামাবে! বেরোও এখনি এখান থেকে!''

কাঠুরে নাপিতের কথার কোন উত্তর না দিয়ে সটান গিয়ে খালিফের কাছে হাজির। খালিফ তার নালিশ শুনে আলি শাকালকে ডেকে পাঠালেন। নাপিত এসেই হাত জোড় করে বলল, ''দোহাই ধর্মাবতার! গাধাকে কি কখনও মানুষের সঙ্গী ব'লে ধরা যেতে পারে?'' খালিফ বললেন, ''তা' না হ'তেও পারে, কিন্তু গাধার পিঠের গদিও কি কখনও কাঠের বোঝার মধ্যে ধরা যেতে পারে? তুমিই একথার জবাব দাও।'' নাপিত তো একেবারে চুপ! কিছুক্ষণ বাদে খালিফ বললেন, ''আর দেরি কেন? গাধাকে কামিয়ে ফেল; কথা-মত কাজ না করতে পারলে তার উচিত সাজার ব্যবস্থা হবে জানই তো।''

নাপিত বেচারা আর করে কি? গাধাকে বেশ ক'রে খুর বুলিয়ে কামাতে লাগল। সেই তামাসা দেখবার জন্য চারিদিকে ভিড় জমে গেল। কামান শেষ হতেই নাপিত অপমানে মাথা হেঁট ক'রে বাড়ি পালাল। কাঠুরেও নেড়া গাধায় চ'ড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাড়ি পালাল।

হারকিউলিস

মহাভারতে যেমন ভীম, গ্রীস দেশের পুরাণে তেমনই হারকিউলিস। হারকিউলিস দেবরাজ জুপিটারের পুত্র কিন্তু তাঁর মা এই পৃথিবীরই এক রাজকন্যা, সুতরাং তিনিও ভীমের মত এই পৃথিবীরই মানুষ, গদাযুদ্ধে আর মল্লযুদ্ধে তাঁর সমান কেহ নাই। মেজাজটি তাঁর ভীমের চাইতেও অনেকটা নরম, কিন্তু তাঁর এক একটি কীর্তি এমনই অদ্ভুত যে, পড়িতে পড়িতে ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ আর হনুমান এই চার মহা-বীরের কথা মনে পড়ে।

হারকিউলিসের জন্মের সংবাদ যখন স্বর্গে পেঁছিল, তখন তাঁর বিমাতা জুনো দেবী হিংসায় জ্বলিয়া বলিলেন, ''আমি এই ছেলের সর্বনাশ করিয়া ছাড়িব।'' জুনোর কথামত দুই প্রকাণ্ড বিষধর সাপ হারকিউলিসকে ধ্বংস করিতে চলিল। সাপ যখন শিশু হারকিউলিসের ঘরে ঢুকিল, তখন তাহার ভয়ংকর মূর্তি দেখিয়া ঘরসুদ্ধ লোকে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল, কেহ শিশুকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিল না। কিন্তু হারকিউলিস নিজেই তাঁর দুইখানি কচি হাত বাড়াইয়া সাপ দুটার গলায় এমন চাপিয়া ধরিলেন যে, তাহাতেই তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। জুনো বুঝিলেন, এ বড় সহজ শিশু নয়!

বড় হইয়া হারকিউলিস সকল বীরের গুরু বৃদ্ধ চীরণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে গেলেন। চীরণ জাতিতে সেণ্টর—তিনি মানুষ নন। সেণ্টরদের কোমর পর্যন্ত মানুষের মত, তার নীচে একটা মাথাকাটা ঘোড়ার শরীর বসান। চীরণের কাছে অস্ত্র-

বিদ্যা শিখিয়া হারকিউলিস অসাধারণ যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এইবার পৃথিবীটাকে দেখিয়া লইব।'

হারকিউলিস পৃথিবীতে বীরের উপযুক্ত কাজ খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় দুটি আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি তাঁর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হারকিউলিস দেখিলেন দুটি মেয়ে—তাদের মধ্যে একজন খুব চঞ্চল, সে নাকে-চোখে কথা কয়, তার দেমাকের ছটায় আর অলঙ্কারের বাহারে যেন চোখ ঝলসাইয়া দেয়। সে বলিল, "হারকিউলিস, আমাকে তুমি সহায় কর, আমি তোমায় ধন দিব, মান দিব, সুখে স্বচ্ছন্দে আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাইবার উপায় করিয়া দিব।" আর একটি মেয়ে শান্তশিষ্ট, সে বলিল, "আমি তোমাকে বড় বড় কাজ করিবার সুযোগ দিব, শক্তি দিব, সাহস দিব। যেমন বীর তুমি তার উপযুক্ত জীবন তোমায় দিব।" হারকিউলিস খানিক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি ধন মান সুখ চাই না—আমি তোমার সঙ্গেই চলিব। কিন্তু, তোমার পরিচয় জানিতে চাই।" তখন দ্বিতীয় সুন্দরী বলিল, "আমার নাম পুণ্য। আজ হইতে আমি তোমার সহায় থাকিলাম।"

তারপর কত বৎসর হারকিউলিস দেশে দেশে কত পুণ্য কাজ করিয়া ফিরিলেন—তাঁর গুণের কথা আর বীরত্বের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। থেবিসের রাজা ক্রয়ন্ তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা মেগারার বিবাহ দিলেন। হারকিউলিস নিজের পুণ্য ফলে কয়েক বৎসর সুখে কাটাইলেন।

কিন্তু বিমাতা জুনোর মনে হারকিউলিসের এই সুখ কাঁটার মত বিঁধিল। তিনি কী চক্রান্ত করিলেন, তাহার ফলে একদিন হারকিউলিস হঠাৎ পাগল হইয়া তাঁর স্ত্রী পুত্র সকলকে মারিয়া ফেলিলেন। তারপর যখন তাঁর মন সুস্থ হইল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পাগল অবস্থায় কি সর্বনাশ করিয়াছেন, তখন শোকে অস্থির হইয়া এক পাহাড়ের উপরে নির্জন বনে গিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আর বাঁচিয়া লাভ কি?'

হারকিউলিস দুঃখে বনবাসী হইয়াছেন, এদিকে জুনো ভাবিতেছেন, 'এখনও যথেষ্ট হয় নাই।' তিনি দেবতাদের কুমন্ত্রণা দিয়া এই ব্যবস্থা করাইলেন যে, এক বৎসর সে আর্গসের দুর্দান্ত রাজা ইউরিসথিউসের দাসত্ব করিবে।

হারকিউলিস প্রথমে এই অন্যায় আদেশ পালন করিতে রাজী হন নাই—কিন্তু দেবতার হুকুম লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই দেখিয়া, শেষে তাহাতেই সম্মত হইলেন। রাজা ইউরিসথিউস্ ভাবিলেন, এইবার হারকিউলিসকে হাতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে দিয়া এমন সব অদ্ভুত কাজ করাইয়া লইব, যাহাতে আমার নাম পৃথিবীতে অমর হইয়া থাকিবে।

নেমিয়ার জঙ্গলে এক দুর্দান্ত সিংহ ছিল, তার দৌরাত্ম্যে দেশের লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা ইউরিসথিউস্ বলিলেন, "যাও হারকিউলিস্! সিংহটাকে মারিয়া আইস।" হারকিউলিস সিংহ মারিতে চলিলেন। "কোথায় সেই সিংহ?" পথে যাকে জিজ্ঞাসা করেন সেই বলে, "কেন বাপু সিংহের হাতে প্রাণ দিবে? সে সিংহকে কি মানুষে মারিতে পারে? আজ পর্যন্ত যে-কেহ সিংহ মারিতে গিয়াছে সে আর ফিরে নাই।" কিন্তু হারকিউলিস ভয় পাইলেন না। তিনি একাকী গভীর বনে সিংহের গহ্বরে ঢুকিয়া, সিংহের টুঁটি চাপিয়া তাহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন। তারপর সেই সিংহের চামড়া পরিয়া তিনি রাজার কাছে সংবাদ দিতে ফিরিলেন।

রাজা বলিলেন, "এবার যাও লের্নার জলাভূমিতে। সেখানে হাইড্রা নামে সাতমুণ্ড

সাপ আছে, তাহার ভয়ে লোকজন দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে। জন্তুটাকে না মারিলে ত আর চলে না!'' হারকিউলিস তৎক্ষণাৎ সাতমুণ্ড জানোয়ারের সন্ধানে বাহির হইলেন।

লের্নার জলাভূমিতে গিয়া আর সন্ধান করিতে হইল না, কারণ, হাইড্রা নিজেই ফোঁস ফোঁস শব্দে আকাশ কাঁপাইয়া তাঁকে আক্রমণ করিতে আসিল। হারকিউলিস এক ঘায়ে তার একটা মাথা উড়াইয়া দিলেন—কিন্তু, সে কি সর্বনেশে জানোয়ার—সেই একটা কাটা মাথার জায়গায় দেখিতে দেখিতে সাতটা নূতন মাথা গজাইয়া উঠিল। হারকিউলিস দেখিলেন, এ জন্তু সহজে মারিবার নয়। তিনি তাঁহার সঙ্গী ইয়োলাসকে বলিলেন, ''একটা লোহা আগুনে রাঙাইয়া আন ত।'' তখন জ্বলন্ত গরম লোহা আনাইয়া তারপর হাইড্রার এক একটা মাথা উড়াইয়া কাটা জায়গায় লোহার ছ্যাঁকা দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এত করিয়াও নিস্তার নাই, শেষ একটা মাথা আর কিছুতেই মরিতে চায় না—সাপের শরীর হইতে একেবারে আলগা হইয়াও সে সাংঘাতিক হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে। হারকিউলিস তাহাকে পিটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া, তাহার উপর প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। ফিরিবার আগে হারকিউলিস সেই সাপের রক্তে কতগুলা তীরের মুখ ডুবাইয়া লইলেন, কারণ, তাঁহার গুরু চীরণ বলিয়াছেন—হাইড্রার রক্তমাখা তীর একেবারে অব্যর্থ মৃত্যুবাণ।

হারকিউলিস ইউরিসথিউসের দেশে ফিরিয়া গেলে পর, কিছুদিন বাদেই আবার তাঁর ডাক পড়িল। এবারে রাজা বলিলেন, ''সেরিনিয়ার হরিণের কথা শুনিয়াছি, তার সোনার শিং, লোহার পা, সে বাতাসের আগে ছুটিয়া চলে। সেই হরিণ আমার চাই—তুমি তাহাকে জীবন্ত ধরিয়া আন।'' হারকিউলিস আবার চলিলেন। কত দেশ দেশান্তর, কত নদী সমুদ্র পার হইয়া, দিনের পর দিন সেই হরিণের পিছন ঘুরিয়া ঘুরিয়া, শেষে উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে বরফের মধ্যে হরিণ যখন শীতে অবশ হইয়া পড়িল, তখন হারকিউলিস সেখান হইতে তাকে উদ্ধার করিয়া রাজার কাছে হাজির করিলেন।

ইহার পর রাজা হুকুম দিলেন, এরিম্যান্থাসের রাক্ষসবরাহকে মারিতে হইবে। সে বরাহ খুবই ভীষণ বটে, কিন্তু তাকে মারিতে হারকিউলিসের বিশেষ কোন ক্লেশ হইবার কথা নয়। তা ছাড়া, বরাহ পলাইবার পাত্র নয়, সুতরাং তার জন্য দেশ বিদেশে ছুটিবারও দরকার হয় না। হারকিউলিস সহজেই কার্যোদ্ধার করিতে পারিতেন, কিন্তু মাঝ হইতে একদল হতভাগা সেণ্টর আসিয়া তাঁর সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া বসিল। হারকিউলিস তখন সেই হাইড্রার রক্ত-মাখান বিষবাণ ছুঁড়িয়া তাদের মারিতে লাগিলেন। এদিকে বৃদ্ধ চীরণের কাছে খবর গিয়াছে যে, হারকিউলিস নামে কে একটা মানুষ আসিয়া সেণ্টরদের মারিয়া শেষ করিল। চীরণ তখনই ঝগড়া থামাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিতেছেন, এমন সময়, হঠাৎ হারকিউলিসের একটা তীর ছুটিয়া তাঁর গায়ে বিঁধিয়া গেল। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল, হারকিউলিসও অস্ত্র ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। সেণ্টরেরা অনেকরকম ঔষধ জানে, হারকিউলিসও তাঁর গুরুর কাছে অস্ত্রাঘাতের নানারকম চিকিৎসা শিখিয়াছেন—কিন্তু সে বিষবাণ এমন সাংঘাতিক, তাঁর কাছে কোন চিকিৎসাই খাটিল না। চীরণ আর বাঁচিলেন না। এবার হারকিউলিস তাঁর কাজ সারিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণ মনে গুরুর কথা ভাবিতে ভাবিতে দেশে ফিরিলেন।

হারকিউলিস একা সেণ্টরদের যুদ্ধে হারাইয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র

হইয়া পড়িল। সকলে বলিল, "হারকিউলিস না জানি কত বড় বীর! এমন আশ্চর্য কীর্তির কথা আমরা আর শুনি নাই।" আসলে কিন্তু হারকিউলিসের বড় বড় কাজ এখনও কিছুই করা হয় নাই—তাঁর কীর্তির পরিচয় সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

বরাহ মারিয়া হারকিউলিস অল্পই বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইলেন—কারণ তারপরই এলিস নগরের রাজা আগিয়াসের গোয়ালঘর সাফ করিবার জন্য তাঁহার ডাক পড়িল। আগিয়াসের প্রকাণ্ড গোয়ালঘরে অসংখ্য গরু, কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া সে ঘর কেহ ঝাঁট দেয় না, ধোয় না—সুতরাং তাহার চেহারাটি তখন কেমন হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখ। গোয়ালঘরের অবস্থা দেখিয়া হারকিউলিস ভাবনায় পড়িলেন। প্রকাণ্ড ঘর, তাহার ভিতর হাঁটিয়া দেখিতে গেলেই ঘণ্টাখানেক সময় যায়। সেই ঘরের ভিতর হয়ত বিশ বৎসরের আবর্জনা জমিয়াছে—অথচ একজন মাত্র লোকে তাকে সাফ করিবে। ঘরের কাছ দিয়া আলফিউস্ নদী স্রোতের জোরে প্রবল বেগে বহিয়া চলিয়াছে—হারকিউলিস ভাবিলেন—'এই ত চমৎকার উপায় হাতের কাছেই রহিয়াছে!' তিনি তখন একাই গাছ পাথরের বাঁধ বাঁধিয়া স্রোতের মুখ ফিরাইয়া, নদীটাকে সেই গোয়ালঘরের উপর দিয়া চালাইয়া দিলেন। নদী হু হু শব্দে নূতন পথে বহিয়া চলিল, বিশ বৎসরের জঞ্জাল মুহূর্তের মধ্যে ধুইয়া সাফ হইয়া গেল। তারপর যেখানকার নদী সেখানে রাখিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন।

এদিকে ক্রীটদ্বীপে আর এক বিপদ দেখা দিয়াছে। জলের দেবতা নেপচুন সে দেশের রাজাকে এক প্রকাণ্ড ষাঁড় উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই জন্তুটিকে তুমি দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া বলি দাও।" কিন্তু ষাঁড়টি এমন আশ্চর্যরকম সুন্দর যে তাকে বলি দিতে রাজার মন সরিল না—তিনি তার বদলে আর একটি ষাঁড় আনিয়া বলির কাজ সারিলেন। নেপচুন সমুদ্রের নীচে থাকিয়াও এ সমস্তই জানিতে পারিলেন। তিনি তাঁর ষাঁড়কে আদেশ দিলেন, "যাও! এই দুষ্ট রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়া ইহার অবাধ্যতার সাজা দাও।" নেপচুনের আদেশে সেই সর্বনেশে ষাঁড় পাগলের মত চারিদিকে ছুটিয়া সারাটি রাজ্য উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। একে দেবতার ষাঁড়, তার উপর যেমন পাহাড়ের মত দেহখানি, তেমনই আশ্চর্য তার শরীরের তেজ—কাজেই রাজ্যের লোক প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার জন্য ব্যস্ত। এমন জন্তুকে বাগাইবার জন্য ত হারকিউলিসের ডাক পড়িবেই। হারকিউলিসও অতি সহজেই তাকে শিং ধরিয়া মাটিতে আছড়াইয়া একেবারে পোঁটলা বাঁধিয়া রাজসভায় নিয়া হাজির করিলেন। রাজা ইউরিসথিউসের মেয়ে বাপের বড় আদুরে। সে একদিন আব্দার ধরিল তাকে হিপোলাইটের চন্দ্রহার আনিয়া দিতে হইবে। হিপোলাইট এসেজন্‌দের রানী। এসেজন্‌দের দেশে কেবল মেয়েদেরই রাজত্ব। বড় সর্বনেশে মেয়ে তারা—সর্বদাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, পৃথিবীর কোন মানুষকে তারা ডরায় না। কিন্তু হারকিউলিসকে তারা খুব খাতির সম্মান করিয়া তাদের রানীর কাছে লইয়া গেল। হারকিউলিস তখন রানীর কাছে তাঁর প্রার্থনা জানাইলেন। রানী বলিলেন, "আজ তুমি খাও-দাও, বিশ্রাম কর, কাল অলঙ্কার লইতে আসিও।" হারকিউলিসের সৎমা জুনো দেবী দেখিলেন, নেহাৎ সহজেই বুঝি এবারের কাজটা উদ্ধার হইয়া যায়। তিনি নিজে এসেজন্ সাজিয়া এসেজন্ দলে ঢুকিয়া, সকলকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "এই যে লোকটি রানীর কাছে অলঙ্কার ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে ইহাকে তোমরা বড় সহজ পাত্র মনে করিও না। আসলে কিন্তু এ লোকটা আমাদের রানীকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে চায়। অলঙ্কার-টলঙ্কার ওসকল মিথ্যা কথা—

কেবল তোমাদের ভুলাইবার জন্য।''. তখন সকলে রুখিয়া একেবারে মার মার শব্দে হারকিউলিসকে আক্রমণ করিল। হারকিউলিস একাকী গদা হাতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর এসেজন্‌রা বুঝিল, হারকিউলিসের সঙ্গে পারিয়া উঠা তাহাদের সাধ্য নয়। তখন তাহারা রানীর চন্দ্রহার হারকিউলিসকে দিয়া বলিল, ''যে অলঙ্কার তুমি চাহিয়াছিলে, এই লও। কিন্তু তুমি এদেশে আর থাকিতে পাইবে না।'' হারকিউলিসের কাজ উদ্ধার হইয়াছে, তাঁর আর থাকিবার দরকার কি? তিনি তখনই তাদের নমস্কার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ইউরিসথিউস্‌ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ''হারকিউলিস! আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি আমার জন্য আটটি বড় কাজ করিলে, এখন আর চারিটি কাজ করিলে তোমার ছুটি। প্রথম কাজ এই যে, স্টাইমফেলাসের সমুদ্রতীরে যে বড় বড় লৌহমুখ পাখি আছে, সেগুলাকে মারিতে হইবে।'' হারকিউলিস হাইড্রার রক্তমাখা বিষাক্ত তীর ছুঁড়িয়া সহজেই পাখিগুলাকে মারিয়া শেষ করিলেন।

ইহার পর তিনি রাজার হুকুমে গেরিয়ানিস নামে এক দৈত্যের গোয়াল হইতে তার গরুর দল কাড়িয়া আনিলেন। পথে ক্যাকাস্‌ নামে একটা কদাকার দৈত্য কয়েকটা গরু চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। হারকিউলিস তাকে তার বাসা পর্যন্ত তাড়া করিয়া, শেষে গদার বাড়িতে তাহার মাথা গুঁড়াইয়া দেন।

পশ্চিমের দেবতা সন্ধ্যাতারার মেয়েদের নাম হেস্‌পেরাইডিস্‌। লোকে বলিত, তাদের বাগানে আপেল গাছে সোনার ফল ফলে। একদিন রাজা সেই ফল হারকিউলিসের কাছে চাহিয়া বসিলেন। এমন কঠিন কাজ হারকিউলিস আর করেন নাই। ফলের কথা সকলেই জানে, কিন্তু কোথায় যে সে ফল, আর কোথায় যে সে আশ্চর্য বাগান, কেউ তাহা বলিতে পারে না। হারকিউলিস দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া কেবলই জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু কেউ তার জবাব দিতে পারে না। কত দেশের কত রকম লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হইল, সকলেই বলে, ''হাঁ, সেই ফলের কথা আমরাও শুনিয়াছি, কিন্তু কোথায় সে বাগান তাহা জানি না।'' এই রূপে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন হারকিউলিস এক নদীর ধারে আসিয়া দেখিলেন, কয়েকটি মেয়ে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে। হারকিউলিস বলিলেন, ''ওগো, তোমরা হেস্‌পেরাইডিসের বাগানের কথা জান? সেই যেখানে আপেল গাছে সোনার ফল ফলে?'' মেয়েরা বলিল, ''আমরা নদীর মেয়ে, নদীর জলে থাকি—আমরা কি দুনিয়ার খবর রাখি? আসল খবর যদি চাও তবে বুড়ার কাছে যাও।'' হারকিউলিস বলিলেন, ''কে বুড়া? সে কোথায় থাকে?'' মেয়েরা বলিল, ''সমুদ্রের থুড়্‌থুড়ে বুড়া, যার সবুজ রঙের জটা, যার গায়ে মাছের মত আঁশ, যার হাত-পাগুলো হাঁসের মত চ্যাটাল—সে বুড়া যখন তীরে ওঠে তখন যদি তাকে ধরিতে পার, তবে সে তোমায় বলিতে পারিবে পৃথিবীর কোথায় কি আছে। কিন্তু খবরদার! বুড়া বড় সেয়ানা, তাকে ধরিতে পারিলে খবরটা আদায় না করিয়া ছেড়ো না।'' হারকিউলিস তাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়া বুড়ার খবর লইতে চলিলেন। সমুদ্রের তীরে তীরে খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন হারকিউলিস দেখিলেন, শ্যাওলার মত পোশাক পরা কে একজন সমুদ্রের ধারে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তাহার সবুজ চুল আর গায়ের আঁশেই তার পরিচয় পাইয়া হারকিউলিস এক লাফে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, ''বুড়া! হেস্‌পেরাইডিসের বাগানের সন্ধান বল, নহিলে তোমায় ছাড়িব না।'' এই বলিতে না বলিতেই বুড়া তাঁর সামনেই কোথায় মিলাইয়া গেল, তার জায়গায় একটা হরিণ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। হারকিউলিস

বুঝিলেন এসব বুড়ার শয়তানী, তাই তিনি খুব মজবুত করিয়া হরিণের ঠ্যাং ধরিয়া থাকিলেন। হরিণটা তখন একটা পাখি হইয়া করুণ স্বরে আর্তনাদ আর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। হারকিউলিস তবু ছাড়িলেন না। তখন পাখিটা একটা তিন-মাথাওয়ালা কুকুরের রূপ ধরিয়া তাঁকে কামড়াইতে আসিল। হারকিউলিস তখন তার ঠ্যাংটা আরও শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তাতে কুকুরটা চিৎকার করিয়া গেরিয়ানের মূর্তিতে দেখা দিল। গেরিয়ানের শরীরটা মানুষের মত, কিন্তু তার ছয়টি পা। এক পা হারকিউলিসের মুঠার মধ্যে, সেইটা ছাড়াইবার জন্য সে পাঁচ পায়ে লাথি ছুঁড়িতে লাগিল।

তাহাতেও ছাড়াইতে না পারিয়া সে প্রকাণ্ড অজগর সাজিয়া হারকিউলিসকে গিলিতে আসিল। হারকিউলিস ততক্ষণে ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন, তিনি সাপটাকে এমন ভীষণভাবে টুঁটি চাপিয়া ধরিলেন যে, প্রাণের ভয়ে বুড়া তাহার নিজের মূর্তি ধরিয়া বাহির হইল। বুড়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "তুমি কোথাকার অভদ্র হে! বুড়া মানুষের সঙ্গে এরকম বেয়াদবি কর।" হারকিউলিস বলিলেন, "সে কথা পরে হইবে, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।" বুড়া তখন বেগতিক দেখিয়া বলিল, "যার কাছে গেলে তোমার কাজটি উদ্ধার হইবে, আমি তার সন্ধান বলিতে পারি। এইদিকে আফ্রিকার সমুদ্রতীর ধরিয়া বরাবর চলিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি এটলাস দৈত্যের দেখা পাইবে। এমন দৈত্য আর দ্বিতীয় নাই। দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর সমস্ত আকাশটিকে ঘাড়ে করিয়া সে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। এক মুহূর্ত তাহার কোথাও যাইবার যো নাই, তাহা হইলেই আকাশ ভাঙিয়া পৃথিবীর উপর পড়িবে। মেঘের উপরে কোথায় আকাশ পর্যন্ত তাহার মাথা উঠিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে দুনিয়ার সবই সে দেখিতে পায়। সে যদি খুশী মেজাজে থাকে, তবে হয়ত তোমার সোনার ফলের কথা বলিতে পারে।" হারকিউলিস তাঁর গদা ঘুরাইয়া বলিলেন, "যদি খুশী মেজাজে না থাকে, তবুও সোনার ফলের কথা তাকে বলাইয়া ছাড়িব।"

সমুদ্রের বুড়ার কাছে এটলাসের খবর আদায় করিয়া হারকিউলিস তাহার কথা মত আফ্রিকায় উপকূল ধরিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কত পাহাড় নদী, কত সহর গ্রাম পার হইয়া, তিনি এক অদ্ভুত দেশে আসিলেন। সেখানে মানুষগুলা অসম্ভবরকম বেঁটে। শত্রুর ভয় তাদের এতই বেশী যে, তাহাদের দেশ রক্ষার জন্য তারা এক দৈত্যের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া, তারই উপর পাহারা দিবার ভার রাখিয়াছে। এই দৈত্যের নাম এণ্টিয়াস—পৃথিবী তার মা।

দূর হইতে হারকিউলিসকে গদা ঘুরাইয়া আসিতে দেখিয়া, বামনদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ বাধিয়া গেল। তারা চিৎকার করিয়া এণ্টিয়াসকে সাবধান করিয়া দিল। এণ্টিয়াসও তাহাই চায়। তার ভয়ে বহুদিন পর্যন্ত লোকজন কেউ সে দিকে ঘেঁষে না, তাই হারকিউলিসকে দেখিয়াই সে একেবারে গদা উঠাইয়া "মার্‌ মার্‌" করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হারকিউলিসও তৎক্ষণাৎ তার গদা এড়াইয়া, এক বাড়িতে তাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! মাটিতে পড়িবামাত্র তার তেজ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সে আবার উঠিয়া ভীষণ তেজে হারকিউলিসকে মারিতে উঠিল। হারকিউলিস আবার তাকে ঘাড়ে ধরিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু মাটি ছোঁয়ামাত্র আবার তার অসম্ভব তেজ বাড়িয়া গেল, সে আবার হুঙ্কার দিয়া লাফাইয়া উঠিল। হারকিউলিস ত জানে না যে পৃথিবীর বরে মাটি ছুঁইলেই তাহার তেজ বাড়ে। তিনি বার বার তাকে নানারকম মারপ্যাঁচ দিয়া মাটিতে ফেলেন,

বার বারই কোথা হইতে তার নূতন তেজ দেখা দেয়। তখন তিনি দৈত্যটাকে ঘাড়ে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া দুই হাতে তাকে এমন চাপিয়া ধরিলেন যে, সেই চাপের চোটে তার দম বাহির হইয়া প্রাণসুদ্ধ উড়িয়া গেল। তখন তার দেহটাকে তিনি পাহাড় পর্বত ডিঙ্গাইয়া কোথায় ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

তখন বামনেরা সবাই মিলিয়া ভয়ানক কোলাহল আর কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। কেহ "হায় হায়" করিয়া চুল ছিঁড়িতে লাগিল, কেহ প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কেহ আস্ফালন করিয়া বলিল, "এস, আমরা সকলে ইহার প্রতিশোধ লই।" হারকিউলিস তাদের বলিলেন, "ভাইসকল, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নাই। ওই হতভাগা খামখা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, তাই উহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাজা দিয়াছি। তোমাদের আমি কোন অনিষ্ট করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, সেখান হইতে সেই সোনার আপেলের সন্ধানে এটলাস দৈত্যের খবর লইতে চলিলেন।

এই ভাবে পথ চলিতে চলিতে শেষে হারকিউলিস সত্য সত্যই এটলাসের দেখা পাইলেন। সেই সমুদ্রের বুড়া যেমন বর্ণনা করিয়াছিল, ঠিক সেইরকমভাবে সেই বিরাট দৈত্য আকাশটাকে মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হারকিউলিসকে দেখিয়া সে মেঘের ডাকের মত গম্ভীর গলায় বলিল, "আমি এটলাস—আমি আকাশকে মাথায় ধরিয়া রাখি—আমার মত আর কেউ নাই।" হারকিউলিস তাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনার সন্ধানে আমি দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াছি—এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে, সেইটি জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" দৈত্য বলিল, "এই আকাশের নীচে মেঘের উপরে থাকিয়া আমার চোখ সব দেখে, সব জানে—যাহা জানিতে চাও আমাকে জিজ্ঞাসা কর।" হারকিউলিস বলিলেন, "তবে বলিয়া দিন, হেস্‌পেরাইডিসের বাগানে যে সোনার ফল ফলে, সেই ফল আমি কেমন করিয়া পাইতে পারি।" দৈত্য হইলেও এটলাসের মেজাজটি বড় ভাল। সে বলিল, "তাহাতে আর মুশকিল কি? এই আকাশ-টাকে তুমি একটুক্ষণ ধরিয়া রাখ, আমি এখনই তোমায় সে ফল আনিয়া দিতেছি।" হারকিউলিস ভাবিলেন, "এ বড় চমৎকার কথা। কত কীর্তি সঞ্চয় করিয়াছি, কিন্তু আকাশটাকে ঠেকাইয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিবার এমন সুযোগ আর কোনদিন পাইব না।" তাই তিনি দৈত্যের কথায় তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন।

কত হাজার হাজার বছর এটলাসের ঘাড়ে আকাশের ভার চাপান রহিয়াছে, শীত গ্রীষ্ম, রোদ বৃষ্টি সব সহিয়া বেচারা সেই বোঝা মাথায় রাখিয়া আসিতেছে। এতদিন পরে হারকিউলিসের কৃপায় সে একটু জিরাইয়া লইবার সুযোগ পাইল। মনের আনন্দে সে খুব খানিকটা লাফাইয়া, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া, তারপর লম্বা পা ফেলিয়া চক্ষের নিমেষে হেস্‌পেরাইডিসের বাগানে গিয়া হাজির। সেখানে 'ড্রেগন' মারিয়া বাগান খুঁজিয়া সোনার আপেল তুলিয়া আনিতে তার একটুও বিলম্ব হইল না। তখন তাহার মনে হঠাৎ এক কুবুদ্ধি জাগিল। সে ভাবিল, কেন আর মিছামিছি আকাশের বোঝা লইয়া থাকি। এই মানুষটার উপরেই এখন আকাশের ভার দিলেই হয়। এই ভাবিয়া সে হারকিউলিসকে বলিল, "ওহে পৃথিবীর মানুষ, তোমার গায়ে ত বেশ শক্তি দেখিতেছি। এখন হইতে তুমিই আকাশটাকে ঠেকাইবার ভার লও না কেন? আমি বরং তোমার রাজার কাছে আপেলগুলা দিয়া আসি!"

হারকিউলিস দেখিলেন, বেগতিক! এ হতভাগা একটুক্ষণ ছুটি পাইয়া আর কাজে

ফিরিতে চায় না। তিনি একটু চালাকি করিয়া বলিলেন, "তবে ভাই একটু আকাশ-টাকে ধর ত, আমার এই সিংহচর্মটিকে কাঁধের উপর ভাল করিয়া পাতিয়া লই।" বোকা দৈত্য তাড়াতাড়ি ফলগুলা রাখিয়া, আবার নিজের কাঁধ দিয়া আকাশটাকে আগলাইয়া ধরিল। হারকিউলিসও তৎক্ষণাৎ ফলগুলা উঠাইয়া লইয়া, দৈত্যকে এক লম্বা নমস্কার দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। দৈত্য বেচারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

এত পরিশ্রম করিয়া সোনার ফল আনিয়াও হারকিউলিসের দাসত্ব ঘুচিল না। রাজা ইউরিসথিউস্‌ বলিলেন, "আর একটি কাজ তোমায় করিতে হইবে—তুমি পাতালে গিয়া যমের কুকুর সারবেরাস্‌কে বাঁধিয়া আন।" হারকিউলিস পাতালে গিয়া, সেই ভীষণমূর্তি কুকুরকে ধরিয়া রাজার সম্মুখে হাজির করিলেন। তার তিন মাথায় তিনটি মুখ, সেই মুখ দিয়া বিষ ঝরিয়া পড়িতেছে, নাকে চোখে আগুনের মত ধোঁয়া—তার মূর্তি দেখিয়া ভয়ে রাজার প্রাণ উড়িবার উপক্রম হইল—তিনি একটা জালার মধ্যে ঢুকিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—"ওটাকে শীঘ্র সরাইয়া লও।" হারকিউলিস তখন আবার যেখানকার কুকুর সেইখানে রাখিয়া আসিলেন।

এতদিনে হারকিউলিস তাঁর স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইলেন। তখন তিনি নিজের ইচ্ছামত ত্রিভুবন ঘুরিয়া আরও অদ্ভুত কাজ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কত বড় বড় যুদ্ধে সাহায্য করিয়া, কত বীরত্বের কীর্তিতে যোগ দিয়া তিনি আপনার আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। পাহাড় উপড়াইয়া জিব্রাল্টার প্রণালীর পথ খুলিয়া তিনি সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র জুড়িয়া দিলেন। সুন্দরী আলসেবিটস নিজের প্রাণ দিয়া স্বামীকে অমর করিতে চাহিয়াছিলেন, হারকিউলিস যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই আলসেবিটসকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে কাড়িয়া আনিলেন।

এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ঈনিয়ুসের সুন্দরী কন্যা ডেয়ানীরাকে দেখিয়া হারকিউলিস তাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কিন্তু, কোথা হইতে এক জলদেবতা আসিয়া তাহাতে গোল বাধাইয়া দিল। সে বলিল, "ঈনিয়ুস আমাকে কন্যা দান করিবেন বলিয়াছেন, তুমি কোথাকার কে যে মাঝ হইতে দাবী বসাইতে আসিয়াছ?" তখন ডেয়ানীরার অনুমতি লইয়া হারকিউলিস জলদেবতার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। সে এক অদ্ভুত দেবতা, আপন ইচ্ছামত চেহারা বদলায়। প্রথমেই হারকিউ-লিসের কাছে খুব খানিক চড়চাপড় খাইয়া, সে ষাঁড়ের মূর্তি ধরিয়া তাঁকে গুঁতাইতে আসিল। হারকিউলিস তখন তার শিং ভাঙিয়া দিলেন; সে পলাইয়া আবার আর এক মূর্তিতে ফিরিয়া আসিল। এইরূপ বহুক্ষণ যুদ্ধের পর হারকিউলিস তাকে এমন কাবু করিয়া ফেলিলেন যে, প্রাণের দায়ে সে দেশ ছাড়িয়া চম্পট দিল।

তারপর হারকিউলিস ডেয়ানীরাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। কত রাজ্য কত দেশ ঘুরিয়া, একদিন তাঁরা এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীতে ভয়ানক স্রোত দেখিয়া হারকিউলিস ডেয়ানীরাকে পার করিবার উপায় ভাবিতেছেন; এমন সময়ে নেসাস নামে এক বুড়ো সেণ্টর (মানুষ-ঘোড়া) আসিয়া বলিল, "আমি এই মেয়েটিকে পিঠে করিয়া পার করিয়া দিব।" ডেয়ানীরা সেণ্টরের পিঠে চড়িয়া নদী পার হইলেন, হারকিউলিসও একহাতে তাঁহার তীর ধনুক জল হইতে উঠাইয়া, আর একহাতে ঢেউ ঠেলিয়া পার হইতে লাগিলেন। নদীর ওপারে গিয়া হতভাগা নেসাস ভাবিল, "আহা! এমন সুন্দরী মেয়ে কেন এই মানুষটার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়? তাহার চাইতে ইহাকে লইয়া আমাদের দেশে পলাইয়া

যাই না?'' এই ভাবিয়া সে ডেয়ানীরাকে লইয়া এক ছুট্ দিল। ডেয়ানীরার চিৎকারে হারকিউলিস মাথা তুলিয়া চাহিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জলের ভিতর হইতেই তীর ছুঁড়িয়া নেসাসের মর্মভেদ করিয়া ফেলিলেন। মরিবার সময় দুষ্ট সেণ্টর অত্যন্ত ভাল মানুষের মত অনেক অনুতাপ করিয়া ডেয়ানীরাকে বলিয়া গেল, ''আমার ঘাড়ের উপর হইতে এই জামাটি খুলিয়া তুমি রাখিয়া দাও। যদি তোমার স্বামীর ভালবাসা কোনদিন কমিতে দেখ, তবে এই জামা তাহাকে পরাইলেই তার সমস্ত ভালবাসা আবার ফিরিয়া আসিবে।'' ডেয়ানীরা তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া জামাটি পরম যত্নে লুকাইয়া রাখিলেন। ততক্ষণে হারকিউলিসও নদী পার হইয়া আসিয়াছেন, দুইজনে আবার চলিতে লাগিলেন।

তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন কি একটা কাজের জন্য দূর দেশের এক রাজসভায় হারকিউলিসের যাওয়া দরকার হইল। তিনি ডেয়ানীরাকে রাখিয়া সেই যে বাহির হইলেন, তারপর কত দিন গেল, কত মাস গেল, হারকিউলিস আর ফিরিলেন না। ডেয়ানীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, ''তবে কি হারকিউলিস আমায় ভুলিয়া গেলেন? আর কি তিনি আমায় ভালবাসেন না?'' তিনি দূত পাঠাইলেন, তারা আসিয়া বলিল, ''হারকিউলিস বেশ ভালই আছেন—রাজসভায় নানা আমোদ-প্রমোদে তাঁর দিন কাটিতেছে।'' শুনিয়া ডেয়ানীরা সেই সেণ্টরের দেওয়া জামাটি বাহির করিলেন। সোনার মত ঝক্‌ঝকে জামা, সেণ্টরের মৃত্যু সময়ে রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। সেই জামা তিনি লাইকাস নামে এক দূতকে দিয়া হারকিউলিসের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—ভাবিলেন, তাহা হইলে হারকিউলিসকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। জামার কাহিনী ত হারকিউলিস জানেন না, সেণ্টরের রক্তে যে তাহা বিষাক্ত হইয়া আছে, এরূপ সন্দেহও তাঁর মনে জাগিল না, তিনি নিশ্চিন্ত মনে সেই জামা পরিলেন। জামা পরিবামাত্র তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, তাঁর শিরায় শিরায় যেন আগুনের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি জামা ছাড়াইতে গিয়া দেখেন যে সর্বনাশ, জামা তাঁহার শরীরের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে; গায়ের চামড়া উঠিয়া আসে, তবু জামা ছাড়িতে চায় না। রাগে ও যন্ত্রণায় পাগল হইয়া তিনি দূতকে ধরিয়া সমুদ্রে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। তারপর সেণ্টরের বিষ এড়াইবার উপায় নাই দেখিয়া তিনি তাঁর অনুচরদের ডাকিয়া বলিলেন, ''তোমরা শীঘ্র কাঠ আন, আগুন জ্বাল, আমি এখন মরিতে ইচ্ছা করি।'' শুনিয়া সকলে কাঁদিতে লাগিল, কেহ চিতা জ্বালাইতে প্রস্তুত হইল না। তখন তিনি আপন হাতে গাছ উপ্‌ড়াইয়া প্রকাণ্ড চিতা জ্বালাইয়া তাহাতে শুইলেন এবং তাঁর এক বন্ধুকে বলিলেন, ''তুমি যদি আমার বন্ধু হও, তবে আমার কথা শুনিয়া এই চিতায় আগুন দাও। বন্ধুতার পুরস্কারস্বরূপ আমার বিষমাখান অব্যর্থ তীরগুলি তোমায় দিলাম।''

তারপর চিতায় আগুন দেওয়া হইল, দেবতারা জয়গান করিয়া তাঁহাকে স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে ডাকিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে অমর করিয়া আকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

আশ্চর্য ছবি

জাপান দেশে সেকালের এক চাষা ছিল, তার নাম কিকিৎসুম। ভারি গরীব চাষা, আর যেমন গরীব তেমনি মূর্খ। দুনিয়ার সে কোনও খবরই জানত না; জানত কেবল চাষবাসের কথা, গ্রামের লোকেদের কথা, আর গ্রামের যে বুড়ো 'বঞ্জে' (পুরোহিত), তার ভাল ভাল উপদেশের কথা। চাষার যে স্ত্রী, তার নাম লিলিৎসী। লিলিৎসী চমৎকার ঘরকন্না করে, বাড়ির ভিতর সব তক্‌তকে ঝর্‌ঝরে করে গুছিয়ে রাখে, আর রান্না করে এমন সুন্দর যে চাষার মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না। কিকিৎসুম কেবলই বলে, "এত আমার বয়স হল, এত আমি দেখলাম শুনলাম, কিন্তু রূপে গুণে এর মত আর একটি কোথাও দেখতে পাইনি।" লিলিৎসী সে কথা যত শোনে ততই খুশী হয়।

একদিন হয়েছে কি, কোথাকার এক শহুরে বড়মানুষ এসেছেন সেই গ্রাম দেখতে; তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট্ট মেয়েটি, আর মেয়েটির ছিল একটি ছোট্ট আয়না। রাস্তায় চলতে চলতে সেই আয়নাটা সেই মেয়ের হাত থেকে কখন পড়ে গেছে, কেউ তা দেখতে পায়নি। কিকিৎসুম যখন চাষ করে বাড়ি ফিরছে তখন সে দেখতে পেল, রাস্তার ধারে ঘাসের মধ্যে কি একটা চক্‌চক্ করছে। সে তুলে দেখল, একটা অদ্ভুত চ্যাপ্টা চৌকোনা জিনিস! সে কিনা কখনও আয়না দেখেনি, তাই সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, এটা আবার কি রে! নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে হঠাৎ সেই আরসির ভিতরে নিজের ছায়ার দিকে তার নজর পড়ল। সে দেখল কে একজন অচেনা লোক তার দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছে। দেখে সে এমন চম্‌কিয়ে উঠল, যে আর একটু হলেই আয়নাটা তার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে সে ঠিক করল, এটা নিশ্চয় আমার বাবার ছবি—দেবতারা আমার উপর খুশী হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার বাবা মারা গিয়েছেন সে অনেক দিনকার কথা, কিন্তু তবু তার মনে হল, হ্যাঁ এই রকমই ত তাঁর চেহারা ছিল। তারপর—কি আশ্চর্য! সে চেয়ে দেখল তার নিজের গলায় যেমন একটা রূপার মাদুলি, ছবির গলায়ও ঠিক তেমনি! এ মাদুলি ত তার বাবারই ছিল, তিনি ত সর্বদাই এটা গলায় দিতেন,—তবে ত এটা তার বাবারই ছবি।

তখন কিকিৎসুম করল কি, আয়নাটাকে যত্ন করে কাগজ দিয়ে মুড়ে বাড়ি নিয়ে এল। বাড়ি এসে তার ভাবনা হল, ছবিটাকে রাখে কোথায়? তার স্ত্রীর কাছে যদি রেখে দেয়, তবে সে হয়ত পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করবে, আর গ্রামসুদ্ধ সবাই এসে ছবি দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়বে। গ্রামের মূর্খগুলো ত সে ছবির মর্যাদা বুঝবে না, তারা আসবে কেবল 'তামাসা' দেখবার জন্য! তা হবে না—তার বাবার ছবি নিয়ে ছেলেবুড়ো সবাই এসে নোংরা হাতে নাড়বে-চাড়বে তা কিছুতেই হতে পারবে না। এ ছবি কাউকে দেখান হবে না, লিলিৎসীকেও তার কথা বলা হবে না।

কিকিৎসুম বাড়িতে এসে একটা বহুকালের পুরানো ফুলদানির মধ্যে আরসিটাকে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু তার মনটা আর কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। খানিকক্ষণ পরে পরেই সে একবার করে দেখে যায় ছবিটা আছে কি না। তার পরের দিন সে মাঠে

কাজ করছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল, 'ছবিটা আছে ত?' অমনি সে কাজকর্ম ফেলে দৌড়ে দেখতে এল। দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে যাবে, এমন সময় লিলিৎসী সেই ঘরে এসে পড়েছে। লিলিৎসী বলল, "এ কী! তুমি দুপুরবেলায় ফিরে এলে যে? অসুখ করেনি ত?" কিকিৎসুম থতমত খেয়ে বলল, "না না, হঠাৎ তোমায় দেখতে ইচ্ছা করল তাই বাড়ি এলাম।" শুনে লিলিৎসী ভারী খুশী হয়ে গেল। তারপর আর একদিন এইরকম লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি দেখতে এসে কিকিৎসুম আবার তার স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ল। সেদিনও সে বলল, "তোমার ঐ সুন্দর মুখখানা বার বার মনে হচ্ছিল, তাই একবার ছুটে দেখতে এলাম।" সেদিন কিন্তু লিলিৎসীর মনে একটু কেমন খট্‌কা লাগল। সে ভাবল, 'কই, এতদিন ত কাজ করতে করতে একবারও আমায় দেখতে আসেনি, আজকাল এরকম হচ্ছে কেন?'

তারপর আর একদিন কিকিৎসুম এসেছে ছবি দেখতে। সেদিন লিলিৎসী টের পেয়েও দেখা দিল না—চুপি চুপি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল—কিকিৎসুম সেই ফুলদানির ভিতর থেকে কি একটা জিনিস বার করে দেখল, তারপর খুব খুশী হয়ে যত্ন করে আবার রেখে দিল। কিকিৎসুম চলে যেতেই লিলিৎসী দৌড়ে এসে ফুল-দানির ভিতর থেকে কাগজে মোড়া আরসিটাকে টেনে বার করল। তারপর তার মধ্যে তাকিয়ে দেখে অতি সুন্দর এক মেয়ের ছবি!

তখন যে তার রাগটা হল—সে রাগে গজ্‌গজ্‌ করে বলতে লাগল, "এইজন্যে রোজ বাড়িতে আসা হয়—আবার আমায় বলেন 'তোমার মুখখানা দেখতে এলাম', 'তোমার মত সুন্দর আর হয়ই না।' মাগো! কি বিশ্রী মেয়েটা! হোঁৎকা মুখ, থ্যাব্‌ড়া নাক, ট্যার্‌চা চোখ,—আবার আমার মত করে চুল বাঁধা হয়েছে! দেখ না কি রকম হিংসুটে চেহারা! এই ছবি আবার আদর করে তুলে রেখেছেন—আর রোজ রোজ আহ্লাদ করে দেখতে আসেন।" লিলিৎসীর চোখ ফেটে জল আসল, সে মাটিতে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর চোখ মুছে আর একবার আরসির দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়েটার কি ছিঁচকাঁদুনে চেহারা—এমন চেহারাও কেউ পছন্দ করে!" সে তখন আয়নাটাকে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখল।

সন্ধ্যার সময় কিকিৎসুম বাড়ি এসে দেখল, লিলিৎসী মুখ ভার করে মেঝের উপর বসে রয়েছে! সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "কি হয়েছে?" লিলিৎসী বলল, "থাক থাক, আদর দেখাতে হবে না—নাও তোমার সাধের ছবিখানা নাও। ওকে নিয়েই আদর ক'র, যত্ন ক'র, মাথায় ক'রে তুলে রাখো।" তখন কিকিৎসুম গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি যে আমার ছবিকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছ—জান ওটা আমার বাবার ছবি?" লিলিৎসী আরও রেগে বলল, "হ্যাঁ, তোমার বাবার ছবি! আমি কচি খুকি কিনা, একটা বলে দিলেই হল! তোমার বাবার কি অমনি আহ্লাদী মেয়ের মত চেহারা ছিল? তিনি কি আমাদের মতো ক'রে খোঁপা বাঁধতেন—" কথাটা শেষ না হতেই কিকিৎসুম বলল, "তুমি না দেখেই রাগ করছ কেন? একবার ভাল ক'রে দেখই না।" এই ব'লে কিকিৎসুম নিজে আবার দেখল, আরসির মধ্যে সেই মুখ।

তখন দুজনের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া বেধে গেল। কিকিৎসুম বলে ওটা তার বাবার ছবি, লিলিৎসী বলে ওটা একটা হিংসুটি মেয়ের ছবি। এইরকম তর্ক চলছে, এমন সময়ে গ্রামের যে বুড়ো 'বঞ্জে', সে তাদের গলার আওয়াজ শুনে দেখতে এল ব্যাপারখানা কি! পুরুতঠাকুরকে দেখে দুজনেই নমস্কার করে তার কাছে নালিশ লাগিয়ে দিল। কিকিৎসুম বলল, "দেখুন, আমার বাবার ছবি, সেদিন আমি রাস্তা

থেকে কুড়িয়ে পেলাম, আর ও কিনা বলে যে ওটা কোন্ এক মেয়ের ছবি।'' লিলিৎসী বলল, ''দেখলেন কি অন্যায়! এনেছেন একটা গোমড়ামুখী মেয়ের ছবি, আর আমায় বোঝাচ্ছেন, ঐ নাকি তাঁর বাবা!''

তখন 'বঞ্জে' ঠাকুর বললেন, ''দাও ত দেখি ছবিখানা।'' তিনি আরসি নিয়ে মিনিট পাঁচেক খুব গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আয়নাটাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, ''তোমরা ভুল বুঝেছ। এ হচ্ছে অতি প্রাচীন এক মহাপুরুষের ছবি। আমি দেখতে পাচ্ছি, ইনি একজন যে-সে লোক নন। দেখছ না, মুখে কি গম্ভীর তেজ, কি রকম বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য, আর কি সুন্দর প্রশান্ত অমায়িক ভাব। এ ছবিটা ত এমন করে রাখলে চলবে না; বড় মন্দির গ'ড়ে, তার মধ্যে পাথরের বেদী বানিয়ে, তার মধ্যে ছবিখানাকে রাখতে হবে—আর ফুলচন্দন ধূপধুনা দিয়ে তার সম্মান করতে হবে।''

এই ব'লে 'বঞ্জে' ঠাকুর আরসি নিয়ে চলে গেলেন। আর কিকিৎসুম আর লিলিৎসী ঝগড়া-টগড়া ভুলে খুশী হয়ে খেতে বসল।

অর্ফিয়ুস্

নয়টি বোন ছিলেন, তাঁহারা ছন্দের দেবী। গানের ছন্দ, কবিতার ছন্দ, নৃত্যের ছন্দ, সঙ্গীতের ছন্দ—সকলরকম ছন্দকলায় তাঁহাদের সমান আর কেহই ছিল না। তাঁহাদেরই একজন, দেবরাজ জুপিটারের পুত্র আপোলোকে বিবাহ করেন।

আপোলো ছিলেন সৌন্দর্যের দেবতা, শিল্প ও সঙ্গীতের দেবতা। তিনি যখন বীণা বাজাইয়া গান করিতেন তখন দেবতারা পর্যন্ত অবাক হইয়া শুনিতেন।

এমন বাপ-মায়ের ছেলে অর্ফিয়ুস্ যে গান-বাজনায় অসাধারণ ওস্তাদ হইবেন, সে আর আশ্চর্য কি? অর্ফিয়ুসের গুণের কথা দেশ-বিদেশে রটিয়া গেল—স্বয়ং আপোলো খুশী হইয়া তাঁহাকে নিজের বীণাটি দিয়া ফেলিলেন। পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে অর্ফিয়ুস্ বীণা বাজাইয়া ফিরিতেন আর সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিত। অর্ফিয়ুসের বীণার সুরে আকাশ যখন ভরিয়া উঠিত, তখন সুরের আনন্দে গাছে গাছে ফুল ফুটিত, সমুদ্রের কোলাহল থামিয়া যাইত, বনের পশু হিংসা ভুলিয়া অবাক হইয়া পড়িয়া থাকিত।

এই রকমে দেশে দেশে বীণা বাজাইয়া অর্ফিয়ুস্ ফিরিতেছেন এমন সময় একদিন ইউরিডিস নামে এক আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে তাঁহার বীণার সুরে মোহিত হইয়া দেখিতে আসিলেন, কে এমন সুন্দর বাজায়। ইউরিডিসকে দেখিবামাত্র অর্ফিয়ুসের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার আনন্দ বীণার ঝঙ্কারে ঝংকারে আকাশকে মাতাইয়া তুলিল। তন্ময় হইয়া সেই সংগীত শুনিতে শুনিতে ইউরিডিসের মন একেবারে গলিয়া গেল। তারপর ইউরিডিসের সহিত অর্ফিয়ুসের বিবাহ হইল; মনের আনন্দে দুইজনে দেশ-দেশান্তরে বেড়াইতে চলিলেন।

কিন্তু এ আনন্দ তাঁহাদের বেশীদিন থাকিল না। একদিন মাঠের মধ্যে এক বিষাক্ত সাপ ইউরিডিসকে কামড়াইয়া দিল এবং সেই বিষেই ইউরিডিসের মৃত্যু হইল। অর্ফিয়ুস্ তখন শোকে পাগলের মত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বীণার তারে হাহাকার করিয়া করুণ সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই ভাবিয়া

না পাইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে অর্ফিয়ুস্ একেবারে অলিম্পাস্ পর্বতের উপর আসিয়া পড়িলেন। সেখানে দেবরাজ বজ্রধারী জুপিটার তাঁহার দুঃখের গানে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "যাও, পাতালপুরীতে প্রবেশ করিয়া যমরাজ প্লুটোর নিকট তোমার স্ত্রীর জন্য নূতন জীবন ভিক্ষা করিয়া আন। কিন্তু জানিও, এ বড় দুঃসাধ্য কাজ; প্রাণের মায়া যদি থাকে, তবে এমন কাজে যাইবার আগে চিন্তা করিয়া দেখ।"

অর্ফিয়ুস্ নির্ভয়ে বীণা বাজাইতে বাজাইতে পাতালের দিকে চলিলেন। পাতালপুরীর সিংহদ্বারে যমরাজের ত্রিমুণ্ড কুকুর দিনরাত পাহারা দেয়। অর্ফিয়ুস্‌কে আসিতে দেখিয়া রাগে তাহার ছয় চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—তাহার মুখ দিয়া বিষাক্ত আগুন ফেনাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অর্ফিয়ুসের বীণার সুর যেমন তাহার কানে আসিয়া লাগিল, অমনি সে শান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। অর্ফিয়ুস্ অবাধে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

তখন পাতালপুরী কম্পিত করিয়া বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল। নরকের অন্ধকার ভেদ করিয়া সে সংগীত পাতালের অতল গুহায় প্রবেশ করিল। সেই শব্দে যমদূতের হুঙ্কার আর পাপীদের চিৎকার মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জলের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া অত্যাচারী ট্যান্টেলাস পিপাসায় পাগল,—পান করিতে গেলেই জল সরিয়া যায়! বীণার সংগীতে সে তাহার তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। মহাপাপী ইক্সিয়ন নরকের ঘুরন্ত চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এতদিন পরে বিশ্রাম পাইল, ঘুরন্ত চক্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। ধূর্ত নিষ্ঠুর সিসিফাস্ চিরকাল ধরিয়া পাহাড়ের উপর পাথর গড়াইয়া তুলিতেছে, যতবার তোলে ততবার পাথর গড়াইয়া পড়ে; সেও দারুণ শ্রমের দুঃখ ভুলিয়া সেই সংগীত শুনিতে লাগিল।

অর্ফিয়ুস্ যমরাজের সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যমরাজ প্লুটো ও রানী প্রসেরপিনা গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাদের পায়ের কাছে নিয়তিরা তিন বোনে জীবনের সুতা লইয়া খেলিতেছে। একজন সুতা টানিয়া ছাড়াইতেছে, একজন সেই সুতা পাকাইয়া জড়াইতেছে, আর একজন কাঁচি দিয়া পাকান সুতা ছাঁটিয়া ফেলিতেছে। অর্ফিয়ুসের সংগীতে যমরাজ সন্তুষ্ট হইলেন, নিয়তিরা প্রসন্ন হইল। তখন আদেশ হইল, "ইউরিডিসকে ফিরাইয়া দাও, সে পৃথিবীতে ফিরিয়া যাক। কিন্তু সাবধান অর্ফিয়ুস্! যমপুরীর সীমানা পার হইবার পূর্বে ইউরিডিসের দিকে ফিরিয়া চাহিও না—তবে কিন্তু সকলই পণ্ড হইবে।"

অর্ফিয়ুস্ মনের আনন্দে বীণা বাজাইয়া চলিলেন, তাঁহার পিছন পিছন ইউরিডিসও চলিলেন। যমপুরীর সীমানায় আসিয়া অর্ফিয়ুস্ মনের আনন্দে নিষেধের কথা ভুলিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। অমনি তাঁহার চোখের সম্মুখেই ইউরিডিসের অপূর্বসুন্দর মূর্তি বিদায়ের ম্লান হাসি হাসিয়া শূন্যের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

তারপরে অর্ফিয়ুস্ আর কি করিবেন? তিনি বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাগলের মত সন্ধান করিতে লাগলেন। তাঁহার মনে হইল, বনের আড়ালে আড়ালে, পর্বতের গুহায় গুহায় ইউরিডিস লুকাইয়া আছেন। মনে হইল, গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের নিশ্বাস বলিতেছে "ইউরিডিস, ইউরিডিস—" পাখিরা শাখায় শাখায় করুণ সুরে গান করিতেছে "ইউরিডিস, ইউরিডিস!"

এমনিভাবে অস্থিরমনে যখন তিনি ঘুরিতেছেন, তখন একদিন মদের দেবতা ব্যাকাসের সংগীরা তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "তুমি স্ফূর্তি করিয়া বীণা বাজাও, আমরা নাচিব।" কিন্তু অর্ফিয়ুসের মনে সে স্ফূর্তি নাই, তাই বীণার তারেও কেবল দুঃখের

সুরেই বাজিতে লাগিল। তখন মাতালেরা রাগিয়া বলিল, "মার ইহাকে—এ আমাদের আমোদ মাটি করিতেছে।" তখন সকলে মিলিয়া অর্ফিয়ুসকে মারিয়া তাহার দেহ নদীতে ভাসাইয়া দিল। সেই দেহ ইউরিডিসের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল। শূন্যে অর্ফিয়ুসের আনন্দধ্বনি শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিল আবার তিনি ইউরিডিসকে ফিরিয়া পাইয়াছেন।

জলে স্থলে নদীর কলস্রোতে ঝরণার ঝর্ঝর শব্দে আনন্দ-কোলাহল বাজিয়া উঠিল।

দেবতার দুর্বুদ্ধি

স্বর্গের দেবতারা যেখানে থাকেন, সেখান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবার একটিমাত্র পথ ; সেই পথ রামধনুকের তৈরী। জলের রঙে আগুন আর বাতাসের রং মিশিয়ে দেবতারা সেই পথ বানিয়েছেন। আশ্চর্য সুন্দর সেই পথ, স্বর্গের দরজা থেকে নামতে নামতে পৃথিবী ফুঁড়ে পাতাল ফুঁড়ে কোন অন্ধকার ঝরণার নিচে মিলিয়ে গেছে। কোথাও তার শেষ নেই।

পথটি পেয়ে দেবতাদের আনন্দও হল, ভয়ও হল। ভয় হল এই ভেবে যে, ঐ পথ বেয়ে দুর্দান্ত দানবগুলো যদি স্বর্গে এসে পড়ে! দেবতারা সব ভাবনায় বসেছেন, এমন সময় চারদিক ঝলমলিয়ে, আলোর মত পোশাক প'রে, হীমদল এসে হাজির হলেন। হীমদল কে? হীমদল হলেন আদি দেবতা অদীনের ছেলে। তাঁর মায়েরা নয়টি বোন, সাগরের মেয়ে। তাঁদের কাছে পৃথিবীর বল, সমুদ্রের মধু, আর সূর্যের তেজ খেয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন। তাঁকে দেখেই দেবতারা সব ব'লে উঠলেন, "এস হীমদল, এস মহাবীর, আমাদের রামধনুকের প্রহরী হয়ে স্বর্গদ্বারের রক্ষক হও।"

সেই অবধিই হীমদলের আর অন্য কাজ নেই, তিনি যুগযুগান্তর রাত্রিদিন স্বর্গদ্বারে প্রহর জাগেন। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, একটিবার পলক ফেললেই বহু-দিনের সমস্ত শ্রান্তি জুড়িয়ে যায়। রামধনুকের ছায়ার নিচে সারারাত শিশির ঝরে, তার একটি কণাও হীমদলের চোখ এড়ায় না। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ কচি ঘাস গজায়, হীমদল কান পেতে তার আওয়াজ শোনেন। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে ঢুকবে এমন কারও সাধ্যি নেই। হাতে তাঁর এক শিঙের বাঁশি, সেই বাঁশিতে ফুঁ দিলে স্বর্গ মর্ত পাতাল জুড়ে হুংকার বাজবে "সাবধান! সাবধান!"—সেই সঙ্গে ত্রিভুবনের সকল প্রাণী কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠবে। এমনি করে প্রস্তুত হয়ে হীমদল সেখানে পাহারা দিতে লাগলেন।

কিন্তু দেবতাদের মনের ভয় তবুও কিছু কমল না। তাঁরা বললেন, "বিপদ বুঝে সাবধান হয়েও যদি বাইরের শত্রুকে ঠেকাতে না পারি, তখন আমাদের উপায় হবে কি? যদি বাঁচতে হয় ত' অক্ষয়দুর্গ গড়তে হবে। আকাশজোড়া স্বর্গটিকে দুর্গ দিয়ে ঘিরতে হবে।" কিন্তু, তেমন দুর্গ বানাবে কে? নানাজনে নানারকম মন্ত্রণা দিচ্ছেন, কিন্তু কোন কিছুই মীমাংসা হচ্ছে না। এমন সময় কোথাকার এক অজানা কারিগর এসে খবর দিল, হুকুম পেলে আর বকশিশ পেলে সে অক্ষয়দুর্গ বানাতে পারে। হিমের অসুর ঋমতুরষ্ যে ছদ্মবেশে কারিগর হয়ে এসেছেন, দেবতারা তা বুঝতে পারলেন

না। তাঁরা বললেন, ''কি রকম তুমি বকশিশ চাও?'' কারিগর বলল, ''চন্দ্র চাই, সূর্য চাই, আর স্বর্গের মেয়ে ফ্রেয়াকে চাই।''

আবদার শুনে দেবতারা সব রেগে উঠলেন। সবাই বললেন, ''বেয়াদবকে দূর করে দাও।'' কিন্তু দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর নাম লোকী; তিনি সকল রকম দুর্বুদ্ধির দেবতা। লোকী বললেন, ''আচ্ছা, কাজটা আগে করিয়ে নিই না—তারপর দেখা যাবে।'' দুষ্ট দেবতার কূট মন্ত্রণা শুনে দেবতারা সব ঋম্‌তুরষ্‌কে বললেন, ''তুমি চন্দ্র পাবে, সূর্য পাবে, দেবকন্যা ফ্রেয়াকে পাবে, যদি একলা তোমার ঘোড়ার সাহায্যে শীতকালের মধ্যে এ কাজটাকে শেষ করতে পার।'' ছদ্মবেশী অসুর বলল, ''অতি উত্তম! এই কথাই ঠিক রইল।''

সেদিন থেকে ঋম্‌তুরষের বিশ্রাম নেই। সারাদিন সে পাথর ব'য়ে ঘোড়াকে দিয়ে স্বর্গে তোলায়, সারারাত দুর্গ বানায়। দেবতারা ঠিক যেমন যেমন বলে দিয়েছেন, তেমনি করে পাথরের পর পাথর জুড়ে আকাশ ফুঁড়ে অক্ষয়দুর্গ গড়ে উঠছে। শীত যখন ফুরোয় ফুরোয়, তখন দেবতারা দেখলেন, সর্বনাশ! দুর্গের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, একটিমাত্র ফটক বাকি—সে ত শুধু একদিনের কাজ! এখন উপায়? এতদিনের চন্দ্র সূর্য স্বর্গ থেকে খসে পড়বে? সুন্দরী ফ্রেয়া শেষটায় অজানা এক কারিগরকে বিয়ে করবে? ভয়ে ভাবনায় ক্ষেপে গিয়ে সবাই বললে, ''হতভাগা লোকীর কথায় আমাদের এই বিপদ হল, ও এখন এর উপায় করুক, তা না হলে ওকেই আমরা মেরে ফেলব।''

লোকী আর করবে কি? সন্ধ্যা হতেই সে স্বর্গ হতে বেরিয়ে দেখল, অনেক দূরে মেঘের নিচে কারিগরের ঘোড়া পাহাড়ের সমান পাথর টেনে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। লোকী তখন মায়াবলে আকাশ-ঘোটকীর রূপ ধ'রে চিঁহি চিঁহি ক'রে অদ্ভুত সুরে ডাকতে ডাকতে একটা বনের ভিতর থেকে দৌড়ে বেরুল। সেই শব্দে ঋম্‌তুরষের ঘোড়া চম্‌কে উঠে, লাগাম ছিঁড়ে, সাজ খসিয়ে, ঊর্ধ্বমুখে মন্ত্রে-চালান পাগলের মত ছুটে চলল। দিক-বিদিকের বিচার নেই, পথ-বিপথের খেয়াল নেই, আকাশের কিনারা দিয়ে, আঁধারের ভিতর দিয়ে, বনের পর বন, পাহাড়ের পর পাহাড়, কেবল ছুট্‌ ছুট্‌ ছুট্‌। লোকীও ছুটেছে, ঘোড়াও ছুটেছে, আর 'হায় হায়' চিৎকার ক'রে পিছন পিছন ঋম্‌তুরষ্‌ ছুটে চলেছে। এমনি করে শীতকালের শেষ রাত্রি প্রভাত হল, দুষ্ট দেবতা শূন্যে কোথায় মিলিয়ে গেল, অসুর এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়া ধরল। তখন বসন্তের প্রথম কিরণে পূবের মেঘে রং ধরেছে, দক্ষিণ বাতাস জেগে উঠছে।

অসুর বুঝল এ সমস্তই দেবতার ফাঁকি। কোথায় বা চন্দ্র সূর্য, কোথায় বা দেবকন্যা ফ্রেয়া! এতদিনের পরিশ্রম সব একেবারেই পণ্ড। ভাবতে ভাবতে অসুরের মাথা গরম হল, ভীষণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে দেবতাদের সে মারতে চলল। দূর থেকে তার মূর্তি দেখেই দেবরাজ থর্‌ বুঝলেন, অসুর আসছে স্বর্গপুরী ধ্বংস করতে। তিনি তখন ব্যস্ত হয়ে তাঁর বিরাট হাতুড়ি ছুঁড়ে মারলেন। অসুরের বিশাল দেহ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল।

কিন্তু, দেবতাদের মনে আর শান্তি রইল না। এই অন্যায় কাজের জন্য তাঁরা লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। দেবতাদের মুখ মলিন দেখে সাগরের দেবতা ঈগিন বললেন, ''আমার প্রবালপুরীতে রাজভোজ হবে, তোমরা এস—ভাবনাচিন্তা দূর কর।'' দেবতাদের সবাই এলেন, কেবল লোকীকে কেউ খবর দিল না। সবাই যখন ভোজে বসেছেন, লোকী তখন জানতে পেরে ভোজের সভায় হাজির হয়ে সকলকে গাল দিতে

দিতে বিনা দোষে ঈগিনের প্রিয় দাস ফন্‌ফেন্‌কে মেরে ফেলল। দেবতারা অনেক দিন অনেক সয়েছেন, আজকে তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। লোকীর সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের কথা তাঁদের মনে পড়ল। তাঁরা বললেন, "এই লোকীর জন্য স্বর্গের সর্বনাশ হচ্ছে। এই হিংসুকে লোকী থরের স্ত্রীর সোনার চুল চুরি করেছিল; এই কাপুরুষ লোকীই বাজি রেখে নিজের মুণ্ড পণ ক'রে বাজি হেরে পালিয়েছিল; এই বিশ্বাসঘাতক লোকীই স্বর্গের অমৃতফল অসুরের হাতে দিয়েছিল; এই হতভাগা লোকীই ফ্রেয়াকে রাক্ষসের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল; এই চোর লোকীই ফ্রেয়ার গলার সোনার হার সরাতে গিয়ে হীমদলের হাতে সাজা পেয়েছিল; এই পাষণ্ড লোকীই নিষ্পাপ বলোদরের মৃত্যুর কারণ! এই লোকী পৃথিবীতে গিয়ে অত্যাচার করে, পাতালে গিয়ে শত্রুর সঙ্গে মন্ত্রণা করে! মারো এই অপদার্থকে।"

লোকী প্রাণভয়ে পালাতে গেল কিন্ত স্বয়ং দেবরাজ থর আর আদি দেবতা অদীন যখন তাঁর পিছনে ছুটলেন, তখন সে আর পালাবে কোথায়? বিষের ঝরণার নিচে হাত-পা বেঁধে লোকীকে ফেলে রাখা হল। লোকীর স্ত্রী সিগীন যতক্ষণ ঝরণাতলায় পাত্রে ক'রে বিষ ধরেন আর ফেলে দেন, ততক্ষণ লোকী একটু আরাম পায়; আর সিগীন যদি মুহূর্তের জন্য খেতে যান কি ঘুমিয়ে পড়েন, তবে বিষের যন্ত্রণায় লোকীর আর সোয়াস্তি থাকে না।

দেবতারা ভাবলেন, স্বর্গের পাপ দূর হল, স্বর্গে এবার শান্তি এল। কিন্তু হায়! তার অনেক আগেই পাপের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে। লোকীর জন্য স্বর্গের পাপ মর্তে নেমেছে, পাতালে ঢুকে অসুর পিশাচ দৈত্য দানব সবগুলোকে জাগিয়ে তুলেছে। যে বনের লোহার গাছে লোহার পাতা, সেই বনের ছায়ায় বসে লোকীর রাক্ষসী স্ত্রী অঙ্গুর্বদা নেকড়ে-মুখো পিশাচ-রাহুদের যত্ন ক'রে পাপীর হাড় আর পাপীর মজ্জা খাইয়ে খাইয়ে বাড়িয়ে তুলছে। তারা চন্দ্র সূর্যের পিছন পিছন যুগের পর যুগ ছুটে বেড়ায়। এতদিনে খেয়ে খেয়ে তাদের মূর্তি এমন ভীষণ হল যে চন্দ্র সূর্য ম্লান হয়ে কাঁপতে লাগল, পৃথিবী চৌচির হয়ে ফেটে উঠল, আকাশের নক্ষত্রেরা খসে খসে পড়তে লাগল। পাতালের রক্তকুকুর আর রাহুর বাপ ফেন্‌রিস বিকট শব্দে ছুটে বেরুল। লোকী তার বাঁধন ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। সৃষ্টির মেরুদণ্ড য়গদ্রাসিল বা জগৎতরুর শিকড় কেটে মহানাগ নিধুগ বিকট মূর্তিতে বেরিয়ে এল। আর তারই সঙ্গে ভীষণ শব্দে হীমদলের শিঙার আওয়াজ বেজে উঠল—সাবধান! সাবধান! সাবধান!

দেবতারা সব ঘুমের থেকে লাফিয়ে উঠে রামধনুকের রঙিন পথে নেমে আসলেন। যে বিরাট সাপ সমুদ্রের গভীর গুহায় দেবতার ভয়ে লুকিয়ে ছিল, সে আজ সমুদ্রের জল তোলপাড় করে বেরিয়ে এল। হিমের দেশের অসুররা সব ঝাপসা ধোঁয়ার বর্ম প'রে কুয়াশায় চ'ড়ে এগিয়ে এল। অগ্নিপুরীর দৈত্যদানব মশাল জেবলে চারিদিক রাঙিয়ে এল। তারপর আকাশ চিরে দৈত্যরাজ সূর্ত্র এলেন; আগুনের শিখার মত, প্রলয়ের উল্কার মত, এসেই তিনি স্বর্গদ্বারের সেতুর উপর দলেবলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর রামধনুকের রঙিন সেতু কাচের মতন গুঁড়িয়ে গেল।

তারপরই প্রলয় যুদ্ধ। আদি দেবতা অদীনের একটি মাত্র চোখ, আর নেকড়ে অসুর ফেন্‌রিসের সঙ্গে লড়তে গিয়েই বিপদে পড়লেন। রাহুর বাপ ফেন্‌রিস, তার মা হল রাক্ষসী অঙ্গুর্বদা আর তার বাপ স্বয়ং লোকী। অসুরের প্রকাণ্ড দেহ যুদ্ধের উৎসাহে বাড়তে বাড়তে পাহাড় পর্বত ছাড়িয়ে উঠল; তার রক্তমাখা হাঁ-করা মুখে অদীন একবার ঢুকে গেলেন, আর তাঁকে পাওয়াই গেল না। ফ্রেয়ার ভাই মহাবীর ফ্রে গোল-

মালে তাঁর অজেয় খড়্গ খুঁজেই পেলেন না; তিনি সুর্ত্রের হাতে প্রাণ হারালেন। দেবরাজ থর তাঁর ভীষণ হাতুড়ির ঘায়ে সমুদ্রের বিরাট সাপকে খণ্ড খণ্ড করে আপনি তার বিষাক্ত রক্তে ডুবে মরলেন। যমপুরীর রক্তকুকুর যুদ্ধের দেবতা তাইর্‌কে মেরে উল্লাসে তাঁর রক্ত পান করতে লাগল। এদিকে অদীনের পুত্র বিদার এসে পিতৃঘাতী ফেন্‌রিসকে দুই টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। বড় বড় দেবতা অসুর একে একে সবাই যখন প্রায় শেষ হয়েছে, তখন সুর্ত্রের হাত থেকে আগুনের খড়্গ ছুটে গিয়ে স্বর্গে মর্তে পাতালে প্রলয়ের আগুন জেলে দিল। গাছপালা পুড়ে গেল, নদীর জল শুকিয়ে গেল, স্বর্গের সোনার পুরী ভস্ম হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর সব যখন ফুরিয়ে গেল তখন বিদার দেখলেন, বড় বড় দেবতা অসুর কেউ আর বাকি নেই। কেবল থরের দুই ছেলে যুদ্ধের শ্মশানে থরের হাতুড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে!

আর লোকী? বিশ্বাসঘাতক লোকী অসুরের দলের মধ্যে ম'রে রয়েছে—হীমদলের খড়্গ তার বুকে বসান। হীমদলও মহাযুদ্ধে অবসন্ন হয়ে বীরের মত রক্তাক্ত বেশে মরে আছেন।

বুদ্ধিমান শিষ্য

টোলের যিনি গুরু, তাঁর অনেক শিষ্য। সবাই লেখে, সবাই পড়ে, কেবল একজনের আর কিছুতেই কিছু হয় না। বছরের পর বছর গেল, তার বিদ্যাও হল না, বুদ্ধিও খুলল না। সকলেই বলে—"ওটা মূর্খ, ওটা নির্বোধ, ওটার আর হবে কি? ওটা যেমন বোকা, তেমনিই থাকবে।" শেষটায় গুরু পর্যন্ত তার আশা ছেড়ে দিলেন। বেচারার কিন্তু একটি গুণ সকলেই স্বীকার করে,—সে প্রাণপণে গুরুর সেবা করতে ত্রুটি করে না।

একদিন গুরু শুয়ে আছেন, মূর্খ শিষ্য বসে বসে তাঁর পা টিপে দিচ্ছে। গুরু বললেন, "তুমি ঘুমতে যাবার আগে খাটিয়াটা ঠিক করে দিও। পায়াগুলো অসমান আছে।" শিষ্য উঠবার সময় দেখল, একদিকের পায়াটা একেবারে ভাঙা। এখন উপায়? বেচারা খাটের সেই দিকটা নিজের হাঁটুর উপর রেখে সারারাত জেগে কাটাল। সকালে গুরু ঘুম থেকে উঠে ব্যাপার দেখে অবাক!

গুরুর মনে ভারি দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, আহা বেচারা এমন করে আমার সেবা করে, এর কি কোনরকম বিদ্যা বুদ্ধি হবার উপায় নাই? পুঁথি পড়ে বিদ্যালাভ সকলের হয় না, কিন্তু দেখে শুনেও ত কত লোকে কত কি শেখে? দেখা যাক, সেই ভাবে একে কিছু শেখান যায় কিনা। তিনি শিষ্যকে ডেকে বললেন, "বৎস, এখন থেকে তুমি যেখানেই যাও, ভাল ক'রে সব দেখবে—আর কি দেখলে, কি শুনলে, কি করলে, সব আমাকে এসে বলবে।" শিষ্য বলল, "আজ্ঞে, তা বলব।"

তারপর কিছুদিন যায়, শিষ্য একদিন জঙ্গলে একটা কাঠ আনতে গিয়ে একটা সাপ দেখতে পেল। সে টোলে ফিরে এসে গুরুকে বলল, "আজ একটা সাপ দেখেছি।" গুরু উৎসাহ ক'রে বললেন, "বেশ বেশ। বল ত সাপটা কি রকম?" শিষ্য বললে, "আজ্ঞে, ঠিক যেন লাঙলের ঈষ্।" শুনে গুরু বেজায় খুশী হয়ে বললেন, "হাঁ হাঁ, ঠিক বলেছ। অনেকটা লাঙলের ডাণ্ডার মতই ত। সরু, লম্বা, বাঁকা আর কালো

মতন। তুমি এমনি ক'রে সব জিনিস মন দিয়ে দেখতে শেখ, আর ভাল ক'রে বর্ণনা করতে শেখ, তা হলেই তোমার বুদ্ধি খুলবে।''

শিষ্য ত আহ্লাদে আটখানা। সে ভাবলে, ''তবে যে লোকে বলে আমার বুদ্ধি নেই।'' আর একদিন সে বনের মধ্যে গিয়ে ফিরে এসে গুরুকে বলল, ''আজ একটা হাতী দেখলাম।'' গুরু বললেন, ''হাতীটা কি রকম?'' শিষ্য বললে, ''ঠিক যেন লাঙগলের ঈষ্।'' গুরু ভাবলেন, 'হাতীটাকে লাঙগল-দণ্ডের মত বলছে কেন? ও বোধহয় শুঁড়টাকেই ভাল করে দেখেছে। তা ত হবেই—শুঁড়টাই হল হাতীর আসল বিশেষত্ব কিনা। ও শুধু হাতী দেখেছে তা নয়, হাতীর মধ্যে সব চাইতে যেটা দেখবার জিনিস, সেইটাই আরও বিশেষ করে দেখেছে।' সুতরাং তিনি শিষ্যকে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন, ''ঠিক, ঠিক, হাতীর শুঁড়টা দেখতে অনেকটা লাঙগলের ঈষের মতই ত।'' শিষ্য ভাবলে, 'গুরুর তাক্ লেগে গেছে—না জানি আমি কি পণ্ডিত হলাম রে!'

তারপর শিষ্যরা একদিন গেছে নিমন্ত্রণ খেতে। মূর্খও সঙ্গে গিয়েছে। খেয়েদেয়ে ফিরে আসতেই গুরু বললেন, "কি ক'রে এলে?" শিষ্য বললে, "দুধ দিয়ে, দৈ দিয়ে, গুড় মেখে খেলাম।'' গুরু বললেন, ''বেশ করেছ! বল ত, দৈ দুধ কি রকম?'' শিষ্য একগাল হেসে বলল, ''আজ্ঞে, ঠিক যেন লাঙগলের ঈষ্।''

গুরুর ত চক্ষুস্থির! তিনি বললেন, "ও মূর্খ! এই বুঝি তোর বিদ্যে! আমি ভাবছি যে তুই বুঝি বুদ্ধি খাটিয়ে সব জবাব দিচ্ছিস। তুই লাঙগলও দেখেছিস, দুধ দৈও খেয়েছিস, তবে কোন্ আক্কেলে বললি যে লাঙগলের ঈষের মত? দূর্ দূর্ দূর্! কোনদিন তোর কিচ্ছু হবে না।''

শিষ্য বেচারা হঠাৎ এমন তাড়া খেয়ে একেবারেই দমে গেল। সে মনে মনে বলতে লাগল, "এদের কিছুই বোঝা গেল না। ঐ কথাটাই ত ক'দিন ধ'রে ব'লে আসছি, শুনে গুরু রোজই ত খুশী হয়। তাহলে আজকে কেন বলছে 'দূর দূর'! দুত্তোরি! এদের কথার কিছু ঠিক নেই।''

সূদন ওঝা

সূদন ছিল ভারি গরীব, তার একমুঠো অন্নেরও সংস্থান নাই। রোজ জুয়া খেলে লোককে ঠকিয়ে যা পায়, তাই দিয়ে কোনরকমে তার চলে যায়। যেদিন যা উপায় করে, সেইদিনই তা খরচ করে ফেলে, একটি পয়সাও হাতে রাখে না। এইরকমে কয়েক বছর কেটে গেল; ক্রমে সূদনের জ্বালায় গ্রামের লোক অস্থির হয়ে পড়ল, পথে তাকে দেখলেই সকলে ছুটে গিয়ে ঘরে দরজা দেয়। সে এমন পাকা খেলোয়াড় যে কেউ তার সঙ্গে বাজি রেখে খেলতে চায় না।

একদিন সূদন সকাল থেকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু গ্রামময় ঘুরেও কাউকে দেখতে পেল না। ঘুরে ঘুরে নিরাশ হয়ে সূদন ভাবল—''শিবমন্দিরের পুরুত ঠাকুর ত মন্দিরেই থাকে—যাই, তার সঙ্গেই আজ খেলব।'' এই ভেবে সূদন সেই মন্দিরে চলল। দূর থেকে সূদনকে দেখেই পুরুতঠাকুর ব্যাপার বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মন্দিরের মধ্যে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

মন্দিরের পুরুতকে না দেখতে পেয়ে সূদন একটু দমে গেল বটে, কিন্তু তখনই

স্থির করল—'যাঃ—তবে আজ মহাদেবের সঙ্গেই খেলব।' তখন মূর্তির সামনে গিয়ে বলল—''ঠাকুর! সারাদিন ঘুরে ঘুরে এমন একজনকেও পেলাম না, যার সঙ্গে খেলি। রোজগারের আর কোন উপায়ও আমি জানি না, তাই এখন তোমার সঙ্গেই খেলব। আমি যদি হারি, তোমার মন্দিরের জন্য খুব ভাল একটি দাসী এনে দিব; আর তুমি যদি হার, তবে তুমি আমাকে একটি সুন্দরী মেয়ে দিবে—আমি তাকে বিয়ে করব।'' এই বলে সুদন মন্দিরের মধ্যেই ঘুঁটি পেতে খেলতে বসে গেল। খেলার দান ন্যায়মত দুই পক্ষেই সুদন দিচ্ছে—একবার নিজের হয়ে, একবার দেবতার হয়ে খেলছে। অনেকক্ষণ খেলার পর শেষে সুদনেরই জিত হল। তখন সে বলল—''ঠাকুর! এখন ত আমি বাজি জিতেছি, এবারে পণ দাও।'' পাথরের মহাদেব কোন উত্তর দিলেন না, একেবারে নির্বাক রইলেন। তা দেখে সুদনের হল রাগ। ''বটে! কথার উত্তর দাও না কেমন দেখে নেব''—এই বলেই সে করল কি, মহাদেবের সম্মুখে যে দেবীমূর্তি ছিল সেটি তুলে নিয়েই উঠে দৌড়।

সুদনের স্পর্ধা দেখে মহাদেব ত একেবারে অবাক! তখনি ডেকে বললেন—''আরে, আরে, করিস কি? শীগ্গির দেবীকে রেখে যা। কাল ভোরবেলা যখন মন্দিরে কেউ থাকবে না, তখন আসিস, তোকে পণ দিব।'' এ-কথায় সুদন দেবীকে ঠিক জায়গায় রেখে চলে গেল।

এখন হয়েছে কি, সেই রাতে একদল স্বর্গের অপ্সরা এল মন্দিরে পুজো করতে। পুজোর পর সকলে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলে, মহাদেব রম্ভা ছাড়া অন্য সকলকে যেতে বললেন, সকলেই চলে গেল, রইল শুধু রম্ভা। ক্রমে রাত্রি প্রভাত না হতেই সুদন এসে হাজির। মহাদেব রম্ভাকে পণস্বরূপ দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

সুদনের আহ্লাদ দেখে কে! অপ্সরা স্ত্রীকে নিয়ে অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। সুদনের বাড়ি ছিল একটা ভাঙা কুঁড়ে, অপ্সরা মায়াবলে আশ্চর্য সুন্দর এক বাড়ি তৈরী করল। সেই বাড়িতে তারা পরম সুখে থাকতে লাগল। এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল।

সপ্তাহে একদিন, রাত্রে, অপ্সরাদের সকলকে ইন্দ্রের সভায় হাজির থাকতে হয়। সেই দিন উপস্থিত হলে, রম্ভা যখন ইন্দ্রের সভায় যেতে চাইল, তখন সুদন বললে—''আমাকে সঙ্গে না নিলে কিছুতেই যেতে দিব না।'' মহা মুশকিল! ইন্দ্রের সভায় না গেলেও সর্বনাশ—দেবতাদের নাচ গান সব বন্ধ হবে—আবার সুদনও কিছুতেই ছাড়ছে না। তখন রম্ভা মায়াবলে সুদনকে একটা মালা বানিয়ে গলায় পরে নিয়ে ইন্দ্রের সভায় চলল। সভায় নিয়ে সুদনকে মানুষ করে দিলে পর, সে সভার এক কোণে লুকিয়ে বসে সব দেখতে লাগল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলে, নাচগান সব থেমে গেল। রম্ভা সুদনকে আবার মালা বানিয়ে গলায় পরে চলল তার বাড়িতে। ক্রমে সুদনের বাড়ির কাছে একটা নদীর ধারে এসে রম্ভা যখন আবার তাকে মানুষ করে দিল, তখন সুদন বলল—''তুমি বাড়ি যাও, আমি এই নদীতে স্নান আহ্নিক ক'রে, পরে যাচ্ছি।''

এই নদীর ধারে ছিল ত্রিভুবন তীর্থ। এখানে দেবতারা পর্যন্ত স্নান করতে আসতেন। সেদিন সকালেও ছোটখাটো অনেক দেবতা নদীর ঘাটে স্নান করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখে সুদন চিনতে পারল—তাঁরা রাত্রে ইন্দ্রের সভায় রম্ভাকে খুব খাতির করেছিলেন। সুদন ভাবল—'আমার স্ত্রীকে এরা এত সম্মান করে তাহলে আমাকে কেন করবে না?' এই ভেবে সে খুব গম্ভীর ভাবে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল—যেন সেও ভারি একজন দেবতা! কিন্তু দেবতারা তাকে দেখে অত্যন্ত

অবজ্ঞা ক'রে তার দিকে ফিরেও চাইলেন না—তাঁরা তাঁদের স্নান আহ্নিকেই মন দিলেন। এ তাচ্ছিল্য সূদনের সহ্য হল না। সে করল কি, একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে দেবতাদের বেদম প্রহার দিয়ে বলল—"এতবড় আস্পর্ধা! আমি রম্ভার স্বামী, আমাকে তোরা জানিস নে?" দেবতারা মার খেয়ে ভাবলেন—'কি আশ্চর্য! রম্ভা কি তবে মানুষ বিয়ে করেছে?' তাঁরা তখনই স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে সব কথা বললেন।

এদিকে সূদন বাড়ি গিয়েই হাসতে হাসতে স্ত্রীর কাছে তার বাহাদুরির কথা বলল। শুনে রম্ভার ত চক্ষুস্থির! স্বামীর নির্বুদ্ধিতা দেখে লজ্জায় সে মরে গেল, আর বলল—"তুমি সর্বনাশ করেছ! এখনি আমাকে ইন্দ্রের সভায় যেতে হবে।"

দেবতারা ইন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করলে পর ইন্দ্রের যা রাগ! "এতবড় স্পর্ধা! স্বর্গের অপ্সরা হয়ে রম্ভা পৃথিবীর মানুষ বিয়ে করেছে?" ঠিক এই সময়ে রম্ভাও গিয়ে সেখানে উপস্থিত! তাকে দেখেই ইন্দ্রের রাগ শতগুণ বেড়ে উঠল। আর তিনি তৎক্ষণাৎ শাপ দিলেন, "তুমি স্বর্গের অপ্সরা হয়ে মানুষ বিয়ে করেছ, আবার তাকে লুকিয়ে স্বর্গে এনে আমার সভায় নাচ দেখিয়েছ এবং স্পর্ধা করে সেই লোক আবার দেবতাদের গায়ে হাত তুলেছে—অতএব, আমার শাপে তুমি আজ হতে দানবী হও। বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের যে সাতটি মন্দির আছে, সেই মন্দির চুরমার করে আবার যতদিন কেউ নূতন করে গড়িয়ে না দিবে, ততদিন তোমার শাপ দূর হবে না।"

রম্ভা তখনি পৃথিবীতে এসে সূদনকে শাপের কথা জানিয়ে বলল—"আমি এখন দানবী হয়ে বারাণসী যাব। সেখানে বারাণসীর রাজকুমারীর শরীরে ঢুকব, আর লোকে বলবে রাজকুমারীকে ভূতে পেয়েছে। রাজা নিশ্চয়ই যত ওঝা কবিরাজ ডেকে চিকিৎসা করাবেন; কিন্তু আমি তাকে ছাড়ব না, তাই কেউ রাজকুমারীকে ভাল করতে পারবে না। এদিকে তুমি বারাণসী গিয়ে বলবে যে, তুমি রাজকুমারীকে আরাম করতে পার। তারপর তুমি বুদ্ধি ক'রে ভূত ঝাড়ানর চিকিৎসা আরম্ভ করলে আমি একটু একটু করে রাজকুমারীকে ছাড়তে থাকব। তারপর তুমি রাজাকে বলবে যে, তিনি বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির চূর্ণ ক'রে, আবার যদি নূতন করে গড়িয়ে দেন, তবেই রাজকুমারী সম্পূর্ণ আরাম হবেন। রাজা অবিশ্যি তাই করবেন আর তাহলেই আমার শাপ দূর হবে। তুমিও অগাধ টাকা পুরস্কার পেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।" এই কথা বলতে বলতেই রম্ভা হঠাৎ দানবী হয়ে, তখনই চক্ষের নিমেষে বারাণসী গিয়ে একেবারে রাজকুমারীকে আশ্রয় ক'রে বসল।

রাজকুমারী একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে, বিড় বিড় ক'রে বক্‌তে বক্‌তে, সেই যে ছুটে বেরুলেন, আর বাড়িতে ঢুকলেনই না। তিনি শহরের কাছেই একটা গুহার মধ্যে থাকেন, আর রাস্তা দিয়ে লোকজন যারা চলে তাদের গায় ঢিল ছুঁড়ে মারেন! রাজা কত ওঝা বদ্যি ডাকালেন, রাজকুমারীর কোন উপকারই হল না। শেষে রাজা ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন—"যে রাজকুমারীকে ভাল করতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিব—রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিব।"

রাজবাড়ীর দরজার সামনে ঘণ্টা ঝুলান আছে, নূতন ওঝা এলেই ঘণ্টায় ঘা দেয়, আর তাকে নিয়ে গিয়ে রাজকুমারীর চিকিৎসা করান হয়। সূদন রম্ভার উপদেশমত বারাণসী গিয়ে রাজকুমারীর পাগল হওয়ার কথা শুনে ঘণ্টায় ঘা দিল। রাজা তাকে ডেকে বললেন—"ওঝার জ্বালায় অস্থির হয়েছি বাপু! তুমি যদি রাজকুমারীকে ভাল করতে না পার, তবে কিন্তু তোমার মাথাটি কাটা যাবে।" এ-কথায় সূদন রাজী হয়ে তখনই রাজকন্যার চিকিৎসা আরম্ভ করে দিল।

ভূতের ওঝারা ভড়ংটা করে খুব বেশী, সুদনও সেসব করতে কসুর করল না। ঘি, চাল, ধূপ, ধুনা দিয়ে প্রকাণ্ড যজ্ঞ আরম্ভ করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করে হিজিবিজি মন্ত্র পড়াও বাদ দিল না। যজ্ঞ শেষ করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেই পর্বতের গুহায় চলল, যেখানে রাজকন্যা থাকে। সেখানে গিয়েও বিড় বিড় ক'রে খানিকক্ষণ মন্ত্র পড়ল—"ভূতের বাপ—ভূতের মা—ভূতের ঝি, ভূতের ছা—দূর দূর দূর, পালিয়ে যা।" ক্রমে সকলে দেখল যে, ওঝার ওষুধে একটু একটু করে কাজ দিচ্ছে। কিন্তু ভূত রাজকুমারীকে একেবারে ছাড়ল না। তিনি তখনও গুহার ভিতরেই থাকেন, কিছুতেই বাইরে আসলেন না। যা হোক, রাজা সুদনকে খুব আদর যত্ন করলেন, আর, যাতে ভত একেবারে ছেড়ে যায়, সেরূপ ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। দুদিন পর্যন্ত সুদন আরো কত কিছু ভড়ং করল। তৃতীয় দিনে সে রাজার কাছে এসে বলল—"মহারাজ! রাজকুমারীর ভূত বড় সহজ ভূত নয়—এ হচ্ছে দৈবী ভূত। মহারাজ যদি এক অসম্ভব কাজ করতে পারেন—বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির চুরমার ক'রে, আবার নূতন ক'রে ঠিক আগের মত গাড়িয়ে দিতে পারেন,—তবেই আমি রাজকন্যাকে আরাম করতে পারি।"

রাজা বললেন—"এ আর অসম্ভব কি?" রাজার হুকুমে তখনই হাজার হাজার লোক লেগে গেল। দেখতে দেখতে মন্দিরগুলি চুরমার হয়ে গেল। তারপর এক মাসের মধ্যে আবার সেই সাতটি মন্দির ঠিক যেমন ছিল তেমনটি করে নূতন মন্দির গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীও সেরে উঠলেন, অপ্সরাও শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল। তারপর খুব ঘটা ক'রে সুদনের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হল আর রাজা বিয়ের যৌতুক দিলেন তাঁর অর্ধেক রাজত্ব।

লোলির পাহারা

শহর থেকে অনেক দূরে "লোলি"দের বাড়ি। সে বাড়িতে খালি লোলি থাকে আর তার বাবা থাকেন, আর থাকে একটা বুড়ো শুয়োর। বাড়ির চারদিকে ছোট ছোট ক্ষেত, তার চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা। ক্ষেতে যে সামান্য ফসল হয়, তাই বেচবার জন্য লোলির বাবা শহরে যান, আর লোলিকে বলে দিয়ে যান, "তুই বাড়িতে থেকে ভাল করে পাহারা দিস্।" লোলি বাড়িতেই থাকে, কিন্তু পাহারা দেয় বিছানায় শুয়ে, চোখ বুজে, নাক ডাকিয়ে!

একদিন লোলির বাবা শহরে যাবার সময়ে লোলিকে বললেন, "ওরে! আমার ত আজকেও ফিরতে সন্ধ্যে হবে, একটু ভাল করে মন দিয়ে পাহারা দিস্। কশাই বুড়ো বলেছিল শুয়োরটাকে কিন্‌বে—তাহলেই শীতকালটা আমাদের কোনরকমে চলে যাবে। দেখ বাপু, ফটকটি খোলা রেখো না যেন! শুয়োরটা যদি পালায়, তাহলে কিন্তু উপোস ক'রে মরতে হবে।" লোলি খুব খানিক ঘাড় নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি খুব করে পাহারা দেব—আর কখনো ফটক খুলে রাখব না।"

লোলির বাবা চললেন শহরের দিকে, আর লোলি একটা খড়ের গাদার উপর বসে

পাহারা দিতে লাগল। বুড়ো শুয়োরটা শুয়ে শুয়ে ঘঁৎ ঘঁৎ করে নাক ডাকছে, তাই শুনতে শুনতে লোলিও কখন যে চোখ বুজে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে নিজেও টের পায়নি। হঠাৎ সে কেমন যেন চমকে উঠল, বাবার কথাগুলো তার মনে পড়ল। সর্বনাশ! শুয়োর যদি পালায়, তবে এবার দুজনকেই উপোস থাকতে হবে। সে কান পেতে শুনল, শুয়োরের ঘঁৎ ঘঁৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে না! সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল—ফটকের দরজা খোলা! ভয়ে অমন শীতের মধ্যেও লোলির গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ছুটতে লাগল।

লোলি ভাবল, হয়ত শুয়োরটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু সমস্ত ঘরদোর খুঁজে কোথাও সেটাকে পাওয়া গেল না। তখন লোলি পাগলের মত রাস্তার দিকে ছুটে চলল। কিন্তু রাস্তায় গিয়ে দেখল, শুয়োর-টুয়োর কোথাও কিছু নেই—খালি একটা বুড়ো ভিখারি লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। তখন লোলি আবার বাড়ির মধ্যে দৌড়ে গেল। সে বিছানার তলায় ঢুকে দেখল, মাচার উপর চড়ে দেখল, প্রকাণ্ড জালাটার ভিতরে হাত দিয়ে দেখল, সমস্ত টেবিল চেয়ার ঝেড়েঝুড়ে দেখল, মই দিয়ে বাড়ির চালায় উঠে দেখল—শুয়োর কোথাও নেই! লোলি কাঁদ কাঁদ হয়ে আবার রাস্তার দিকে ছুটল।

রাস্তায় গিয়ে সে এদিকে-ওদিকে, মাঠের দিকে, গাছের দিকে, নর্দমার দিকে, সব দিকে তাকিয়ে দেখল, শুয়োর কোথাও নেই। তখন লোলি সত্যি সত্যিই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। সে কেঁদে উঠতেই তার মনে হল, কোথায় যেন শুয়োরটা ''ঘঁ—চ'' করে চেঁচিয়ে উঠল। লোলি তখন কী করবে বুঝতে না পেরে, সেই বুড়োর পিছন পিছন ছুটতে লাগল আর কাঁদতে লাগল, ''মশাই গো! মশাই গো! আমাদের শুয়োরটা কোথায় গেল বলে দিন্ না, মশাই!''

লোলির কান্না দেখে বুড়োর হাসি পেয়ে গেল। সে বলল, ''কী, বলছ কি? কার শুয়োর? কী হয়েছে?'' লোলি বলল, ''আমাদের সেই শুয়োরটা—আমি শুয়োর পাহারা দিতে দিতে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছি, আর—'' বুড়ো অমনি ভেংচিয়ে উঠল, ''একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছ—আর শুয়োর অমনি পালিয়েছে। খুব পাহারাদার যা হোক!'' লোলি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল, ''দোহাই মশায়, আমার শুয়োর কোথায় গেল বলে দিন।'' বুড়ো তখন রেগে বলল, ''ভারি ত একটা শুয়োর, তাই নিয়ে আবার এত ঘ্যান্ ঘ্যান্—এ কিন্তু বাপু নেহাৎ বাড়াবাড়ি!'' লোলি বলল, ''শুয়োর গেলে আমাদের উপায় হবে কী? আমাদের শীতকালে খাবার পয়সা পাব কোথায়?'' বুড়ো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, ''যখন পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন সে কথার খেয়াল ছিল না?'' এই বলে বুড়ো আবার কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে লাগল।

লোলি এবার তার পা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কান্না সুরু করল, ''মশাই গো, দোহাই আপনার!—ও মশাই গো! আমাদের কী হবে গো!'' বুড়ো বলল, ''কী আপদ! এমন বিচ্ছিরি প্যান্‌পেনে ছিঁচকাঁদুনে ছেলেও ত দেখিনি কোথাও! চুপ কর শীগগির। এখনি পাড়ার লোক সব ছুটে আসবে, ডাকাত পড়েছে মনে ক'রে!'' কিন্তু লোলি কী সে কথা শোনে? সে প্রাণপণে কেবলই চেঁচাচ্ছে, ''ওরে আমার শুয়োর কোথায় গেল রে? ওরে আমার শুয়োর কে নিল রে?''

বুড়ো তখন বিরক্ত হয়ে পা দুটো ছাড়িয়ে আবার ঠক্‌ঠক্ করে হেঁটে চলল—আর ঠিক সেই সময়ে বুড়োর গায়ের ছেঁড়া কম্বলের ভিতর থেকে ঘঁৎ ঘঁৎ করে কিসের

একটা শব্দ শোনা গেল। লোলি শব্দ শুনেই চিৎকার করে উঠল, "তবে রে হতভাগা চোর! আমাদের শুয়োর নিয়ে পালাচ্ছিস!" এই বলেই সে বুড়োর লাঠিখানা টেনে ধরল। যেমন লাঠিতে হাত দেওয়া, অমনি লোলির মনে হল যেন তার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে; তার হাত-পাগুলো সুড়্ সুড়্ করে বেঁকেচুরে কী রকম ছোট হয়ে যাচ্ছে; ঘাড় গলা পেট সব অসম্ভব মোটা হয়ে ফুলে উঠছে; মুখটা অদ্ভুত রকম বদ্‌লে গিয়ে নাকটাকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে! তারপর দেখতে দেখতে সে চার পায়ে হাঁটতে লাগল।

বুড়ো তখন এক গাল হেসে বলল, "হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। কেমন? আগে ছিলি একটা অপদার্থ নিষ্কর্মা ঘুমকাতুরে কুঁড়ে, আর এখন হয়েছিস কেমন থপ্‌থপে নাদুস্‌নুদুস্ হ্যাংলামুখো শুয়োর। বেশ বেশ! আর কোনদিন দুষ্টুমি করবি? আর কখনও বুড়োমানুষকে 'চোর' বলে ধরতে যাবি? যা, এইবার তোর খড়ের গাদায় গিয়ে শুয়ে থাক্। তোর বাবা যখন ফিরে আসবে কশাইবুড়োকে নিয়ে, তখন দেখবে শুয়োরটা আছে, কিন্তু হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া লোলিটা কোথায় পালিয়েছে! হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ।" বুড়ো খুব একচোট হেসে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল, আর লোলি রাস্তার ধুলোয় পড়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে ধুলো ভিজিয়ে কাদা করে ফেললে।

লোলি রাস্তায় পড়ে কাঁদছে, এমন সময় হঠাৎ কোত্থেকে একটা খেঁকী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসল। লোলি বেচারা কী করে? সে এখন শুয়োর হয়ে গেছে, তাই সে তার ভুঁড়ো পেট নিয়ে ছোট ছোট চারটি পায়ে প্রাণপণ ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে সে নিজের বাড়ির ফটকের সামনে এসেই এক দৌড়ে সেই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে বলল, "ঘ্যঁৎ"—অর্থাৎ "বড্ড বেঁচে গিয়েছি!"

লোলি খড়ের মধ্যে শুয়ে হাঁপাচ্ছে আর ভাবছে, এখন কী করা যায়। এমন সময়ে হঠাৎ ভয়ে তার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেল—তার মনে পড়ল, তার বাবা ত সন্ধ্যে হলেই কশাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন, আর তাকেই ত শুয়োর ভেবে কশাইয়ের কাছে বিক্রি করবেন! আর কশাই তাকে একবার পেলেই ত গলায় ছুরি বসিয়ে—! লোলি আর ভাবতে পারে না। সে শুয়োরের ভাষায় একেবারে "বাপরে মারে! গেছি গেছি!" ব'লে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। সে ভাবল, এই বেলা সময় থাকতে ছুটে পালাই। কিন্তু পালাবে কোথায়? ঠিক সেই সময়ে তার বাবা সেই কশাইকে নিয়ে ফটক দিয়ে ঢুকছেন! লোলির বাবা ঢুকেই এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, "দেখেছ! হতভাগা ছেলেটা ফটক খোলা রেখেই কোথায় সরে পড়েছে! শুয়োরটা যে পালায়নি এই ভাগ্যি!" এই বলে তিনি লোলির কানদুটো ধরে কশাইয়ের কাছে টেনে আনলেন। কশাই লোলিকে হাঁ করিয়ে তার মুখ দেখল, তার পাঁজরে খোঁচা মেরে, পিঠের উপর আচ্ছা করে চাপড়িয়ে তাকে পরীক্ষা করল, তারপর খুশী হয়ে বলল "হুঁ, বেশ।" লোলি তার মাথা নেড়ে হাত পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগল, ক্যাঁক কোঁক ঘ্যঁৎ ঘ্যঁৎ কত রকম শব্দ করল, কিন্তু কিছুতেই তার বাবাকে বোঝাতে পারল না যে, সে সত্যি করে শুয়োর নয়, সে লোলি।

কশাই তার দাম চুকিয়ে দিয়ে, তারপর মুগুরের মত একটা ডান্ডা দিয়ে লোলিকে গুঁতো মেরে বলল, "চল্, দেখি। বড় তেজ দেখাচ্ছিস—না? আচ্ছা, কালকে আর বাছাধনকে তেজ দেখাতে হবে না। কাল রাজার জন্মতিথির ভোজ—কেল্লা থেকে হুকুম এসেছে চোদ্দটা শুয়োর পাঠাতে হবে। এইটাকেই সবার আগে চালান দিচ্ছি। তাহলে ভোজটিও হবে ভাল।"

লোলি ঘঁৎ ঘঁৎ করে অনেক আপত্তি জানাতে লাগল, আর মনে মনে ভাবল, 'যেই ফটক খুলবে অমনি দৌড়ে পালাব।' যেমন ভাবা তেমনি কাজ; লোলির বাবা কশাইয়ের সঙ্গে এগিয়ে এসে যেমন ফটকটা খুলে ফাঁক করে ধরেছেন, অমনি লোলিও হন্‌হন্‌ করে দৌড় দিয়েছে। কিন্তু দৌড়িয়ে যাবে কোথায়? বেরিয়েই দেখে কশাইয়ের দুটো ষণ্ডা কুকুর দাঁত বের করে বসে আছে। কাজেই তার আর পালান হল না। যাবার সময় লোলি শুনল, তার বাবা বকাবকি করছেন,—"মনে করেছিলাম, ছোঁড়াটাকে একটু তামাসা দেখাতে নিয়ে যাব, কিন্তু হতভাগাটা কোথায় যে গেল!"

কশাই লোলিকে ঠেলে ঠেলে তার বাসায় নিয়ে ছোট্ট নোংরা একটা খোঁয়াড়ের মধ্যে পুরে নিজের কাজে চলে গেল, আর লোলি কাদার মধ্যে পড়ে কাঁদতে লাগল। খানিক বাদে যমের মত চেহারা দুটো লোক এল, তাদের একজনের হাতে দড়ি, আরেকজনের হাতে মস্ত একটা ছুরি। তারা এসেই লোলিকে দেখে বলল, "হাঁ হাঁ, এইটা তো বেশ মোটা আছে—বাঃ। ধর্‌ দেখি!" এই বলে তারা লোলিকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরল। লোলি তখন "মেরো না, মেরো না—আমি সত্যিকারের শুয়োর নই" ব'লে প্রাণ-পণে চেঁচিয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে লোলির কানের কাছেই কে যেন "হো-হো" করে হেসে উঠল, আর লোলি ধড়্‌ফড়্‌ করে লাফিয়ে উঠে দেখল, সে তখনও সেই খড়ের গাদার উপরেই রয়েছে—আর তার বাবা তার সামনে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসছেন, আর বলছেন, "স্বপ্নে বুঝি শুয়োর হবার শখ হয়েছিল? আচ্ছা হতভাগা ছেলে যা হোক!" লোলি কতক্ষণ বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ রগড়িয়ে আবার চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর বলল, "আমাদের শুয়োরটা?" তার বাবা বললেন, "ঐ তো! শুনছিসনে? ঐ শোন্‌।" লোলি শুনল, শুয়োরটা দিব্যি আরামে ঘঁৎ ঘঁৎ করে ডাকছে।

তখন লোলি বলল, "ভাগ্যিস্‌ পালায়নি!" তার বাবা বললেন, "তোমার মত গুণধর ছেলেকে পাহারার ভার দিয়েছি, শুয়োর যে পালায়নি এ তো আমার আশ্চর্য ভাগ্য বলতে হবে।" লোলি বলল, "এখন থেকে খুব ভাল করে পাহারা দেব, আর কক্ষনো ফাঁকি দিয়ে ঘুমোব না।"

গ্রন্থ-পরিচয়

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকা 'অতীতের ছবি' বাদ দিলে সুকুমার রায়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'আবোল তাবোল'। প্রকাশকাল : ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩। প্রকাশক ইউ. রায় অ্যানড সন্‌স, ১০০ গড়পার রোড, কলিকাতা। ভূমিকায় কবি লিখেছেন :

> **যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ-পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে। (কৈফিয়ৎ : গ্রন্থকার)।**

তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে প্রকাশিত হলেও রোগশয্যায় শায়িত কবি এ-গ্রন্থটির পরিকল্পনা, কবিতা নির্বাচন, প্রচ্ছদ-অঙ্কন এমনকি প্রুফ-সংশোধন করেছিলেন। অধিকাংশ কবিতা 'সন্দেশ' পত্রে প্রথম মুদ্রিত হয়। নিচে তার তালিকা দেওয়া হল। 'সন্দেশ' পত্রে প্রকাশকালে নাম ও বন্ধনীমধ্যে গ্রন্থে ব্যবহৃত নাম দেওয়া হয়েছে।

১৩২১ ॥ মাঘ : **খিচুড়ি**। ফাল্গুন : **আবোল তাবোল** [কাঠবুড়ো] চৈত্র : **আবোল তাবোল** [গোঁফ চুরি]।
১৩২২ ॥ বৈশাখ : **আবোল তাবোল** [লড়াই ক্ষ্যাপা]। জ্যৈষ্ঠ : **কাতুকুতু বুড়ো**। ভাদ্র : **আবোল তাবোল** [গানের গুঁতো]। ফাল্গুন : **আবোল তাবোল** [খুড়োর কল]।
১৩২৩ ॥ আষাঢ় : **আবোল তাবোল** [ছায়াবাজি]। শ্রাবণ : **কুমড়োপটাশ**। ভাদ্র : **আবোল তাবোল** [হাতুড়ে]। অগ্রহায়ণ : **সাবধান**। চৈত্র : **আবোল তাবোল** [হুঁকোমুখো হ্যাংলা]।
১৩২৪ ॥ আষাঢ় : **আবোল তাবোল** [দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্]। আশ্বিন : **নারদ! নারদ!**। মাঘ : **কি মুস্কিল**। চৈত্র : **চোর ধরা**।
১৩২৫ ॥ বৈশাখ : **আবোল তাবোল** [ভুতুড়ে খেলা]। জ্যৈষ্ঠ : **হেসো না** [রামগরুড়ের ছানা]। আষাঢ় : **ভয় কিসের?** [ভয় পেয়ো না]। শ্রাবণ : **দুঃখের কথা** [হাত দেখান]। আশ্বিন : **কিম্ভূত**। অগ্রহায়ণ : **আবোল তাবোল** [নেড়া বেলতলায় যায় কবার]। পৌষ : **বুড়ির বাড়ি**। মাঘ : **অবুঝ** [বুঝিয়ে বলা]। ফাল্গুন : **আহ্লাদী**।
১৩২৬ ॥ বৈশাখ : **কাঁদুনে**। জ্যৈষ্ঠ : **ঐ যা!** [ফস্‌কে গেল]। শ্রাবণ : **হুলোর গান**। ভাদ্র : **ডানপিটে**। আশ্বিন : **বিজ্ঞান পাঠ** [বিজ্ঞান শিক্ষা]।
১৩২৭ ॥ বৈশাখ : **জিজ্ঞাসু** [নোট বই]। আশ্বিন : **শব্দকল্পদ্রুম্**।
১৩২৮ ॥ আষাঢ় : **বাপ্‌রে** [বাবুরাম সাপুড়ে]। ফাল্গুন : **ট্যাঁশ্ গরু**।
১৩২৯ ॥ ভাদ্র : **একুশে আইন**। কার্তিক : **কেন?** [বোম্বাগড়ের রাজা]; **অবাক্ কাণ্ড**।
১৩৩০ ॥ জ্যৈষ্ঠ : **ভাল রে ভাল!** ভাদ্র : **পালোয়ান**।

এতদ্ব্যতীত, শিরোনামবিহীন কবিতাগুলি 'ছড়া : ছিটেফোঁটা' নামে সন্দেশ পত্রের বৈশাখ ১৩২৮ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।

'আবোল তাবোল' গ্রন্থের মুদ্রণকালে কবি পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক ছবি ও কবিতারই পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন; কিছু কবিতা পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রহণ করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে এরকম কবিতাগুলির 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত বা পাণ্ডুলিপির পাঠ সুকুমার সাহিত্যসমগ্র, তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৩৩০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী' থেকে 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত সমালোচনা এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> **আবোল-তাবোল**—শ্রী সুকুমার রায়, বি-এস্ সি., এফ্ আর্ পি এস্ কর্তৃক লিখিত ও চিত্রিত। প্রবাসীর আকারের ৫২ পৃষ্ঠার বই। বহুচিত্রে ভূষিত। দামের উল্লেখ নাই। প্রকাশক ইউ রায় এণ্ড সন্স্, ১০০ গড়পার রোড, কলিকাতা। ১৩৩০।

সুকুমার রায়ের লেখার সঙ্গে বঙ্গদেশের শিশু-সমাজ সুপরিচিত; ইঁহার অকাল-বিয়োগে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইঁহার নানা সময়ের যে সব রঙ্গভরা রসরচনা "সন্দেশ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলিই সংগ্রহ করিয়া বই ছাপা হইতেছিল; দুঃখের বিষয় সুকুমারবাবু ইহার প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, তাঁহার মরণোত্তরকালে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। সুকুমারবাবু বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ উদ্ভট আজগুবি অসংলগ্ন কথায় আবোল তাবোল কবিতা-রচনা পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। শিশুরা সংলগ্ন চিন্তাধারা অপেক্ষা অসংলগ্ন আবোল তাবোল রচনায় আনন্দ অধিক পায়; কর্ম্মক্লান্ত প্রবীণেরাও এই অনাবিলহাস্যপূর্ণ রসরচনা সমানই উপভোগ করে। ভাব অসংলগ্ন, ভাষা আবোল তাবোল হইলেও রচনার বাক্যরীতি বিশুদ্ধ, ছন্দ ও মিল নিখুঁত সুন্দর; এই কবিতা পড়িলে শিশুদের ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে জ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা আনন্দের ভিতর দিয়া হইবে। এরূপ বই বাংলা-ভাষায় এই একমাত্র ও ইহা নূতন প্রবর্ত্তনা—এজন্য ইহার বিশেষ প্রচার ও সমাদর হওয়া উচিত।'

খাই খাই

প্রথম প্রকাশ : ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০। প্রকাশক সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির 'সন্দেশ' পত্রে মুদ্রণকাল দেওয়া হল। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত গ্রন্থে কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম পরিবর্তিত হয়েছিল; বর্তমান সংকলনে 'সন্দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত শিরোনাম গৃহীত হয়েছে।

১৩২২ ॥ বৈশাখ : **বর্ষ গেল, বর্ষ এল**। কার্তিক : **নন্দগুপী**।
১৩২৩ ॥ বৈশাখ : **গ্রীষ্ম**। আষাঢ় : **সঙ্গীহারা**। আশ্বিন : **হিতে বিপরীত**। অগ্রহায়ণ : **পড়ার হিসাব**। মাঘ : **কাজের লোক**। চৈত্র : **বর্ষশেষ**।
১৩২৪ ॥ বৈশাখ : **পাকাপাকি**। ফাল্গুন : **অসম্ভব নয়**।
১৩২৫ ॥ আষাঢ় : **বর্ষার কবিতা**। শ্রাবণ : **জীবনের হিসাব**। কার্তিক : **খাই খাই**; **তেজিয়ান**; মাঘ : **আড়ি**।
১৩২৬ ॥ বৈশাখ : **নিরুপায়**। আষাঢ় : **হরিষে বিষাদ**; **পরিবেষণ**। শ্রাবণ: **শ্রাবণে**। ভাদ্র : **নিঃস্বার্থ**। অগ্রহায়ণ-পৌষ : **আশ্চর্য**।
১৩২৭ ॥ আষাঢ় : **দাঁড়ের কবিতা**। শ্রাবণ : **মূর্খ মাছি**। ভাদ্র : **হারিয়ে পাওয়া**। মাঘ : **হিংসুটিদের গান**। ফাল্গুন : **সাধে কি বলে গাধা**। চৈত্র : **জালা-কুঁজো সংবাদ**; **নাচের বাতিক**।
১৩২৯ ॥ আশ্বিন : **বিষম চিন্তা**।

সন্দেশ পত্রিকায় ১৩২৩ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কাজের লোক' কবিতাটি যোগীন্দ্র-নাথ সরকারের 'খেলার গান' গ্রন্থে প্রথম সংকলিত হয়।

'সন্দেশ'-এ প্রকাশের সময়ে 'খাই খাই' কবিতাটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল, 'নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ "পার্ব্বণী" হইতে এই কবিতাটি গৃহীত হইল।' কিশোরদের জন্য প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা পার্ব্বণী-র সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২৫ সালের পুজোর আগেই এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

শিরোনামহীন সংক্ষিপ্ত রচনাগুলির মধ্যে প্রথম কবিতাটি 'সন্দেশ' পত্রে 'অন্' নামে আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যায় এবং অন্য দুটি রচনা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সূচনার কবিতাটি 'শব্দকল্পদ্রুম' নাটকের অন্তর্গত।

'খাই খাই' সিগনেট সংস্করণে প্রতিটি রচনা শ্রী সত্যজিৎ রায় চিত্রিত করেছিলেন; এই

অতীতের ছবি

এই পুস্তিকার প্রথম মুদ্রণের প্রচ্ছদে লিখিত আছে : 'বালক বালিকাদের জন্য/অতীতের ছবি/শ্রীসুকুমার রায়।' পুস্তিকার আকার দৈর্ঘ্যে ২৪ সি.এম. ও প্রস্থে ৯ সি.এম.। চতুর্থ প্রচ্ছদে ইউ. রায় অ্যানড সন্স নামাংকিত রয়েছে। কোনো সন-তারিখ উল্লিখিত নেই। সুকুমার রায়কে লিখিত কালীকৃষ্ণ ঘোষের একটি চিঠিতে জানা যায় : "তুমি এই মাঘোৎসব উপলক্ষে 'বালক বালিকাদের জন্য', 'অতীতের ছবি', নাম দিয়া যে একখানা পদ্যময় ছোট বই বাহির করিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম।..." চিঠির তারিখ ২৫ মাঘ, ১৩২৯; অর্থাৎ ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'মাঘোৎসব' সপ্তাহের অন্যতম অনুষ্ঠান বালক-বালিকা সম্মেলন উপলক্ষে পুস্তিকাটি প্রকাশিত ও বিতরিত হয়েছিল। সুকুমার রায় তখন অত্যন্ত অসুস্থ—আলোচ্য পত্রে তারও উল্লেখ রয়েছে : "...যাহারা তোমার বর্তমান রুগ্নাবস্থার কথা জানে তাহারা তোমার হৃদয়ের বল দেখিয়া স্তম্ভিত ও উৎফুল্ল হইবে।"

'অতীতের ছবি'র প্রথম ৮৮ লাইন 'সন্দেশ' ফাল্গুন ১৩২৯ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। সুবিমল রায় কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তিকার মুখপাতরূপে রামমোহন রায়ের চিত্র মুদ্রিত ছিল।

অন্যান্য কবিতা

'অন্যান্য কবিতা'র অন্তর্ভূত কবিতাগুলি এ-যাবৎ কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। আট বৎসর বয়সে সুকুমার রায়ের প্রথম রচনা 'নদী' শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রতিষ্ঠিত 'মুকুল' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; পর বৎসর, মুকুলের জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ সংখ্যায় 'টিক্ টিক্ টং' কবিতা মুদ্রিত হয়। এছাড়া, মুকুল পত্রে একটি দীর্ঘ কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়।

'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশের আগে সুকুমার রায়ের আর কোনো শিশুপাঠ্য কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় নি। 'সন্দেশ' পত্রের প্রথম বর্ষ থেকেই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়।

'সন্দেশ'-এর দুই সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের রচনা নামাংকিত থাকত না। তাছাড়া সম্পাদক হিসেবে সুকুমার রায় অন্য লেখকের রচনা যথেষ্টরকম সংশোধন ও পরিমার্জনা করতেন। সেহেতু, সুকুমার রায়ের রচনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দুঃসাধ্য ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, কবি স্বয়ং 'সন্দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা রেখে যান; কবিপত্নী সুপ্রভা রায় সেই তালিকাটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। 'অন্যান্য কবিতা'র কবিতাগুলি সেই তালিকা-অনুসারেই আহৃত হয়েছে। বিবিধ কারণে কবিতাগুলির প্রকাশকাল-অনুযায়ী মুদ্রণ সম্ভব হয় নি। কবির ভগিনী পুণ্যলতা চক্রবর্তী কয়েকটি কবিতা-সম্পর্কিত সমস্যা নিরসনে সহায়তা করেন।

'মুকুল'-এ প্রকাশিত বাল্য রচনাদ্বয় পরবর্তী খণ্ডে মুদ্রিত হবে। 'কানা-খোঁড়া সংবাদ' প্রথম প্রকাশিত হয় 'মুকুল', বৈশাখ ১৩১৩ সংখ্যায়; কবিতাটির একটি সংশোধিত রূপ কবি 'সন্দেশ', কার্তিক ১৩২৭ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটি এখানে গৃহীত হয়েছে।

১৩২০ ॥ অগ্রহায়ণ : **বেজায় রাগ**। পৌষ : **খোকা ঘুমায়**।

১৩২১ ॥ শ্রাবণ : **মেঘ**। চৈত্র : **দিনের হিসাব**।

১৩২২ ॥ বৈশাখ : **নূতন বৎসর; সন্দেশ**। জ্যৈষ্ঠ : **ছুটি**। আষাঢ় : **বেজায় খুসি**। পৌষ : **বড়াই**।

১৩২৩ ॥ কার্তিক : **লোভী ছেলে; কানে খাটো বংশীধর**।

১৩২৪ ॥ জ্যৈষ্ঠ : **আবোল তাবোল**। শ্রাবণ : **অন্ধ মেয়ে; ও বাবা!** ফাল্গুন : **সাহস**।

১৩২৫ ॥ জ্যৈষ্ঠ : **আজব খেলা**। কার্তিক : **ছুটি** (ঘুচবে জ্বালা...)।

১৩২৬ ॥ জ্যৈষ্ঠ : **লক্ষ্মী**। মাঘ ও ফাল্গুন : **আয়রে আলো আয়**। চৈত্র : **মনের মতন**।

১৩২৭ ॥ শ্রাবণ : **কত বড়**। কার্তিক : **আলোছায়া; কানা-খোঁড়া সংবাদ**। পৌষ : **আদুরে পুতুল**। ফাল্গুন : **মেঘের খেয়াল**।

১৩২৮ ॥ বৈশাখ : **ভারি মজা; ছিটেফোঁটা।** আষাঢ় : **নাচন।** চৈত্র : **বিচার।**

১৩২৯ ॥ বৈশাখ : **বন্দনা।** জ্যৈষ্ঠ : **ছিটেফোঁটা।** আষাঢ় : **খোকার ভাবনা; বুঝবার ভুল।** শ্রাবণ : **'ভাল ছেলের' নালিশ; ছবি ও গল্প।** আশ্বিন : **বাবু।** কার্তিক : **শিশুর দেহ।**

১৩৩০ ॥ বৈশাখ : **বিষম ভোজ।** জ্যৈষ্ঠ : **গ্রীষ্ম।** আষাঢ় : **বিষম কাণ্ড।** কার্তিক : **আনন্দ; কিছু চাই?**

১৩৩১ ॥ ফাল্গুন : **সম্পাদকের দশা।**

'মেঘ' কবিতাটির 'সন্দেশ' পত্রে মুদ্রণকালে কোনো শিরোনাম ছিল না। 'সন্দেশ' কবিতাটি একটি রঙিন চিত্রের পরিচায়ক হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল। 'আবোল তাবোল' কবিতাটি আবোল তাবোল গ্রন্থের 'গল্প বলা' কবিতার রূপান্তর। 'অন্ধ মেয়ে' কবিতাটি সন্দেশ-এ 'রামধনু' নামে মুদ্রিত হয়েছিল; পত্রিকাতে নাম কেটে কবি পেন্সিলে 'অন্ধ মেয়ে' নাম লিখে রেখেছিলেন।

'সম্পাদকের দশা' সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর সুবিনয় রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় মূল কবিতার শেষাংশ বাদ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল; পরে সিগনেট প্রেস প্রকাশিত 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সেই পাঠ গৃহীত হয়। সম্পূর্ণ কবিতাটি ননসেন্স ক্লাবের মুখপত্র '৩২॥· ভাজা' হস্তলিখিত পত্রিকায় লিখিত ছিল। সেই পত্রিকা থেকে বর্জিত অংশ ও কবির মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হল :

হে পাঠক জ্ঞানবান, কর সবে অবধান।
উপদেশ লভ এই হ'য়ে অতি সাবধান॥
১। সম্পাদকী কাজ পাওয়া—সৌভাগ্য সে অতিশয়।
কিন্তু সেটা নহে ঠিক আদ্যোপান্ত মধুময়॥
২। তোমাদের সম্পাদক—সেও ত মানুষ বটে।
বৃথা যেন তার পরে অত্যাচার নাহি ঘটে॥
যদি এ পত্রিকা তব নাহি হয় মনোমত।
কিন্তু যদি "৩২॥·" বন্ধ থাকে মাসকত॥
কিম্বা যদি অন্যরূপে দোষত্রুটি ঘটে তবু।
সম্পাদকে গালি দেওয়া উচিত না হয় কভু॥
৩। লেখকবৃন্দের প্রতি আছে এক নিবেদন।
না লিখেন কভু যেন গুরুপাক বিবরণ॥
পেচকের মত সবে হাঁড়িমুখ নিরবধি।
গম্ভীর গম্ভীরতম প্রবন্ধ লিখেন যদি॥
নির্ঘাৎ জানিহ তবে, ধ্রুব সত্য অতি খাঁটি।
নিস্ফূর্তি নির্জীব সভা একদম হবে মাটি॥
অতএব কহি শুন ছাড় শুষ্ক নীরবতা।
পেট ভরে হাস আর শুনাও হাসির কথা॥

নচেৎ এ সম্পাদক হতাশ্বাস হয়ে শেষে।
একেবারে দিবে ছুট্ জনহীন দূর দেশে॥

উৎসাহের চোটে পদ্য লিখিয়া ফেলিলাম—লেখকগণ অতি সূক্ষ্মভাবে কবিতার ভাষাগত বা ছন্দোগত দোষ গুণ বিচার না করিয়া ইহার মর্মগ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইলে সম্পাদক বেচারা বাধিত হইবে।

হ য ব র ল

১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যার 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'হ য ব র ল' ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হিজিবিজি' গ্রন্থে সুকুমার রায়ের লেখা ও আঁকা 'হ য ব র ল' নামে

একটি অংশ আছে। এটি হিজিবিজবিজ-র প্রথম সংস্করণে (১৯১৬) নয়, পরবর্তী কোনো সংস্করণে সংকলিত হয়।

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর এক বৎসর পরে 'হ য ব র ল' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। প্রকাশক ইউ. রায় এন্ড সন্স। বইটির আকার দৈর্ঘ্যে ৭½ ইঞ্চি, প্রস্থে ৪¾ ইঞ্চি। একই আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১১৭/১ বহুবাজার স্ট্রিটে অবস্থিত ইউ. রায় এন্ড সন্স থেকে। রায় পরিবারের কাছ থেকে তখন এই কোম্পানি কিনে নিয়েছেন সুধাবিন্দু বিশ্বাস। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৮-এর শ্রাবণে। মূল্য : পাঁচ আনা। প্রথম দুটি সংস্করণের বিচারসভার রঙীন মুখপাতটি পরবর্তী কোনো সংস্করণেই মুদ্রিত হয়নি। পরবর্তী সংস্করণ ৬½″×৫″ আকারে প্রকাশিত হয় ১৩৫২-য় সিগনেট প্রেস থেকে। 'সন্দেশ'-এ বা প্রথম দুটি সংস্করণের পাঠের সঙ্গে বহু গরমিল রয়েছে সিগনেটের এই সংস্করণ বা পরবর্তী যাবতীয় সংস্করণের। সিগনেটের এই সংস্করণের জন্য শ্রী সত্যজিৎ রায় তেরোটি স্কেচ করেছিলেন, নতুন প্রচ্ছদও রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সিগনেট সংস্করণে অবশ্য পুরনো মলাটই ব্যবহার হয়, শ্রী সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবিগুলি বর্জিত হয় ও বইটি আবার লম্বাটে ধাঁচ গ্রহণ করে—খাড়াই ৬ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ৯¼ ইঞ্চি। বর্তমান গ্রন্থে হ য ব র ল-র 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

১৩৩১ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী' থেকে 'হ য ব র ল' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত সমালোচনা এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> **হ য ব র ল**—সুকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক ইউ. রায় এন্ড সন্স্, ১০০ গড়পার রোড, কলিকাতা। দাম পাঁচ আনা। ১৩৩১।
>
> ছেলেমেয়েদের উপযোগী গল্পের বই। হযবরল বলিতে যে আবোল তাবোলের ভাব বুঝায়, বইখানিতে তাহা পুরা-মাত্রায় বর্ত্তমান। বড় হইয়া এবং লেখাপড়া জানিয়া বয়সের ও বিদ্যার গাম্ভীর্য্য ডিঙাইয়া বুদ্ধির পরিণতির গণ্ডী ছাড়াইয়া, পরিণত মনকে শিশুর মনের অনুযায়ী করিয়া শিশুর মতন ভাবিয়া লেখা খুব শক্তির কাজ। বর্ত্তমান বইটিতে গ্রন্থকারের সে শক্তি আশ্চর্য্য ও চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। ছোট-ছেলেদের একচিন্তা আর এক-চিন্তা হইতে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে,—তাহাদের মধ্যে ক্ষীণ যে যোগসূত্র থাকে তাহা সব সময় ধরিতে পারা যায় না। গ্রন্থকার সেইরকম লম্ফনশীল চিন্তাগুলিকে গাঁথিয়া একটি গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা তাঁহার শিশু মনের ও শিশু মনোভাবের আশ্চর্য্য পরিচয়। বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে এমন এক শিশু প্রাণ, শিশু হিতৈষী লেখককে আমরা অকালে হারাইয়াছি। গল্পটির মাঝে মাঝে যে সব পরিচায়ক চিত্র দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সুন্দর। মলাটটি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরঞ্জক হইয়াছে। বইটি ছেলেমেয়েদের প্রচুর আনন্দ দিবে।

পাগলা দাশু

'পাগলা দাশু' প্রথম প্রকাশিত হয় ২২ নবেম্বর ১৯৪০। প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার অ্যানড সন্স, কলকাতা। সুপ্রভা রায়ের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির একটি ভূমিকা লিখে দেন। 'পাগলা দাশু'র প্রথম মুদ্রণে ভূমিকাটি ব্যবহৃত হয়; পরবর্তী সিগনেট সংস্করণে বর্জিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সেই ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত হল :

১. ৬. ৪০

> সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাব সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের

মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলা ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুকুমারের হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকালমৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ।

'পাগলা দাশু'র এই প্রথম মুদ্রণটি দুষ্প্রাপ্য। এই সংস্করণে অন্য কিছু গল্প সংযোজিত ছিল যেগুলি পরবর্তী সংস্করণে যায় নি।

পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করেন সিগনেট প্রেস। প্রকাশকাল : ২২ জুন ১৯৪৬। সুকুমার রায়ের আঁকা দুটি ছবি বাদে এ-গ্রন্থের অন্য ছবিগুলি শ্রী সত্যজিৎ রায় এঁকেছিলেন। এই সংকলনে লেখক-অঙ্কিত ছবি শুধু মুদ্রিত হল। সিগনেট সংস্করণের পারম্পর্যই এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

'পাগলা দাশু'-র সমস্ত গল্প 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুকুমার রায় 'সন্দেশ'-এর বাঁধানো ফাইলে কিছু কিছু গল্প স্বয়ং সম্পাদনা করেছিলেন। শ্রী সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের ১৩২৪ ও ১৩২৫ সালের 'সন্দেশ' তার সাক্ষী। কিন্তু সিগনেট সংস্করণে প্রকাশের সময়ে অধিকাংশ গল্পের ক্ষেত্রে 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত পাঠই অনুসরণ করা হয়। যদিও তাতে যতি চিহ্ন, প্যারাগ্রাফ-ভাঙা ও ভুলত্রুটি কম ছিল না। ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধু ১৩২৩ সালে 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত তিনটি গল্পের ক্ষেত্রে—'আশ্চর্য কবিতা', 'জগ্যিদাসের মামা' ও 'পাগলা দাশু'র সিগনেট সংস্করণভুক্ত পাঠের সঙ্গে 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত পাঠের বহু অমিল। অনুমান করা যায় এই সংশোধিত, সম্মার্জিত পাঠও স্বয়ং সুকুমার-কৃত, কিন্তু দুঃখের কথা সুকুমার-সম্মার্জিত ১৩২৩ সালের 'সন্দেশ'-এর কোনো ফাইল খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বর্তমান সংকলনে উপরোক্ত গল্প তিনটি সহ 'চীনে পটকা', 'চালিয়াৎ', 'পেটুক', 'সবজান্তা', 'নন্দলালের মন্দ কপাল', 'ডিটেকটিভ', 'দাশুর কীর্তি' ও 'কালাচাঁদের ছবি'র লেখক-সংস্কৃত পাঠ ও অবশিষ্ট গল্পের ক্ষেত্রে 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। 'ভোলানাথের সর্দারি' গল্পটির লেখক-সম্মার্জিত একটি মাত্র পাতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গল্পগুলির প্রকাশকাল ও সম্মার্জিত বারোটি গল্পের 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত আদি পাঠের প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে মুদ্রিত হল :

১৩২৩ ॥ জ্যৈষ্ঠ : **আশ্চর্য কবিতা**। আষাঢ় : **নূতন পণ্ডিত**। শ্রাবণ : **জগ্যিদাসের মামা**। মাঘ : **পাগলা দাশু**।

১৩২৪ ॥ বৈশাখ : **চীনে পট্‌কা**। জ্যৈষ্ঠ : **চালিয়াৎ**। শ্রাবণ : **পেটুক**। ভাদ্র : **সবজান্তা**। আশ্বিন : **নন্দলালের মন্দ কপাল**। কার্তিক : **ডিটেকটিভ**। চৈত্র : **দাশুর কীর্তি**।

১৩২৫ ॥ আষাঢ় : **কালাচাঁদের ছবি**। চৈত্র : **ভোলানাথের সর্দারি**।

১৩২৬ ॥ চৈত্র : **ব্যোমকেশের মাঞ্জা**।

১৩২৭ ॥ আষাঢ় : **আজব সাজা**।

১৩২৮ ॥ ফাল্গুন : **ভুল গল্প**।

১৩২৯ ॥ বৈশাখ : **ভুল গল্প** (উত্তর), **যতীনের জুতো**। আশ্বিন : **দাশুর খ্যাপামি**। কার্তিক : **সবজান্তা দাদা**।

১৩৩০ ॥ আষাঢ় : **গোপালের পড়া**।

॥ পাঠান্তর ॥

আশ্চর্য কবিতা

প্রথম লাইনের পরিবর্তে : চণ্ডীপুরের ইংরাজী ইস্কুলে আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। তার বয়স বারো চৌদ্দর বেশি নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের "আহা যদি থাক্‌ত তোমার...ডানা"-র পরিবর্তে :

"আহা, যদি থাকত তোমার ল্যাজ এবং ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—করত না কেউ মানা!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদের "একখানা আস্ত খাতা-র স্থানে!"

একখানা দু পয়সার খাতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের অন্তে যুক্ত হবে :

শুনিয়া কেহ কেহ আরও অবাক হইয়া গেল—কাহারও কাহারও হিংসা আরও দ্বিগুণে জ্বলিয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদের "ওরা যদি পরের বাড়ি সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে?"-র পরে যুক্ত হবে :

ওরা যদি নিজেদের গলায় ছুরি বসায়, দেখাদেখি তুমিও বসাবে?

নবম পরিচ্ছেদের শেষ লাইনের পর যুক্ত হবে :

এই গল্পটি বোধ হয় অনেকেরই মনে লাগিয়াছিল! বোধ হয় অনেকেই মনে মনে স্থির করিয়াছিল, "ইন্‌স্পেক্টার আসিলে তাঁহাকে কবিতা শুনাইতে হবে।"

শেষ পরিচ্ছেদের কবিতার পরিবর্তে :

পদে পদে মিল খুঁজি, গুণে দেখি চোদ্দ
মনে করি লিখিতেছি ভয়ানক পদ্য!
হয় হব ভবভূতি নয় কালিদাস
কবিতার ঘাস খেয়ে চরি বারো মাস।

জগ্যিদাসের মামা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের '"সমাস কর।"...থাক"' অংশের পরিবর্তে :

সে বেচারা ভয় খেয়ে বল্‌ল, "যোগ্য ছিল দাস—হ'ল যোগ্যদাস—অর্থাৎ—"; পণ্ডিত মশাই বললেন, "থাক, থাক আর বল্‌তে হবে না"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে যুক্ত হবে :

এমনি করে জগ্যিদাস আমাদের ক্লাশে ভর্তি হল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের "তখন বাড়ি ঘর সব থরথর করে কেঁপে উঠত"-র পরিবর্তে :

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুলিশ নিয়ে ছুটে আসত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের "এক-একবার ছুটি হত...কাগজে ছাপবার মতো।"-র স্থানে :

এক-একবার ছুটি হত...সন্দেশে ছাপবার মতো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের "আমি বললাম, 'ফটোতে তো কালো...ফরসা হয়ে এসেছেন।'"-এর পরিবর্তে :

আমি বললাম, "সে কি! তোমার মামার ফটোতে ত দাড়ি ছিল না—"। জগ্যিদাস বলল, "আজকাল দাড়ি রেখেছেন।" আমি বললাম, "ফটোতে ত কালো দেখছিলাম।" জগ্যিদাস বলল, "এবার দার্জিলিং গিয়ে ফর্সা হয়ে এসেছেন।"

প্যাগলা দাশু

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : "আমাদের ইংরাজি পড়াইতেন বিষ্টুবাবু...জ্যাঠামি বিদ্যা শিখচ বুঝি?" অংশের পাঠান্তর :

তারপর কয়দিন দাশু জগবন্ধুর সহিত কথা বার্তা কহে নাই। পণ্ডিত মহাশয় রোজ ক্লাসে আসেন, আর যখন দরকার হয় জগবন্ধুর কাছে বই চাহিয়া ল'ন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় "উপক্রমণিকা" চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ের মলাট দেওয়া "উপক্রমণিকা" খানা বাহির করিয়া দিল। পণ্ডিত মহাশয় বইটি খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানা কার?" জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, "আমার।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "হুঁ, —নূতন সংস্করণ বুঝি? বই-কে বই একেবারে বদ্‌লে গেছে" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন—"যশোবন্ত দারোগা—লোমহর্ষক ডিটেক্‌টিভ নাটক।" জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত তাকাইয়া রহিল। পণ্ডিত মহাশয় বিকট রকম চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "স্কুলে আমার আদুরে গোপাল, আর বাড়িতে বুঝি নৃসিংহ অবতার?"

চীনে পটকা

প্রথম পরিচ্ছেদের 'আমাদের রামপদ তার জন্মদিনে'-র স্থানে :

আমাদের রামপদ একদিন...

প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে যুক্ত হবে :

পাগলা দাশু কে? পাগলা দাশুর কথা জান না? সেই যে যশুরে কৈ-এর মত চেহারা, রোগা ছেলেটা যে আমাদের বোকা বানাইয়াছিল, সেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'দারোয়ানের ছাগলটাকে'-র স্থানে : 'দারোয়ানের কুকুরটাকে'।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষ লাইনের পরিবর্তে :

দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের ফল খুব আশ্চর্য রকম পাওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'নিচের ক্লাশের ছেলেরা...তারাও হঠাৎ'-এর পরিবর্তে :

নিচের ক্লাশের ছেলেরা চিৎকার করিয়া "কড়াকিয়া" মুখস্ত আওড়াইতেছিল—গোলমালে তারাও হঠাৎ...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের 'পাঁচ মিনিট ধরিয়া'-র পরিবর্তে : মিনিট পাঁচেক।

অষ্টম পরিচ্ছেদের 'তারপর পণ্ডিত মহাশয়...বলিলেন,...'-এর পরিবর্তে :

তারপর পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় বাঁকাইয়া গম্ভীর গলায় হুঙ্কার দিয়া বলিলেন,...

চালিয়াৎ

প্রথম পরিচ্ছেদের শুরুতেই যুক্ত হবে :

শ্যামচাঁদ আমাদের নিচের ক্লাসে পড়িত, কিন্তু তার দেমাকের দৌরাত্ম্যে সমস্ত স্কুলশুদ্ধ ছেলে অস্থির হইয়া থাকিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'এই জন্য সর্বদাই...সকলেই ভাবিত...'-এর পরিবর্তে :

এই জন্য সর্বদাই সে অনাবশ্যক রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথায় বার্তায় ধরণেধারণে ইংরাজি বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মত ভাব প্রকাশ করিত, যে স্কুলের দারোয়ান হইতে নিচের ক্লাসের ছাত্র পর্যন্ত সকলেরই তাক্ লাগিয়া যাইত—সকলেই ভাবিত...

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'পাঁড়েজি দারোয়ানকে...এই!'-এর পরিবর্তে :

পাঁড়েজি দারোয়ানকে সে একদিন রীতিমত ধমক লাগাইয়া বসিল—"এইও!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের '"হাঁ, হাঁ, আভি...ছোট ছেলে'-এর পরিবর্তে :

"হাঁ, হাঁ, আভি হামি রেংলিট কর্‌বে।" পাঁড়েজির উপর একচাল চালিয়া শ্যামচাঁদ ক্লাসে ফিরিতেই, কতগুলো ছোট ছেলে...

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে যুক্ত হবে :

ব্যাপার দেখিয়া আমরা সবাই বলিলাম, "চালিয়াৎ!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'একবার আমাদের একটি...সম্বোধন করিলেন!'-এর স্থানে :

একবার আমাদের একটি নূতন মাস্টার আসিয়াছিলেন, তিনি শ্যামচাঁদকে বেজায় অপ্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথমত তিনি ক্লাসে আসিয়াই শ্যামচাঁদকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদের '"ও বুঝেছি, পিচ্‌কিরি বুঝি?'-র পরে যুক্ত হবে :

এই খানে টিপে দিলেই ছরর্‌র্ ক'রে কালি বেরুবে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদের অন্তে যুক্ত হবে :

সেই দিন হইতে ক্লাসে তাহার 'খোকা' নাম ঘুচিল—কিন্তু আমরা আরও বেশি করিয়া বলিতাম—"চালিয়াৎ"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের শুরুতে যুক্ত হবে :

যাহা হউক চালিয়াতের চালচলনের আলোচনা চলিতে চলিতে...

চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'একখানা পাঁউরুটির মধ্যে ঘড়িটাকে'র স্থানে :

একটা বাতাবি লেবুর মধ্যে ঘড়িটাকে...

চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষে যুক্ত হবে : আমরা বলিলাম "কি চালিয়াৎ!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'হায় হায়—আমি ভদ্রলোকদের কাছে...ওহে, ওসব তামাসা এখন রাখ,...'-এর স্থানে :

"হায় হায়—আমি ভদ্রলোকদের কাছে মুখ দেখাই কি ক'রে? এই ছোকরাই আমার সর্বনাশ করল! কেনই বা ওর কাছে দিতে গেছিলাম? ওহে ছোকরা, ওসব তামাসা এখন রাখ,...

পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের পিছন হইতে...'-র স্থানে :

ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের মধ্য হইতে...

গল্পের শেষে সংযুক্ত হবে একটি পরিচ্ছেদ :

তারপর ছুটির পরে সবাই আমরা ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু চালিয়াৎকে আর দেখা গেল না। শুনিলাম, সে নাকি কলিকাতায় কোন বড় স্কুলে পড়িতে গিয়াছে। শুনিয়া আবার সকলে একবাক্যে বলিলাম—"বেজায় চালিয়াৎ"!

পেটুক

তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'তবু হ্যাংলামি তার আর যায় না'-র পরে যুক্ত হবে :

সেই যে এক বিষম পেটুকের গল্প শুনেছিলাম—সে একদিন এক বড় নেমন্তন্নের দিনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, "আজ আমি নেমন্তন্নে যাব না।" সবাই বললে, "কি ভয়ানক! তুমি এমন ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা করছ কেন?" কিন্তু সে কারও কথা শুনল না, ঘরের মধ্যে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল, আর সকলকে বলে দিল "ভাই, তোমরা আমার ঘরের বাইরে তালা লাগিয়ে দাও।" পেটুক মশায় ঘরের মধ্যে বন্ধ আছেন, কিন্তু মনটাকে ত আর বন্ধ ক'রে রাখা যায় না—মনটা তার ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই নেমন্তন্নের জায়গায়। সে ভাবছে—"এতক্ষণে বোধহয় আসন পেতেছে আর পাত পড়েছে—এইবারে বোধহয় খেতে ডাকছে। কি খেতে দিচ্ছে? লুচি নিশ্চয়ই? লুচি আর বেগুন ভাজা দিয়ে গেছে—এবার ডাল তরকারি ছক্কা সব আসছে। তা আসুক, আমি ত আর যাচ্ছি না?—এইবারে কি মাছের কালিয়া?—তারপরে মাংস বুঝি?—তা হোক না—আমি ত আর যাচ্ছি না? মাংসটা না জানি কেমন রেঁধেছে! সেবারে ওদের বাড়ি রান্না অতি চমৎকার হয়েছিল। অবিশ্যি এখনও সময় আছে—কিন্তু থাকলেই বা কি? আমি ত যাচ্ছি না। যাক্ এতক্ষণে টক দেওয়া হয়েছে—এইবার দই সন্দেশ রাবড়ি—আর রসগোল্লা! ঐ যা ফুরিয়ে গেল ত!" বলেই একলাফে জানলা টপকিয়ে—হাঁপাতে হাঁপাতে সে নেমন্তন্নের জায়গায় গিয়ে হাজির!—

আমাদের হরিপদর দশাও ঠিক তাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'কিন্তু দু দিন না যেতেই আবার যেই সেই।'-এর পরে যুক্ত হবে :

তাই সবাই বলে—"কাবু হলেই 'আর গাব খাব না', আর তাজা হলেই 'গাব খাব না ত খাব কি'?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'সেইগুলো একবার ছড়িয়ে দিলেই...'-এর স্থানে :

সেইগুলো পাড়াময় ছড়িয়ে দিলেই...

পঞ্চম পরিচ্ছেদের '"হ্যাঁ বড়মামা—তার মধ্যে প'চটা খুব বড় বড় ছিল!'-র স্থানে :

"হ্যাঁ বড়মামা—তার মধ্যে সাতটা খুব বড় বড় ছিল।"

সবজান্তা

'সন্দেশ'-এর বাঁধানো ফাইলে সুকুমার রায় এই গল্পটি প্রথম সম্পাদনার পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ এবং অষ্টম পরিচ্ছেদ থেকে শেষ অবধি পুরো কেটে বাদ দিয়েছিলেন। বইয়ের মধ্যে আঠা দিয়ে লাগানো একটি রুল-টানা সাদা পাতা নির্দেশ করছে, গল্পটির শেষাংশ নূতন ভাবে লেখার কথা ভেবেছিলেন তিনি, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পাঠ তাঁর প্রথম সম্পাদনা অনুসারী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'একখানা বেঞ্চের উপর...বসিয়া থাকিতাম।'-এর স্থানে :

একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া অত্যন্ত ভালমানুষের মত পড়াশুনা করিতাম।'

সপ্তম পরিচ্ছেদের 'একদিন সবজান্তা আসিয়া...দার্জিলিং গিয়াছিল,'-এর স্থানে :

একদিন শুনা গেল লোহাপুরের জমিদার রামলাল বাবু আমাদের স্কুলে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন—একটি "ফুটবল গ্রাউণ্ড" ও খেলার সরঞ্জামের জন্য। আরও শুনিলাম রামলালবাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন

রীতিমত ভোজের আয়োজন হয়। কয়দিন ধরিয়া এই খবরটাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। কবে ছুটি পাওয়া যাইবে, কবে খাওয়া এবং কি খাওয়া হইবে, এই সকল বিষয় জল্পনা চলিতে লাগিল।

সবজান্তা দুলিরাম বলিল যেবার সে দার্জিলিং গিয়াছিল,...

সপ্তম পরিচ্ছেদের 'নানা অসম্ভব রকম গল্প বলিত'-র স্থানে :

নানা অসম্ভব রকম গল্প চালাইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদের 'একদিন টিফিনের সময় উঠানের বড় সিঁড়িটার উপর'-এর স্থানে :

একদিন টিফিনের সময় স্কুলের সামনে ঐ বড় সিঁড়িটার উপর...

অষ্টম পরিচ্ছেদের 'ইনি সেটা শুনবার জন্য আগ্রহ করছেন'-এর স্থানে :

ইনি সেটা শুনবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন...

অষ্টম পরিচ্ছেদের 'সাহেব মেম সবাই শুনতে চাই।'-এর স্থানে : সবাই শুনতে চায়।

নন্দলালের মন্দ কপাল

প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনের শুরুতে যুক্ত হবে : অবশ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে যুক্ত হবে : এ ভারি অন্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে যুক্ত হবে :

কেহ কেহ বলিল "নন্দলাল চটো কেন?" গোল্লা পাইয়াছ, তার জন্য কোথায় লজ্জিত হওয়া উচিত, না তুমি খামখা রাগিয়াই অস্থির!" নন্দলাল রাগিয়া আগুন হইল। কি! এতবড় কথা!

তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'সমস্ত ছুটিটাই মাটি!'-র স্থানে : ছুটির অর্ধেকটাই মাটি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'ক্লাসের মধ্যে খুদিরাম...জানে'-র স্থানে :

খুদিরাম পণ্ডিত মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র—ক্লাসের মধ্যে সেই যা একটু সংস্কৃত জানে—

পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'পরীক্ষার সময় অম্নি...প্রাইজ পেতে হবে না।'-র স্থানে :

পরীক্ষার সময় অম্নি ভুল করলেই বাছাধন গেছেন! তাহলে এবার আর ওঁকে সংস্কৃতের প্রাইজ পেতে হবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের '"কি হে নন্দলাল,......থতমত খাইয়া থামিয়া গেল।'-র স্থানে :

"কি হে নন্দলাল, আজকাল বাড়িতে কিছু পড়াশুনা কর না নাকি? তা না হ'লে সব বিষয়েই যে তোমার এমন দুর্দশা হচ্ছে তার অর্থ কি? বাড়িতে কি পড় বল দেখি!" নন্দ আরেকটু হইলেই বলিয়া ফেলিত "আজ্ঞে সংস্কৃত পড়ি"। কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ সামলাইয়া "আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়" বলিয়াই সে ভারি থতমত খাইয়া থামিয়া গেল। মাস্টার মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন "আজ্ঞে সংস্কৃত না সংস্কৃত নয় এর অর্থ কি?"

সপ্তম পরিচ্ছেদের 'এমন সময় একজন ছোকরা...'-র স্থানে : এমন সময় একজন...

সপ্তম পরিচ্ছেদের 'নন্দও খুব উৎসাহ করিয়া'র স্থানে : নন্দও খুব হো হো-করিয়া...

শেষ পরিচ্ছেদের 'কয়েকটি ঘুঁষি লাগাইয়া দেয়।'-এর পরে যুক্ত হবে :

তাহার এত চেষ্টার ফল কিনা এই হইল!

ডিটেকটিভ

প্রথম পরিচ্ছেদের 'জানলার গায়ে...ঠেকিয়ে বলবে যে,'-র স্থানে :

রোজ রাত্রে জানলার কাছে চাতালের উপর বাসনগুলো রেখে দিতে। চোরের বাছা যদি আসতে চান,

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'সে বল্‌ল, "ঐ আহাম্মক রামদহিনটা...চোর কিন্তু আর ধরাই পড়ল না।'-র স্থানে :

সে বল্‌ল, "আমি যে রকম প্ল্যান করেছিলাম, তাতে চোর একবার বাড়িতে ঢুকলে তাকে আর পালাতে হ'ত না—কিন্তু ঐ আহাম্মক রামদহিনটার বোকামিতে সব মাটি হয়ে গেল। যাক আমার জিনিষ চুরি ক'রে তাকে আর হজম করতে হবে না। বাছাধন যে দিন আমার হাতে ধরা পড়বেন, সেদিন বুঝবেন ডিটেক্‌টিভ কাকে বলে। কিন্তু যা হোক্‌, চোরটা খুব সেয়ানা বলতে হবে। যোগেশবাবুদের বাড়িতে যেটা গেছিল সেটা আনাড়ির এক শেষ। আমাদের বাড়িতে এলে সে ব্যাটা টের

পেত।" কিন্তু দু মাস গেল চার মাস গেল ক্রমে বছরও কেটে গেল, কিন্তু সে চোর আর ধরাই পড়ল না।

দাশুর কীর্তি

প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে যুক্ত হবে :

স্কুলে এসে আমাদের কাছে বসতে না বস্‌তেই সে দুঃখ একেবারে উথলিয়ে উঠল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের 'কাল তুই সেখানে ছিলি...সব খুলে বলবি কিনা?"'-র পরিবর্তে :

তুই সেখানে ছিলি কিনা, আর কি রকম কি মেরেছিল সব খুলে বলবি কি না?"

কালাচাঁদের ছবি

প্রথম পরিচ্ছেদের '"তোমায় গাল দিয়েছিল?" "না"।'-র পরে যুক্ত হবে :

"ধমকিয়েছিল?" "না।" "তবে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'কালো কাপড় পরা মেয়ে মানুষটি'-র স্থানে :

ঝাপসা কাপড় পরা মেয়ে মানুষটি

তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'ওটা বনে আগুন লেগে'-র স্থানে :

ওটা গাছে আগুন লেগে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের 'কালাচাঁদ আমার কান ধরে টানতে লাগল।'-র স্থানে :

কালাচাঁদ আমার কান ধরে মারতে লাগল।

নিম্নোক্ত সপ্তম পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছিলেন সুকুমার 'সন্দেশ'-এর ফাইলে :

ব্যাপার কি বোঝা গেল না, তাই সন্ধ্যায় সবাই মিলিয়া কালাচাঁদের বাড়িতে গেলাম। আমি বলিলাম, "ভাই কালাচাঁদ, আমরা তোমার সেই ছবিটা দেখতে চাই। সেই যে সমুদ্র লঙ্ঘন না কি যেন?" রমাপ্রসাদ বলিল, "দুৎ, সমুদ্র লঙ্ঘন কিসের? অগ্নিপরীক্ষা।" আর একজন কে যেন বলিল, "না, না, কি একটা বধ।" কেন জানি না, কালাচাঁদ হাঁ হাঁ করিয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। "যাও যাও ইয়ার্কি করতে হবে না," বলিয়া সে তাহার ছবির খাতাখানি ফড়ফড় করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল—আর রাগে গজরাইতে লাগিল। আমরা হতভম্ব হইয়া রহিলাম। সকলেই বলিলাম, "কালাচাঁদের মাথায় বোধহয় একটু পাগলামির ছিট্‌ আছে। নইলে সে খামকা এত রাগ করে কেন?"

ভোলানাথের সর্দারি

প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনের পরে যুক্ত হবে :

এইজন্য গুরুজনেরা তাহাকে বলেন 'জ্যাঠা'—আর সমবয়সীরা বলে 'ফড়ফড়ি রাম'! কিন্তু তাহাতে তাহার কোনো দুঃখ নাই, বিশেষ লজ্জাও নাই।

বহুরূপী

'সন্দেশ' পত্রিকা থেকে আরও কিছু গল্প সংগ্রহ করে ১৯৪৪ সালে সিগনেট প্রেস 'বহুরূপী' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে কিছু ছড়াও গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়। 'পাগলা দাশু'র মত এ-পুস্তকটিও শ্রী সত্যজিৎ রায় চিত্রিত করেন। বর্তমান সংকলনে সুকুমার রায়ের আঁকা ছবি-দুটি শুধু রাখা গেল, তন্মধ্যে একটি ছবি এই প্রথম গ্রন্থভূর্ত হল।

সিগনেট সংস্করণে কিছু গল্পের নাম পরিবর্তিত হয়েছিল; বর্তমান সংকলনে 'সন্দেশ' পত্রে মুদ্রিত শিরোনাম অনুসৃত হয়েছে। লেখক-কৃত নাম ও তৎপার্শ্বে বন্ধনী মধ্যে সিগনেট সংস্করণে ব্যবহৃত নাম দেওয়া হল। সংকলনের গল্প চয়নে কালানুক্রম রক্ষার চেষ্টা হয়েছে।

১৩২২ ॥ ফাল্গুন : **গল্প।**

১৩২৩ ॥ কার্তিক : **দ্রিঘাংচু।**

১৩২৪ ॥ পৌষ : **এক বছরের রাজা।** চৈত্র : **হিংসুটী।**

১৩২৫ ॥ অগ্রহায়ণ : **দুই বন্ধু।** ফাল্গুন : **গরুর বুদ্ধি।**

১৩২৬ ॥ মাঘ ও ফাল্গুন : **ছাতার মালিক** (গিরগিটির খুড়তুতো ভাই)। চৈত্র : **অসিলক্ষণ পণ্ডিত।**

১৩২৭ ॥ আষাঢ় : **ব্যাঙের রাজা।** ভাদ্র : **ডাকাত নাকি!** আশ্বিন : **ছড়া : ছিটেফোঁটা।**

অগ্রহায়ণ : **পুতুলের ভোজ।**
১৩২৮ ॥ বৈশাখ : **উকীলের বুদ্ধি** (ব্যা)।
১৩২৯ ॥ চৈত্র : **বুদ্ধিমান শিষ্য।**

অন্যান্য গল্প

এই বিভাগের তিনটি গল্প : বাজে গল্প, হাসির গল্প ও হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি 'পাগলা দাশু' পুস্তকের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট গল্প এ-যাবৎ কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। সমস্ত গল্পই 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল; কয়েকটি গল্প পুনর্নবায়িত 'সন্দেশ' পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

এসব গল্পের অধিকাংশই বিদেশী গল্পের ভাবানুবাদ। এদেশের অন্য রাজ্যের গল্পেরও অনুবাদ রয়েছে। বিদেশী পৌরাণিক গল্পগুলিকে এখানে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অনুবাদ গল্পের লেখক-কৃত উৎসগুলি শুধু এখানে উল্লিখিত হল :

ভাঙা তারা : মাওরি দেশের গল্প; খৃষ্টবাহন : রোমান ক্যাথলিক কাহিনী; দেবতার দুর্বুদ্ধি : নরওয়ে দেশের পুরাণ; বুদ্ধিমান শিষ্য : জাতকের গল্প; সুদন ওঝা : দ্রাবিড়ী গল্প; লোলির পাহারা : চীন দেশের গল্প।

১৩২০ ॥ চৈত্র : **ওয়াসিলিসা।**
১৩২১ ॥ আশ্বিন : **দেবতার সাজা।** কার্তিক : **পাজি পিটার।** পৌষ : **টিয়াপাখির বুদ্ধি।**
১৩২২ ॥ শ্রাবণ : **বোকা বুড়ো।** পৌষ : **রাগের ওষুধ।**
১৩২৩ ॥ বৈশাখ : **খুকীর লড়াই দেখা।** অগ্রহায়ণ : **ছয় বীর।** মাঘ : **ভাঙা তারা।** চৈত্র : **খৃষ্টবাহন।**
১৩২৪ ॥ আষাঢ় : **পালোয়ান।** শ্রাবণ : **হাসির গল্প।** আশ্বিন : **নাপিত পণ্ডিত।** অগ্রহায়ণ : **সত্যি।** অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন : **হারকিউলিস।** ফাল্গুন : **ঠকে-মারি আর মুখে-মারি; বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়।**
১৩২৫ ॥ বৈশাখ : **বাজে গল্প ৩।** শ্রাবণ : **আশ্চর্য ছবি; অর্ফিয়ুস।** ভাদ্র : **বাজে গল্প ১; বাজে গল্প ২।** আশ্বিন : **কুকুরের মালিক।** ফাল্গুন : **দেবতার দুর্বুদ্ধি।**
১৩২৬ ॥ মাঘ ও ফাল্গুন : **বুদ্ধিমান শিষ্য।**
১৩২৭ ॥ আশ্বিন : **সুদন ওঝা।** কার্তিক : **লোলির পাহারা।** মাঘ : **টাকার আপদ।**
১৩২৮ ॥ ফাল্গুন : **রাজার অসুখ।**
১৩২৯ ॥ কার্তিক : **দানের হিসাব।**
১৩৩০ ॥ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ : **হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি।**

এ-প্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে, অন্যান্য রচনার মত এই গল্পগুলিও সুকুমার রায়ের নামে প্রকাশিত হয় নি। লেখক-কৃত তালিকা অনুসারে এই রচনাগুলির হদিশ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সংকলনে অন্তর্ভূত পুস্তকগুলির প্রথম প্রকাশ-তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ থেকে গৃহীত হয়েছে।

এই সংকলনে মুদ্রিত রচনাদির শব্দ ও বানান-পদ্ধতিতে লেখকের রচনা অনুসৃত হয়েছে। সেহেতু পূর্ববর্তী সংস্করণের সঙ্গে সংকলনভুক্ত রচনার শব্দযোজনা ও স্তবকভাগে কিছু পার্থক্য দেখা যাবে। লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত বানানপদ্ধতি সম্ভবমত গ্রহণ করা হয়েছে, সেহেতু বানানপদ্ধতিতে সমতা রক্ষা হয় নি। 'খাই খাই' ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের চিত্র সুকুমার রায় অংকিত। 'খাই খাই' পুস্তকের বর্তমান সজ্জা শ্রীসন্দীপ রায় পরিকল্পিত।

এই সংকলন প্রস্তুত ও প্রকাশন বিষয়ে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ :

নলিনী দাশ, পুলিনবিহারী সেন, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভীককুমার সরকার, নিমাই ঘোষ, সন্দীপ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, বিপুল গুহ, বাদল বসু। রবীন্দ্রসদন, শান্তিনিকেতন; ন্যাশনাল লাইব্রেরি; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

অতিরিক্ত তথ্য : পাগলা দাশু

বর্তমান সংস্করণের প্রস্তুতির কাজ প্রায় শেষ হওয়ার মুখে শ্রী অনাথনাথ দাসের সৌজন্যে 'পাগলা দাশু'র দুষ্প্রাপ্য প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে।

ডবল ক্রাউন আকারের এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল ক্রমানুসারে এই বাইশটি গল্প : পাগলা দাশু, আশ্চর্য্য কবিতা, নূতন পণ্ডিত, সবজান্তা, নন্দলালের মন্দ কপাল, দাশুর খ্যাপামি, ডিটেকটিভ, আজব সাজা, ব্যোমকেশের মাঞ্জা, জগ্যিদাসের মামা, দ্রিঘাংচু, চীনে পট্‌কা, সবজান্তা দাদা, দাশুর কীর্ত্তি, হিংসুটি, বাজে গল্প, যতীনের জুতা, পেটুক, হাসির গল্প, চালিয়াৎ, ভোলানাথের সর্দারি ও হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী।

প্রথম সংস্করণভুক্ত ন'টি গল্পের সঙ্গে লেখক-অঙ্কিত ছবি ছিল। অন্য সাতটি গল্পের সঙ্গে মুদ্রিত অধিকাংশ ছবির রচয়িতা এইচ. বোসের পুত্র কবি ও শিল্পী হিতেন্দ্রমোহন বোস।

সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবনের প্রথম প্রচ্ছদ-চিত্রটি অংকন করেন এই বইটির জন্য।